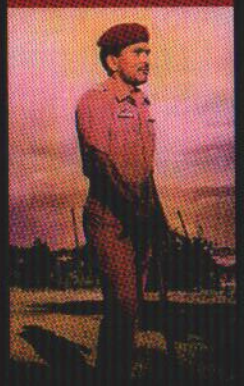

অসমাপ্ত বিপ্লব

তাহেরের শেষ কথা

লরেন্স লিফশুলৎস

অনুবাদ | মুনীর হোসেন

অসমাপ্ত বিপ্লব (তাহেরের শেষ কথা) • লরেন্স লিফশুলৎস

ISBN 978 984 4000 61 2

প্রকাশক
মনজুর খান চৌধুরী
নওরোজ কিতাবিস্তান
৫, বাংলাবাজার, ঢাকা—১১০০।
ফোন : ৯৫৮৩৭৪১

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

প্রকাশ কাল
প্রথম সংস্করণ : ৭ নভেম্বর ১৯৮৮
নওরোজ প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১১
তৃতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৩
চতুর্থ মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১৪

স্বত্ব
মূল লেখকের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী
বাংলা সংস্করণের স্বত্ব : মিসেস লুৎফা তাহের

অসমাপ্ত বিপ্লব [তাহের শেষ কথা]
মূল : লরেন্স লিফশুলৎস
অনুবাদ : মুনীর হোসেন

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
আবির কম্পিউটার

মুদ্রণে
মৌমিতা প্রিন্টার্স
২৫ প্যারিদাস রোড
ঢাকা—১১০০।

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

ASHAMAPTA BIPLAB, "Taherer Shesh Katha" Bengali Translation of "Taher's Last Testament"— BANGLADESH THE UNFINISHED REVOLUTION by Lawrence Lifschult. Published by Manjur Khan Chowdhury. Nawroze Kitabistan 5, Banglabazar, Dhaka1100. Nawroze First Edition February 1996, Nawroze 4th Edition December 2014. Cover Desing : Akkas Khan. Price Tk. 300.00 Only.

ISBN 978-984-400-061-2

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
১.	বাংলা দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা	১১
২.	প্রসঙ্গ কথা	১৩
৩.	বাংলা প্রথম সংস্করণের ভূমিকা (আবু তাহের ও ৭ই নভেম্বর স্মরণে)	১৫
৪.	লেখকের মূল ভূমিকার বাংলারূপ	৩২
৫.	তাহেরের শেষকথা	৪৩
৬.	জেলখানার চিঠি	৪৪
৭.	বিদ্রোহের পূর্বকথা	৪৯
৮.	৭ই নভেম্বরের অভ্যুত্থান	৫৪
৯.	জাতীয় প্রশ্ন আর জাতীয় স্বাধীনতা	৬৩
১০.	স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বামপন্থী দলগুলোর অবস্থান	৭১
১১.	চীন ও বাংলাদেশের আন্দোলন	৭৩
১২.	জাসদ—বিন্দু থেকে বৃত্ত	৭৮
১৩.	সামরিক বিতর্ক—গণযুদ্ধ বনাম প্রথাগত যুদ্ধ	৮২
১৪.	স্বাধীনতা	৯১
১৫.	জিয়ার ২৩শে নভেম্বরের প্রতি-অভ্যুত্থান ও তাহেরের গ্রেফতার	১০৪
১৬.	বিচারের পালা	১১৪
১৭.	পরিশিষ্ট ঃ তাহেরের শেষকথা	১৪০
১৮.	যুগে যুগে ঐতিহাসিক নির্বাচিত কিছু ঘটনা	১৬৯
১৯.	বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের নির্বাচিত কয়েকজন ব্যক্তিত্ব ও তাদের সংগঠনের পরিচয়	১৭৩
২০.	নির্ঘণ্ট	১৭৬

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র
Bangladesh Liberation War Library & Research Centre
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত

বাংলা দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বাংলাদেশের ইতিহাসে যুগান্তকারী দু'টি ঘটনা আছে। একটি মুক্তিযুদ্ধ। অপরটি ৭ই নভেম্বরে সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের পুরোধা আওয়ামীলীগ ও বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবের নেতৃত্বে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী সেই নেতৃত্বের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশে জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম ও শোষণমুক্ত অর্থব্যবস্থা পত্তন করা যায় নি। পাকিস্তানি স্বৈররাষ্ট্র কাঠামো অটুট রাখা হয় স্বাধীন বাংলাদেশে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত জনগণের চেতনা ও স্বপ্নের বিপরীতে এ ধরনের স্বৈররাষ্ট্রকাঠামোর অবস্থান ছিল সম্পূর্ণভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ।

এমন রাষ্ট্রকাঠামো এবং বিশেষ করে এই রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ প্রতিরক্ষা বাহিনীর গণবিচ্ছিন্ন চরিত্রের কারণে স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী শক্তির পক্ষে সম্ভব হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা শেখ মুজিবকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করা। ক্যুদেতার মাধ্যমে ঐ ক্ষমতা দখলের পর এক চরম অস্থিতিশীল তরল অবস্থার ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে রাষ্ট্র। ক্ষমতার হাত বদল হয় দ্রুত। প্রতিক্রিয়ার শক্তিকেন্দ্রে বিভিন্ন গ্রন্থি দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। এমনি অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত অর্জনকে রক্ষা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সংগঠন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল 'জাসদের' সহযোগিতায় কর্নেল আবু তাহেরের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় ৭ই নভেম্বর সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান।

অভ্যুত্থানী সৈনিকদের ১২-দফা দাবিনামার মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বৈর-রাষ্ট্রকাঠামোর অন্যতম স্তম্ভ রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর অন্তর্নিহিত অসঙ্গতিগুলো দূর করে স্বাধীন, সভ্য, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল বিধিব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর অংশ হিসেবে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ঢেলে সাজানো। বলা যায় যে, নভেম্বর অভ্যুত্থান ছিল জাসদের অভ্যুত্থানমূলক রণনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মেহনতী মানুষের পক্ষে ক্ষমতা দখলের একটি মহড়া।

বিপ্লবী প্রস্তুতির অপ্রতুলতা এ অভ্যুত্থানকারী সিপাহীদের সাথে সংগঠিত জঙ্গী-জনতার কার্যকর ঐক্য গড়তে জাসদ নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতা, প্রথম সুযোগেই অভ্যুত্থানের স্থপতি তাহেরকে মূল নেতা হিসেবে জনগণের সামনে উপস্থাপিত না করা এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নভেম্বর অভ্যুত্থান সফল হতে পারে নি। অন্যদিকে ঐসব দুর্বলতার কারণে জিয়াউর রহমান অভ্যুত্থানী সিপাহীদের পক্ষ ত্যাগ করে প্রতিবিপ্লব সংগঠিত করতে পেরেছিলেন অতি দ্রত। অভ্যুত্থান পরাজিত

হয়েছিল। তবে তাহের ও তার অনুসারীরা নিঃসন্দেহে স্বৈর রাষ্ট্রকাঠামোর অনেক গভীরে আঘাত হেনেছিলেন। তাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল অবস্থিত সমাজের সকল প্রতিক্রিয়ার শক্তি। তারা জোট বেঁধেছিল জিয়ার চারপাশে জড়ো হয়ে। স্পার্টাকাসকে যেমন জীবিত রাখে নি রোমের অভিজাতবর্গ, তেমনি তাহেরকেও হত্যা করেছে এদেশের গরিব জনসাধারণের ঐ সাধারণ শত্রুরা। জিয়াউর রহমান তাদের নেতৃত্ব দিয়ে জীবনদাতা তাহেরকে হত্যা করতে এতটুকু দ্বিধা দেখান নি। গর্বের কথা এই যে, রোমের স্পার্টাকাসের মত বাংলাদেশের তাহেরও নিপীড়িত মানুষের সত্যকার বীরের মতো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন। আপস করেন নি নীতির সঙ্গে।

মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলৎস সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট ও তাঁর সুদূর প্রসারী তাৎপর্য নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর রচিত *"Bangladesh The Unfinished Revolution"* লেখাটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী জেড প্রেস থেকে। ১৯৮৮ সালে মুনীর হোসেন পুস্তকটির প্রথম খণ্ডের বাংলা অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ **'অসমাপ্ত বিপ্লব'**— (তাহেরের শেষ কথা) এই শিরোনামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করে 'কর্নেল তাহের সংসদ'। প্রকাশের পর থেকে পুস্তকটি সচেতন পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। তাহের এবং ৭ই নভেম্বর অভ্যুত্থানের ওপর পরবর্তীতে বিভিন্ন লেখায় এই পুস্তকটিকে উদ্বৃত করা হয় ব্যাপকভাবে।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রকাশনা সংস্থা 'নওরোজ কিতাবিস্তান' 'অসমাপ্ত বিপ্লব (তাহেরের শেষ কথা)' পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণ (নওরোজ কিতাবিস্তান প্রথম সংস্করণ) প্রকাশ করার দায়িত্ব নেয়ায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। অনুবাদক ডাঃ মুনীর হোসেন পূর্ববর্তী প্রকাশনার ভুলগুলো শুদ্ধ করেছেন। দু'-একটি পরিবর্তন ছাড়া নতুন সংস্করণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পাঠটি অবিকৃত রাখা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হচ্ছে জেলখানা থেকে লেখা প্রয়াত কর্নেল তাহেরের লেখা মূল চিঠি সংযোজন। এক্ষেত্রে অনূদিত পাঠ বর্জন করে মূল চিঠিটি হুবহু তুলে দেয়া হয়েছে। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার প্রচারিত ১২-দফা দাবির মূল পাঠ হস্তগত হওয়ায় অনূদিত পাঠের পরিবর্তে এই পাঠটিও সংযোজন করা হচ্ছে।

আমরা বিশ্বাস করি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই পুস্তকটি প্রয়োজনীয় হবে। কারণ স্বৈররাষ্ট্র কাঠামোর যে সকল অসঙ্গতি দূর করার জন্য তাহেরের নেতৃত্বে সিপাহী জনতার অভ্যুত্থান পরিচালিত হয়েছিল তা এখনো পুরো বর্তমান। মেহনতী গরিব জনসাধারণ এখন আরও বেশি নিপীড়িত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র শোষণমুক্ত অর্থব্যবস্থা কায়েম সুদূর পরাহত। সংকটের সমাধান এখনো কিছুই হয় নি।

ডক্টর আনোয়ার হোসেন
সাধারণ সম্পাদক
কর্নেল তাহের সংসদ

ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬

প্রসঙ্গ কথা

উনিশ-শ' পঁচাত্তর-এর সাতই নভেম্বরে সংঘটিত সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান বাংলাদেশ ও তৃতীয় বিশ্বে একটি অনন্য তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ অনন্য ঘটনাটি নিয়ে এদেশের গবেষকগণ তেমন উল্লেখযোগ্য কোন অনুসন্ধান চালান নি। যে সংগঠনটি এ ঘটনাটি সৃষ্টিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে এ ঘটনার মূল্যায়ন নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হলেও এর কোন গভীরতর বিশ্লেষণ তাঁদের কাছ থেকে এখনও পাওয়া যায় নি। এদেশে যাঁরা সাতই নভেম্বরের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে লেখালেখি করেছেন তাঁরাও এদেশের জনগণের এ সম্পর্কিত আগ্রহ যথাযথভাবে মেটাতে পারেন নি বলে আমাদের ধারণা।

অথচ সাতই নভেম্বর যাদের আঘাত করেছে সেই দেশি-বিদেশি শোষক-শাসক গোষ্ঠী এর তাৎপর্য অনুসন্ধানে অনেক বেশি সুচতুর ও প্রাগ্রসর। তারা তাদের শোষণমূলক শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য সাতই নভেম্বরের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়েছে ও তা সুকৌশলে কার্যকর করেছে।

আমরা এদেশে সাতই নভেম্বরকে নিয়ে কোন গবেষণা করতে সক্ষম না হলেও একজন বিদেশি সাংবাদিক-গবেষক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সিপাহীজনতার অভ্যুত্থানের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য নিয়ে গবেষণা করেছেন। মার্কিন নাগরিক মিস্টার লরেন্স লিফশুলৎস বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই এদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর অনুসন্ধান যে এখনো চলছে তার প্রমাণ মেলে মাত্র কয়েকদিন আগে এ অনুবাদ সংস্করণের জন্য পাঠানো তাঁর ভূমিকা-প্রবন্ধ থেকে। এই ভূমিকা-প্রবন্ধটি পূর্বে অন্য কোথাও প্রকাশিত হয় নি। বর্তমান পুস্তকে ভূমিকার বাংলা অনুবাদ সংযোজিত হলো।

এদেশে রাজনৈতিক প্রত্যর্থী হত্যা ও অবলীলাক্রমে বিশ্বাসভঙ্গের ঘটনা রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাঙ্গ। মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনাপতি কর্নেল তাহের ছিলেন ষড়যন্ত্রকারীদের এই হত্যা ও বিশ্বাসভঙ্গের শিকার। নিঃশঙ্ক চিত্তেই তিনি ঘাতকের ফাঁসির মঞ্চে জনগণের জন্য প্রাণ দান করে গেছেন। সেই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দিকটি নিয়েই মিস্টার লরেন্স লিফশুলৎস লিখেছেন *"অসমাপ্ত বিপ্লব" (Bangladesh The Unifinished Revolution)। এই 'অসমাপ্ত বিপ্লব'* পুস্তকটির মধ্যে পাঠক অপ্রকাশিত ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু ও অনেক মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাবেন। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে প্রহসনমূলক বিচার ব্যবস্থার সময় অকুতোভয় প্রাংশুশির কর্নেল তাহেরের জবানবন্দী। রাজনৈতিক ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটি সচেতন দেশবাসীর জানা বাঞ্ছনীয় বলে আমরা মনে করি।

পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে এমন কোন কোন মন্তব্য বা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কিত উক্তি ও তথ্যের দায়িত্ব মূল লেখকের। লরেন্স লিফশুলৎসের বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদের তাগিদ বহুদিন থেকে অনুভূত হলেও এ যাবৎ কাজটি সমাপ্ত করতে পারা যায় নি। সুখের বিষয় তরুণ-কর্মী চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র জনাব মুনীর হোসেন আদর্শগত প্রেরণাতেই বহু প্রত্যাশিত কাজটি শেষ পর্যন্ত সুসম্পন্ন করেছেন।

কর্নেল তাহের সংসদ দু'বছর পূর্ব থেকেই অনূদিত পুস্তকটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ করার চেষ্টা করছিল। নানা প্রতিকূল অবস্থা এবং অর্থাভাবের কারণে তা সম্ভব হয় নি। সংসদ এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডটি যথাসময়ে অনুবাদ ও প্রকাশের কথা সক্রিয় বিবেচনায় রেখেছে।

অধ্যাপক মনসুর মুসা ও ডাঃ মুশতাক হোসেন মূল ইংরেজি পুস্তকের সাথে অনুবাদের সঙ্গতি ও যাথার্থ্য রক্ষার ব্যাপারে সহায়তা করেছেন। তারপরেও অনিবার্য কারণে অনেক ভুলত্রুটি থেকে গেল। শুদ্ধিপত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভুলের সংশোধনী দেয়া হয়েছে।

লরেন্স লিফশুলৎস বাংলাদেশে তাঁর এ বইটির স্বত্ব প্রয়াত কর্নেল আবু তাহেরের স্ত্রী লুৎফা তাহেরকে দিয়েছেন। লরেন্স লিফশুলৎস ও মিসেস লুৎফা তাহের আমাদের এ বইটি অনুবাদ ও প্রকাশ করতে অনুমতি দেয়ায় আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আর্থিক সহযোগিতার জন্য কর্নেল তাহেরের গুণমুগ্ধ বন্ধু মুক্তিযুদ্ধের একনিষ্ঠ কর্মী বর্তমানে লন্ডনে প্রবাসী জনাব মোহাম্মদ হোসেনের কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী। বাংলা একাডেমি প্রেসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যারা এ বইটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের কর্নেল তাহের সংসদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রকাশনার কাজে যাঁরা সহায়তা করেছেন সেই মোহন রায়হান, মোশাররফ হোসেন ও আফজাল হোসেন—তাঁদের পরিশ্রমের কথা ভুলবার নয়।

লরেন্স লিফশুলৎসের বইটির বাংলা অনুবাদ এদেশের জনগণ, রাজনৈতিক কর্মী ও গবেষকদের কাজে লাগলে আমরা আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

সাতই নভেম্বর উনিশ শো অষ্টাশি

কর্নেল তাহের সংসদ

বাংলা প্রথম সংস্করণের ভূমিকা
আবু তাহের ও সাতই নভেম্বর স্মরণে

দশ বছরেরও আগের কথা। অসাধারণ এক নিঃসঙ্গ সাহসে শক্তিমান হয়ে আবু তাহের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসিরকাষ্ঠে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন তাঁর ফাঁসির দড়ি। গলায় দিয়েছিলেন যেই নৈতিক শক্তির বরমাল্য তা ছিল স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। ঘাতকদেরকে উন্নত শিরে বলেছিলেন তাদের কাজ সেরে নিতে। তাঁর চারপাশে নিবিষ্ট নীরবতায় দাঁড়িয়ে তখন জেলের কর্মকর্তারা, অন্যান্য সহবন্দী ও আপন সহোদর ভাইয়েরা। তাদের সামনে তখন এমন একজন যিনি শ্রেষ্ঠ মানবীয় গুণাবলির এক মূর্ত প্রতীক। যতদূর জানি, উনিশ শ' ছিয়াত্তরের সেই শান্ত অন্ধকার সকালে তাহের যেভাবে মৃত্যুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেভাবে তাঁর চেয়ে বেশি সম্মান ও সৌকর্য নিয়ে খুব কম জনই মরতে পেরেছেন। আপন অঙ্গীকারে তাহেরের যতটুকু আস্থা ছিল খুব কম লোকেরই তা থাকে।

অকর্মণ্য, কাপুরুষ, দুর্নীতিবাজ ও বাকসর্বস্ব একদল মানুষের ভিড়ে সহসাই একদিন গড়ে উঠলেন একজন অনমনীয় সৎ ব্যক্তি, আপন অঙ্গীকারে বিশ্বস্ত এক সাহসী পুরুষ। তিনি এক নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যে সমাজে তাঁর দেশের কোটি দেশবাসী নিরন্তর অনাহারে ভুগবে না, যে সমাজে তারা সামাজিক বঞ্চনার শিকার হবে না। এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েই তিনি তাঁর নিজের জীবন বিপন্ন করেছিলেন।

আজ পেছনে ফিরে দেখি সেদিন যারা তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিলেন, আজ তাদের অনেকেই নেই, নিজেদেরই গড়া ভয়াবহ পরিণতির শিকার হয়েছেন। বাকিরা এখন নিঃসঙ্গ, ছড়িয়ে ছিটিয়ে, কয়েকজন এখনও কোন রকমে টিকে রয়েছেন। আর কয়েকজন যারা তখন দূরে থাকলেও ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তারা এখনও ক্ষমতায় ঝুলে রয়েছেন বিপজ্জনকভাবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও আজকের দিনের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপার তা হচ্ছে এই যে, সেদিন তাহের যেই ভয় করেছিলেন, আজ তার দেশে ঠিক সেই অবস্থাটাই হয়েছে। তবে কতদিন টিকবে এই অবস্থা তা এখনও ইতিহাসের নির্ধারণের বিষয়।

ধীরে ধীরে, স্বইচ্ছায় ও মারাত্মক পদস্খলনে বাংলাদেশ আজ রাজনৈতিক অবস্থান চ্যুতির যেই পর্যায়ে নেমে এসেছে তার সাথে তৃতীয় বিশ্বের অনেক অনুন্নত দেশেরই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। গত এক দশক ধরেই বাংলাদেশ সংখ্যালঘু এক সামরিক শাসকগোষ্ঠীর হাতে একাদিক্রমে নির্যাতিত হয়েছে। স্বৈরশাসনের মুখ ঢাকতে যারা

নিয়মিতভাবে সুসংগঠিত ও পূর্বপরিকল্পিত 'নির্বাচন'-এর আশ্রয় নিয়েছেন। নিজে একজন সামরিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাই তাহের এই দুঃখজনক সত্যটা জানতেন যে স্বাধীনতার সংগ্রাম দেশের মানুষের মধ্যে যে অভূতপূর্ব রাজনীতির জোয়ার এনে দিয়েছে তাকে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে নিতে না পারলে পরিণতি এরকম হবারই সম্ভাবনা।

আবু তাহেরকে আমি প্রথম দেখি চুয়াত্তর সালে। তাঁর শান্ত ভদ্র ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাহের স্থির নিশ্চিত ছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে যে সম্ভাবনার দুয়ার খুলে গেছে, তার সদ্ব্যবহার হলে বাংলাদেশ হয়তো পূর্ণ গণতন্ত্রায়নের পথে এগিয়ে যাবে নতুবা প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল এক সামরিক চক্রের পাল্লায় পড়ে সুবিধাবাদী শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের কবলে পড়বে। সিদ্ধান্ত নেয়াটা ছিল খুবই কঠিন। হয় অতীতের তুলনায় আসবে মৌলিক পরিবর্তন, নয় পাকিস্তান আমলের দৈন্যদশা চলতেই থাকবে। পুরনো অবস্থা টিকিয়ে রাখবার নেতৃত্বে এবারে থাকবে আরো অত্যাচারী এক শাসকশ্রেণীর ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণী ; আর তা হলে দেশের আপামর সাধারণের অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে আরো শোচনীয়। পরিসংখ্যান দেখলেই এই সত্যটি প্রমাণিত হয়।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার নেয়া এক গবেষণায় এই প্রবণতার ধারা স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। সাতাত্তর সালে আই.এল. ও. হিসাব কষে দেখতে পায় বাংলাদেশে যেখানে তেষট্টি-চৌষট্টি সালে 'নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী লোকসংখ্যা ছিল শতকরা। ৪০.২ ভাগ, সেখানে তিহাত্তর-চুয়াত্তর সালে এসে তা দাঁড়িয়েছিল শতকরা ৭৮.৫ ভাগে। উল্লেখ্য, দৈনিক খাদ্য গ্রহণের মাত্রা সর্বোচ্চ ১৯৩৫ ক্যালরির মধ্যে হলে তাকে আই. এল. ও.-র হিসাবে ধরা হয় 'নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যসীমা।' আর দৈনিক গ্রহণের মাত্রা যদি হয় সর্বোচ্চ ১৭০২ ক্যালরির মধ্যে তাহলে তাকে 'চরম দারিদ্র্যসীমা' বলে গণ্য করা হয়। চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত জনসংখ্যার মান সেই একই দশকে শতকরা ৫.২ ভাগ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল শতকরা ৪২.১ ভাগে।[১] পরবর্তী সময়ে নেয়া গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে দারিদ্র্যগামিতার এই প্রবণতা চলমান। উনিশ শ' তিহাত্তরের মূল্যকে মানসূচক ধরে আই. এল. ও. হিসাব কষে দেখায় ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের প্রকৃত আয়ের পরিমাণ উনিশ শ' সত্তরে যেখানে ছিল দৈনিক ৯.৪ টাকা সেখানে আশিতে এসে তা কমে দাঁড়িয়েছিল দৈনিক ৬.৭৯ টাকায়। এই যেখানে অবস্থা সেখানে বিভিন্ন ধরনের আয় উপার্জনকারীদের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা থাকে ক্ষেতমজুরদের। এরাই চরম দারিদ্র্যসীমায় টিকে থাকা লোকজনের প্রতিনিধি বিশেষ।[২]

আর এটা হচ্ছে পুরো ব্যাপারটার একটা দিক মাত্র। অন্য দিকটাও সমান ভাবনার। আজিজুর রহমান খান ও কিথ গ্রিফিনের নেয়া গবেষণায় বাংলাদেশ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত সূচক মন্তব্য করা হয়েছে, তা থেকেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এশিয়ার গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রতার ওপর হাতে গোনা যে ক'টি গভীর ও অনুসন্ধানী গবেষণা নেয়া হয়েছে এঁদেরটা তার মধ্যে অন্যতম। তাঁদের কাজটা ছিল আই. এল. ও.-র পক্ষে। এশিয়া জুড়ে কয়েকটা দেশের ওপর গবেষণার প্রেক্ষিতে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে সেসব দেশে নাটকীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মানে মোটেও এই নয় যে সেখানকার অধিকাংশ জনগণের প্রকৃত আয় বেড়েছে। এমনকি তথাকথিত 'সফল' দেশগুলোর ক্ষেত্রেও এই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

বাংলাদেশে গড় জীবনযাত্রার মান কমে আসার সাথে সাথে বিত্তবানেরা নিয়ত দেশের মোট জাতীয় আয়ের ক্রমবর্ধমান অংশের অধিকারী হচ্ছেন। সোজাকথায় মুদ্রাস্ফীতির সাথে গরিবদের আয়ও দিনদিন নেমেই চলেছে। আর তাই তাদের পেটে খাবারের পরিমাণও কমে আসছে। অন্যদিকে বিত্তবানেরা ফি-বছরই আরো বেশি করে খরচ করেও ক্রমবর্ধমান পরিমাণে জমিয়ে নিতে পারছেন। যে সমাজে প্রতিবছরই আড়াই লাখেরও বেশি শিশু অপুষ্টিতে ভুগে মারা যায়, সেই সমাজের এটা হচ্ছে একধরনের নীরব ও নেপথ্য ভয়াবহতা। এটাই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ফল।*

লক্ষণীয়, গত কয়েক দশক ধরেই এই ধারার প্রবণতা বর্তমান। তবে সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে এতদিন ধরে যেসব নেপথ্য শক্তির কারণে বাংলাদেশের এই নির্দিষ্ট প্রবণতামুখীন চলন অবাহত রয়েছে তাকে সফলভাবে প্রতিরোধ করবার মতো শক্তিশালী কোন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকল্প এখনো বাংলাদেশে গড়ে উঠে নি। তাহের বুঝতে পেরেছিলেন এমন একটা সমান্তরাল শক্তির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে আর রাজনৈতিকভাবে এমন একটা শক্তি সংগঠিত করার বাস্তব সম্ভাবনাও বর্তমান ছিল।

তাহের আরো বুঝতে পেরেছিলেন যে বিদেশি সাহায্য নির্ভর ও দায়বদ্ধ এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত সম্পদ বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বাধীন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ ধরা হবে কি হবে না সে প্রশ্নের সমাধান নির্ভর করবে মূলত সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর চরিত্র ও বিকাশের ওপর। আসলে তাহের বুঝতে পেরেছিলেন যে একমাত্র দেশীয় সম্পদ সংগ্রহের ওপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশের

---

* খান ও গ্রিফিন লিখেছেন—এশিয়ার অধিকাংশ দরিদ্রজনের ক্রমবর্ধমান দরিদ্রতার কারণ যে সেখানকার ব্যাপক স্থবিরতা কিংবা অর্থনৈতিক দূরাবস্থা তা কিন্তু মোটেও নয়। বরং যে ক'টা দেশ নিয়ে এই গবেষণা তার মধ্যে একটা বাদে বাকি সবক'টা দেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গড় আয়ের পরিমাণ বেড়েছে। কয়েকটা ক্ষেত্রে তো এই প্রবৃদ্ধি এসেছে খুবই তাড়াতাড়ি। একমাত্র বাংলাদেশেই গড় আয় কমেছে। তাহলে প্রশ্নটা এখানেই। আগ্রহের বিষয়বস্তু হচ্ছে এর পরেও কি করে উঁচু আয়ের শ্রেণীর লোকেরা তাদের জীবন যাত্রার মানের উন্নতি করতে পেরেছেন। এক অর্থে বাংলাদেশ হচ্ছে এশিয়ার আর সব দেশে যা হচ্ছে তার এক নাটকীয় দৃষ্টান্তস্বরূপ। যেসব দেশে গড় আয় বেড়েছে সেখানে গরিব আরো গরিব হয়েছে, বিত্তবানেরা আরো বিত্তের মালিক হতে পেরেছেন। আর বাংলাদেশে যেখানে গড় আয়ের পরিমাণই কমে গেছে সেখানেও বড়লোকেরা আরও বড়লোক হয়েছেন আর গরিবদের আয় গড়মাত্রার থেকেও দ্রুতলয়ে নিচে নেমে গেছে। গত পঁচিশ বছরে তৃতীয় বিশ্বের বেশির ভাগ দেশর জন্য এই ধরনের অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জনের অর্থ দাঁড়িয়েছে সেসব দেশের অধিকাংশ লোকের জন্য শুধু ক্রমবর্ধমান দরিদ্রতা মাত্র। দেখুন Keith Griffin and Azizur Rahman Khan "**Rural Poverty: Trends and Explanations**" in Keith Griffin and Azizur Rahman Kahan. **Poverty and landlessness in Rurual Asia** (Geneva. International Labor Organization. 1977) P. 15 আরো Griffin and Khan **"Poverty in the third world** : Ugly Facts and Fancy Models" "World development 6. no-3 (March 1978) pp. 295-304/ গ্রাম্য পর্যায়ে এসব পরিসংখ্যানগত সিদ্ধান্তের অর্থ কি দাঁড়ায় তার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন **A Quiet Violence** by Jmes Boyee and Betsy Hartman (Zed Press. London).

গণমানুষের চরম দরিদ্রতার শেষ আনা সম্ভব। তিনি মনে করতেন এ ধরনের প্রচেষ্টার শুরু হওয়া উচিত একেবারে সাধারণ মানুষের পর্যায় থেকে। দেশের সেচ ব্যবস্থার মৌলিক পুনর্গঠনের প্রয়োজন আর এমন এক শিল্প কাঠামো গড়ে তোলা উচিত যা রপ্তানিমুখী না হয়ে হবে দেশীয় বাজারে যোগান দিতে প্রস্তুত।

কিন্তু এসব করতে হলে দেশের সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্যান্য সব সমাজে প্রচলিত কায়দা থেকে ভিন্ন করে সম্পূর্ণ নতুন কাঠামোর অধীন করে গড়ে তুলতে হতো। সামরিকীকরণ ও সামরিক স্বৈরতন্ত্র দমন করতে হলে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক সেনাবাহিনীর দরকার ছিল। তাহের জানতেন সশস্ত্র বাহিনীর সামনে মাত্র দুটো পথ। হয় তারা দেশের দরিদ্রতার সমাধানে এগিয়ে আসবে নতুবা অন্যান্য অনেক দেশে যেমন হয়, তারা এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অংশ হয়ে দাঁড়াবে দেশের ক্রমবর্ধমান দরিদ্রতা টিকিয়ে রাখাটাই হবে যার কাজ।

এক কথায় বলা যায়, তাহের যেমন আমাকে বলেছিলন, একটা দরিদ্র ও অনুন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে কৃষি ও শিল্পে বিনিয়োগ করার মতো উদ্বৃত্ত অর্থনৈতিক সম্পদ খুব কমই থাকে। সেনাবাহিনী একদিকে এই উদ্বৃত্ত অর্থনৈতিক সম্পদ সৃষ্টির কাজে জড়িত হতে পারে। সেক্ষেত্রে তারা দেশের বিনিয়োগ ক্ষমতার প্রসারে সাহায্য করবে। আর তা যদি না হয়, তবে সেনাবাহিনী দেশের অপ্রতুল অভ্যন্তরীণ সম্পদের ওপর সবচেয়ে বড় বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। যেই সেনাবাহিনী সামরিক পরজীবী শক্তিতে পরিণত না হয়ে বরং সমাজকে উদ্বৃত্ত আয় এনে দেবে সেই সামরিক শক্তিকে সম্পূর্ণ নতুন এক কাঠামোর মধ্যে গড়ে তুলতে হতো। তাহের কুমিল্লা বিগ্রেডের দায়িত্ব নেবার পরপরই স্বাধীনতার শুরু থেকে এক কথা বলে আসছিলেন।

অনেকেই কুমিল্লা সেনাদের পরিহাসচ্ছলে 'লাঙ্গল সেনা' বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু তাহের তাঁর নেতৃত্বাধীন সেনাদের একটা 'উৎপাদনমুখী সেনাবাহিনীর' সদস্য বলে দাবি করতেন। কুমিল্লায় সেনারা শুধু সামরিক প্রশিক্ষণই নিত না পাশাপাশি তাঁরা ফসলের নিবিড় চাষাবাদে নেমে পড়েছিল। হাজার হাজার একর জমিতে আনারসের আবাদ শুরু হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এমন একটা সামরিক সংগঠন গড়ে তোলা যাতে করে আর সমাজের ওপরে বোঝা হয়ে বসে থাকতে না হয়। প্রত্যেক দিন অফিসার থেকে শুরু করে সবাইকে নিজ হাতে কাজ করতে হোত। গ্রামে ঘুরে পতিত জমি চিহ্নিত করার জন্য বিশেষ কর্মী বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। এইসব জমি চাষে গ্রামবাসীদের সৈন্যরা সাহায্য করত। সেনাবাহিনীর প্রকৌশলীরা এমন কি সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক পরিকল্পনা করেন। একটা উপযুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে পারলে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক ভিত্তিতে যে পরীক্ষা চালানো যাবে বলে তাহের বিশ্বাস করতেন এটা ছিল তার একটা অধ্যায় মাত্র।

চুয়াত্তরের প্রথম ভাগে তাহেরের সাথে পরিচিত হবার পরই আমি এসব জানতে পারি। সে বছর কয়েক দশকের মধ্যে ভয়াবহতম এক বন্যার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই গ্রীষ্ম জন্ম দিয়েছিল এক শরৎকালীন দুর্ভিক্ষের। আর তাতে অনাহারে ভুগে করুণভাবে মৃত্যুবরণ করেছিল পঞ্চাশ হাজার কৃষক। পরবর্তীকালে এধরনের অনেক মৃত্যু আমার

চোখের সামনেই ঘটেছিল।[৩] ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ এর একজন সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করাকালীন আমি এমন একজনকে খুঁজে বেড়িয়েছি, বন্যা নিয়ন্ত্রণের ওপরে যার উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা রয়েছে।

বন্যা ফসল ধ্বংস করে দিয়েছিল। এভাবেই চড়া মুদ্রাস্ফীতির বাজারে চাল কিনতে প্রয়োজনীয় মূল্যবান মজুরি থেকে ক্ষেতমজুররা বঞ্চিত হয়েছিল। কয়েকজন বাঙালি সাংবাদিক এ সময়ে আমাকে জানান যে আবু তাহের নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার দেশের সাংবাৎসরিক বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য খাল ও সেচ ব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে 'বিচিত্রা'য় একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। সেই সাথে স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর মতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে তাঁর 'উৎপাদনমুখী সেনাবাহিনী'র ধারণাও তিনি তুলে ধরেছেন।

যখন অবশেষে তাহেরের সাথে আমার দেখা হলো বুঝলাম তাহের দেশের সমস্যাগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত। এসব সমস্যার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও তাদের সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে তিনি ব্যাপকভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন। আরো অনেকের মতো তাঁর কাছেও আমি বাৎসরিক বন্যার কারণগুলো নিয়ে প্রশ্ন করলাম আর এগুলোর সমাধানের লক্ষ্যে একান্ত ইচ্ছা নিয়ে কখনো কিছু করা হয়েছে কি-না জানতে চাইলাম। একদিন সন্ধ্যার কথা আমার মনে আছে। আমরা দুজনে বাংলাদেশের ম্যাপটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম আর তাহের দেশের অভ্যন্তরীণ নদী ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাকে বুঝিয়ে বলছিলেন। পূর্ব বাংলা হাজার নদীর দেশ বলে বরাবর পরিচিত। তাহের বিশ্বাস করতেন এমন একটা নদীমাতৃক দেশে বন্যা ও সেচ নিয়ন্ত্রণের সমস্যাগুলোর সমাধান না হলে উৎপাদন ব্যবস্থার মৌলিক সংকট সমাধান সম্ভব নয়। তাঁর অভিমত ছিল এই যে ভূমিপুনর্বাসন ও সেইসাথে কৃষি ব্যবস্থায় ব্যাপক ভিত্তিতে সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন তো অবশ্যই দরকার, সেইসাথে দরকার প্রতিবছর ফসলহানির সবচেয়ে বড় কারণ যেই বন্যা তার সফল প্রতিরোধ। আর এটা সম্ভব হলে তা হতো ক্ষুধা ও অনাহার থেকে মুক্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ।

প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত দেশের ইতিহাস তাহেরের নখদর্পণে ছিল। সেই আমল থেকেই দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রকল্পগুলো নিয়ে তিনি অনেক চিন্তাভাবনা করেছিলেন। একসময় বাংলা ছিল এশিয়ার অন্যতম প্রধান সমৃদ্ধ অঞ্চল। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও বস্ত্র শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল এই দেশ। সামন্ত শাসকদের আমলে ও পরে মোগল শাসকদের কালে দেশে একটা সুবিস্তৃত সেচ ও নিষ্কাশন কাঠামো টিকিয়ে রাখবার দিকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই নজর দেয়া হতো। সেচ ব্যবস্থার মতোই পানি নির্গমন ব্যবস্থার প্রতিও সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

খুব বেশি হলে পাঁচ দিনের জন্যে ধানী জমি পানির নিচে থাকলে নিরাপদ থাকতে পারে। উনিশ শ' চুয়াত্তরের বন্যায় বেশিরভাগ জমিই পাঁচ দিনের বেশি সময় ধরে পানির নিচে থাকায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া আরেকটা ব্যাপার রয়েছে। যেই উচ্চফলনশীল জাত নিয়ে 'সবুজ বিপ্লব'-এর নামে বিভিন্ন শাসকশ্রেণী আর বিদেশি দাতা সংস্থাগুলো

যথেষ্ট হৈ চৈ করেছিল প্রচলিত জাত থেকে সেগুলো উচ্চতায় অনেক খাটো। তাই একটু বন্যা হলে সহজেই এগুলোর ক্ষতি হয়। বন্যার পানির তোড় আস্তে আস্তে নেমে গেলে এই উচ্চ-ফলনশীল জাতগুলো বেশিদিন পানিতে ডুবে থাকে।

উপনিবেশিক আমল থেকে দেশে যেভাবে রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাতে বন্যা, ফসলহানি ও রোগব্যাধির সমস্যাগুলো আরো বেড়ে গেছে বলেই তাহের মনে করতেন। পূর্বপশ্চিম অক্ষে স্থাপিত দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিস্তৃত রেল ও সড়ক পথগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল প্রচুর মাটি ফেলে। এতে করে প্রাচীন কাল থেকেই যে পথে স্রোত নির্গমন ও নিষ্কাশন হয়ে আসছিল সে সব পথে বাধা পড়ে। এ ছাড়াও মোগল আমলে যেভাবে শুকনো মৌসুমে খালবিল ও অন্যান্য নিষ্কাশন প্রণালিতে জমে উঠা পলি পরিষ্কার করা হোত সেভাবে অনেক এলাকায়ই কয়েক দশক ধরে কিংবা কোথাও কোথাও এমনকি কয়েক শতাব্দী ধরে এই পদ্ধতি নিয়মমতো চালু রাখা হয় নি। সেটাও একটা কারণ।

বর্তমানে এই ক্ষুদ্র পরিসরে তাহের যেসব সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেছিলেন আর সেগুলোর সমাধানে তিনি যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা সংক্ষেপে তুলে ধরা সত্যি কঠিন। তবে মোটামুটি তাঁর পরিকল্পনায় ছিল দেশের পরিবহন কাঠামোর আমূল সংস্কার, খাল-বিল ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তোলা আর যখন কাজ থাকে না সেই শীত মৌসুমে পূর্ণ বেকার ও আংশিক বেকারদের সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে জড়িত করা। এভাবে অন্য মৌসুমে উদ্বৃত্ত শক্তির ব্যবহার শুধু উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাড়তি বিনিয়োগ হিসেবেই কাজ করবে না, সেই সাথে গ্রামীণ ও ভূমিহীন কৃষকরা যারা কমপক্ষে বছরের এক চতুর্থাংশ সময় কাজ না পেয়ে কাটায় তাদের দীর্ঘ অপুষ্টিরও একটা সমাধান হবে।

তাহের মনে করতেন, যে সেনাবাহিনী গরিবের বিক্ষোভ দমনের বদলে তার দরিদ্রতা সমাধানের চেষ্টায় নিয়োজিত হবে, সেই একই সেনাবাহিনী হবে দেশের পরিবহন, সেচ ও নিষ্কাশন কাঠামোর পুনঃনির্মাণ ও পুনঃসংগঠন প্রক্রিয়ার লক্ষ্যে গৃহীত নিবিড় শ্রমভিত্তিক প্রকল্পের মূল সাংগঠনিক উপাদান। কিন্তু এভাবে উৎপাদনশীল ও গঠনমুখী আদর্শে সেনাবাহিনীর শক্তিকে পরিচালিত করতে হলে পুরো ব্যবস্থাটারই আমূল সংস্কার দরকার ছিল।

এ সব ব্যাপারে তাহেরের যে ধারণা ছিল আমি শুধু তার ভাসা ভাসা রূপটাই তুলে ধরেছি মাত্র। তবে আমি যে ব্যাপারে জোর দিতে চাই, তা হচ্ছে এই যে তাহেরকে আমি এমন একজন মানুষ বলে জানতাম, যিনি তাঁর সমাজের সামনে থাকা বিস্তর সমস্যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতেন। এগুলো সমাধানের ব্যাপারে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বাস্তব চিন্তা-ভাবনা ছিল। তাহেরের অন্তর্দৃষ্টি ছিল, জানতেন কিভাবে কাজ করতে হবে। বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সেই দিনগুলোয় আমি বেশ কয়েকজন বিদেশি বিশেষজ্ঞসহ সরকারি কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী ও প্রকৌশলীদের পেছনে ঘুরে বেড়িয়েছি। এদের মধ্যে প্রায় কারো পক্ষেই পুরো ব্যাপারটা আয়ত্তে আনা সম্ভব হয় নি। আর কিভাবে বাংলাদেশ এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে কিংবা কোন পথে এর সমাধান হতে পারে সে ব্যাপারে এদের কেউই কোন

ধারণা দিতে পারেন নি। বলা যায় সার্বিকভাবে এদের মধ্যে আমি একটা উদাসীন হাল ছেড়ে দেয়া ভাব দেখতে পেয়েছিলাম—যা হচ্ছে ঢাকার বুদ্ধিজীবী মহলের বিভিন্ন অংশে একটা বেশ প্রচলিত অবস্থান।

অন্যদিকে তাহের পুরো সমস্যাটার ওপরই স্পষ্ট ধারণা রাখতেন। এছাড়াও তিনি শুধু প্রকৌশল বিদ্যা নয়, এই সমস্যা সমাধানের জন্য অন্য ধরনের ব্যবস্থা নেয়ার কথাও ভেবেছিলেন। সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার পর তাহের দেশের জটিল নদীপথগুলোর ব্যবহারিক দিকগুলোর ব্যাপারে আরো স্পষ্ট ধারণা পাবার জন্য ড্রেজার ও সী-ট্রাক সংস্থায় একটা চাকরি নেন। তাহের দেশের নদীপথে ব্যাপকভাবে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। জমির গুণাগুণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন কৃষকের মতোই তাহেরও ভালভাবেই জানতেন বাংলাদেশের প্রমত্তা নদীগুলোর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কতোখানি। নদীমাতৃক এই দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদকে বাগে আনতে পারলে তাকে দেশের কাজে লাগানো যাবে আর তা না পারলে নদীগুলো ভাঙ্গাগড়ার মিশ্র অবদান হিসেবেই রয়ে যাবে।

এভাবেই বন্যা আর দুর্ভিক্ষের ছায়ায় তাহেরের সাথে প্রথম দেখা। এতক্ষণ আমার প্রাথমিক অনুভূতিগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম, কারণ আমার বিশ্বাস তখন তাহেরের মুখে যে ধারণা আর যে বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিলাম তারই স্বাভাবিক পরিণতি ছিল পঁচাত্তরের সাতই নভেম্বর। তবে প্রথম যখন আমি বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক প্রতিফলের ব্যাপারে তাঁর ধারণা জানার জন্য তাঁকে খুঁজে বেড়িয়েছি সে সময় আমার কোন ধারণাই ছিল না তিনি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। জানতামই না তিনি নেপথ্যে যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন তা-ই প্রকাশ পাবে সাতই নভেম্বর।

অভ্যুত্থান ও তৎপরবর্তী যেই 'বিচার'-এর ফলশ্রুতিতে তাহেরের ফাঁসি হয় সেটাই হচ্ছে এই বইয়ের বিষয়বস্তু। বিদ্রোহের সময় আমি জানতাম না তাহের সরাসরি জাসদের সাথে জড়িত। কিন্তু বিদ্রোহের এক সপ্তাহ পর ঢাকা পৌঁছে জানলাম তিনি এর নেতৃত্বে রয়েছেন। তখন সবকিছুই আমার কাছে নাটকীয়ভাবে পরিষ্কার হয়ে উঠল। খাপে খাপে মিলে গেল সবকিছু। বুঝলাম একসময় সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মুখে যে বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিলাম আজ তারই বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি সক্রিয় হয়ে উঠেছেন।

ঘুরে ফিরে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেই সবার নজর আটকে যাচ্ছিল। কিভাবে এমন একটা সমাজের প্রতিষ্ঠা করা যায় যেখানে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দীনাবস্থার জোয়ালে আটকা পড়া জনসংখ্যার মূল অংশকে চিরদিনের জন্য উদয়াস্ত অন্নচিন্তার অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়া যাবে। আর একবার এই লক্ষ্য অর্জিত হলে তখন কাজ হবে সম্ভাব্য ব্যাপকতম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে এদের জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো প্রয়োজনীয় অধিকারগুলো নিশ্চিত করা। দান্তে ফ্রান্সের জন্য বলেছিলেন 'খাদ্যের পর জনগণের দরকার শিক্ষা।' তাহের বিশ্বাস করতেন, এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হলে ক্ষমতায় সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা দরকার।

বাংলাদেশে আজ যাঁরা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেন, যাঁরা এখনো স্বপ্ন দেখেন এমন একটা সমাজ প্রতিষ্ঠার যেখানে সামাজিক ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক মূলনীতির নিশ্চয়তা থাকবে—বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের যারা, তাদের জন্য এই বইয়ের ঘটনাগুলো জানা দরকার। সাতই নভেম্বরের অভ্যুত্থানকে এখন নতুন দৃষ্টিতে দেখতে হবে। বিশ্লেষণ করতে শিখতে হবে। ইতিহাসের এই পর্যায় থেকে শিক্ষা নেয়াটা খুবই তাৎপর্যবহ।

এই বই আসলে লেখা হয়েছিল এই ঘটনা প্রবাহের প্রাথমিক বিবরণ হিসেবে। এটাই শেষ কথা নয়। তাহেরের গোপন বিচার ও হত্যাকাণ্ডের পরপরই এই বই লেখা হয়। তাহেরের জবানবন্দী শুধু বিচার কক্ষে গুটিকয়েক লোকজন শুনতে পেয়েছিলেন। ট্রাইবুন্যালে দেয়া তাঁর জবানবন্দী গোপন করে রাখা হয়েছে। গণরোষের ভয়ে তাহেরের প্রকাশ্য বিচার হয় নি। অন্য যে কারো মতোই একটা ন্যায় বিচার পাবার অধিকার তাঁর ছিল। অনেকের মতোই তাকেও তা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। কেন এমন কাজ করলেন, তার পেছনে উদ্দেশ্যই বা কি তা প্রকাশ্যে জানানোর অধিকারও তাঁর ছিল। অথচ এ অধিকার থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। বিচারে তিনি যা বলেছিলেন, তা জনগণ জানতে পারলে সরকার যে তাদের পূর্ব-নির্ধারিত রায় দিয়ে পার পেয়ে যেতে পারতেন এমন সম্ভাবনা ছিল খুব কম। এমন একটা পটভূমিতেই এই বই প্রকাশিত হয়।

সাতই নভেম্বরের সেই বিদ্রোহে একজন সাধারণ সৈন্য থেকে শুরু করে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত অন্য সবার বীরত্ব, সাহস ও ত্যাগের মহিমা একে স্বতন্ত্র মর্যাদার আসন দিয়েছে। এই বিদ্রোহের এ এক মহান উত্তরাধিকার। পরবর্তী বছরগুলোতে বিদ্রোহের প্রতিফলন যখন একটু একটু করে প্রকাশিত হতে থাকে তখন এদের অনেকেরই মৃত্যু হয়। কেউবা আবার হন কারাবন্দী। তবে তা ছাড়াও এই বিদ্রোহের আরেকটা উত্তরাধিকার এখনো রয়ে গেছে। একে বহুদিন ধরে পাশ কাটিয়ে চলবার চেষ্টা হয়েছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখন সাহস করে এর সম্মুখীন হতেই হবে। সাতই নভেম্বরে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তির উত্থান হয়েছিল তার ব্যর্থতার পেছনের কারণগুলো ব্যাখ্যা করবার কোন ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এখনো নেয়া হয় নি। এটা অবশ্যই কোন বিদেশি সংবাদদাতার কাজ নয়। ঘটনার সাথে যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাদের উচিত নিজেদের আত্মস্মৃতি ও চিন্তাভাবনাগুলো ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা। খুব বেশি দিন ধরে এ ব্যাপারে একটা সার্বিক নীরবতা বিরাজ করছে। হয়তো **'তাহেরস্ লাস্ট টেস্টামেন্ট'**-এর দীর্ঘ-বিলম্বিত বাংলা অনুবাদের প্রকাশনা পঁচাত্তর ও ছিয়াত্তরের সেই ঘটনাবহুল দিনগুলোতে কি ঘটেছিল তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের ব্যাপারে নতুন করে আগ্রহ জাগিয়ে তুলবে।

এখনো অনেক দিকেই আরো বিতর্ক ও নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। বিবেচনার উদ্দেশ্যে এই লেখক কয়েকটি মন্তব্য করতে পারেন। সাতই নভেম্বরের বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়বার পর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সাথে কৌশলগত সমঝোতায় আসার প্রশ্নটা হচ্ছে বিতর্কের সবচেয়ে প্রধান প্রতিপাদ্য। এই বইয়ে এইসব ঘটনা মোটামুটি

বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এটা সবার জানা কথা যে সাতই নভেম্বরে জিয়া ছিলেন অন্তরীণ, প্রাণ বাঁচাবার আশায় তিনি মরিয়া হয়ে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে তাহেরকে ধরেছিলেন তাকে মুক্ত করবার জন্য। পরে তাহেরকে জড়িয়ে ধরে জিয়া সবার সামনে বলেছিলেন তাহেরই তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর এই কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল ক্ষণস্থায়ী। তবে এই দু' ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কে পরবর্তীতে যে সর্বনাশা ফাটল ধরে তার মূল প্রোথিত ছিল অনেক গভীরে, নেপথ্যে সংঘাতরত শক্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে। এটা ছিল তার প্রকাশ্য ব্যাপার মাত্র। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে এই দু'পক্ষের মধ্যে একটা কৌশলগত সমঝোতায় আসার কি দরকার ছিল? এটা পরিষ্কার যে দুপক্ষই ভেবেছিলেন সাময়িক সময়ের জন্যে হলেও একপক্ষ অন্য পক্ষকে ব্যবহার করতে পারবেন। জাসদ কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সময় আর এই পথ বেছে নিয়েছিল? আর জাসদের সার্বিক কর্মকৌশল ও উদ্দেশ্যই বা কি ছিল?

জাসদ জিয়াউর রহমানের যে মূল্যায়ন করেছিল তা পরবর্তীতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বনাশা ভুল বলে প্রমাণিত হয়। তবে এটা বলা যায় যে সত্তরের দশকের শুরুতে ও মাঝের দিকে এটা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে জিয়া হয়তো তার শ্রেণীর বন্ধন থেকে নিজেকে সরিয়ে আনবেন। হয়তোবা তৃতীয় বিশ্বের স্বৈরাচারী শাসক সাম্রাজ্যে একজন সামরিক বাহিনীর অফিসারকে যে প্রাচীন ঐতিহ্য সুলভ সুযোগসুবিধা দেয়া হয় জিয়া তা প্রত্যাখ্যান করবেন। জাসদের একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি জিয়ার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবার দায়িত্বে ছিলেন তিনি বলেন—

> আমরা তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতাম। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলোতে সহযোদ্ধা হিসেবে এই যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। তখন যুদ্ধের অনিবার্য ফলশ্রুতি আমাদের প্রতিরোধের পথে এক করে দিয়েছিল। যুদ্ধের ময়দানে এক হয়ে গিয়েছিল আমাদের ভবিষ্যতের মতদ্বৈধ। স্বাধীনতার পরের সময়গুলোতে আমরা জিয়ার মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করেছিলাম। আমরা দেখছিলাম কোন পর্যায়ে তাঁর প্রগতিশীল ভূমিকা পালনের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা। আমি ছাড়াও তাহের সত্তরের ঘটনাবহুল সঙ্কটের আমল থেকে চুয়াত্তর-পঁচাত্তরের প্রাকবিপ্লবী সময়ের আগ পর্যন্ত জিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলছিলেন---।
>
> আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে উপযুক্ত সময় আসলে জিয়া হয়তোবা প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করবেন। এটা শুধু আমারই অভিমত নয়, তাহের যিনি জিয়াকে আমার থেকে অনেক ভালো করে চিনতেন তাঁরও ছিল এই অভিমত। পরে প্রমাণিত হয় এটা ছিল একটা মস্তো বড় ভুল।

চুয়াত্তর-পঁচাত্তরের বিপরীতমুখী স্রোতের তোড়ে জিয়া ছিলেন একজন অনিশ্চিত সাতাড়ু। কোন দিকে যে তাঁর জীবন ও অঙ্গীকারকে চালিত করবেন নিজেও হয়তো তা জানতেন না। পরে যখন সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এলো জিয়া পরিচিত ও প্রচলিত পথটাই বেছে নিলেন।

তবে শুধু জিয়াউর রহমানের আচরণের মধ্যেই প্রশ্নটা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। তাহলে সাতই নভেম্বরের অভ্যুত্থানের ফলে উত্থিত প্রশ্নগুলোর আন্তরিক পর্যালোচনা হবে না। এটা হবে আন্তরিক বিশ্লেষণকে পাশ কাটানোর চেষ্টা মাত্র। সাতই নভেম্বর জাসদ যদি কতগুলো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে থাকে, তাহলে জাসদের উচিত ছিল যে কোন আকস্মিকতা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকা। কিন্তু সেই প্রস্তুতি জাসদের ছিল না। কেন ছিল না? এখানে এসেই কতগুলো রূঢ় ও বিতর্কিত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষত একটি সংগঠিত শক্তি কিংবা বামপন্থী ধারার প্রবণতা সমৃদ্ধ একটি দল হিসেবে জাসদকে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাদের প্রায় কেউই এই প্রশ্নগুলোর সামনে সাহস করে দাঁড়ান নি।

এই ঘটনাগুলো প্রথমে যখন রিপোর্ট করি তার পর থেকেই আমি বছরের পর বছর ধরে এর সাথে জড়িত প্রাক্তন ব্যক্তিত্ব যাঁরা তাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। কি ঘটেছিল তার পুনঃনিরীক্ষা করার চেষ্টা করেছি। এটা সম্ভব হয়েছিল তখনি যখন জেলখানার দরজাটা খুলে যায় আর দমনযজ্ঞের দুঃস্বপ্নরাত্রি পার করে বেঁচে যাওয়া মানুষগুলো বাইরে বের হয়ে আসেন। কিন্তু যে ধরনের গবেষণা করা দরকার আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। এটা করবেন এমন কেউ যিনি আরো সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন। আর যতদূর সম্ভব এই গবেষণা হওয়া উচিত একদেশদর্শিতার সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে। এখানেই দরকার ঐতিহাসিক গবেষকের।

আমি ব্যক্তিগতভাবে কতগুলো আপাত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। তবে এগুলো অবশ্যই আপাত সিদ্ধান্ত মাত্র। প্রায়ই লোকে জানতে চায় সাতই নভেম্বর তো জাসদ এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল, তা তখন ঠিক কি করবার ইচ্ছা তাদের ছিল? তারা কি তাদের রাজনৈতিক সংগঠনের জন্য ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা আটছিল, নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল তাদের? আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে জাসদ বুঝতে পেরেছিল ক্ষমতা দখলের মতো সাংগঠনিক শক্তি তাদের নেই। নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে অহেতুক উচ্চ ধারণা পোষণ করার মতো বোকা লোক তারা ছিল না। তাদের অনেক কর্মী ও সমর্থক তখন জেলে। আমি যতদূর জানতে পেরেছি, জাসদ নেতৃত্ব ভেবেছিলেন তাঁরা যে অবস্থানে রয়েছেন তাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতের জন্য একটা অপার সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়া সম্ভব, আর তা সম্ভব হলে পরবর্তীতে সেই অবস্থান আরো সংহত করা যেত।

সাতই নভেম্বরে এদের উদ্দেশ ছিল জেলে বন্দী অনেক নেতা ও সমর্থকদের মুক্ত করা। তারপরে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির সমান্তরাল ক্ষমতা কাঠামো গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত হওয়া। জাসদ মনে করতো ক্ষমতার শীর্ষে না থেকেও ঘটনাপ্রবাহের দিক নিয়ন্ত্রণ করার মতো যথেষ্ট শক্তি তাদের রয়েছে।

তাই প্রথম পর্যায়ে জাসদ চেয়েছিল তার গণসংগঠনগুলোর ব্যাপক সংহতকরণ ও সেনানিবাসগুলোতে সংযুক্ত সেনা কমিটি গঠনের মাধ্যমে নিচ থেকেই একটা শক্তিকেন্দ্র গড়ে উঠুক। জাসদ ভেবেছিল এই সময় ব্যাপক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে তার সামরিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমর্থনের ভিত আরো শক্তিশালী হবে। এই পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক মূলনীতির ভিত্তিতে দেশ গড়বার প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে এমনকি অন্যান্য

প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে একটা কৌশলগত মিত্রতা গড়ে তুলতেও তারা প্রস্তুত ছিল। এটা হবে অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় পর্ব আর তা সমাধা হবে কয়েক মাস পরে। ইতিমধ্যে একটা সাময়িক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হবে অনিশ্চিত ক্ষমতার কাণ্ডারি।

তবে ইতিহাস পাঠকের মনে যে প্রশ্ন উঠে আসে তা হচ্ছে সাতই নভেম্বরে জাসদ যখন এই অভ্যুত্থান সংঘাটিত করে তখন এমনকি জাসদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও কি এটা বিশ্বাসযোগ্য ছিল যে ন্যূনতম উদ্দেশ্যগুলো সফল করবার মতো প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক প্রস্তুতি তাদের রয়েছে? এই প্রশ্নের বেশ কয়েকটা মাত্রা রয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাদের জন্য সব সময়েই এটা থাকবে একটা বিতর্কিত ব্যাপার। তাহের গ্রেফতার হবার এক সপ্তাহ আগে তাঁর সাথে যখন আমার দেখা হয় তখন তাহের ঠিকই এই বিষয় নিয়েই কথা তুলেছিলেন। তখন আমি এই সংকটের ওপর রিপোর্ট করার জন্য ভারত থেকে এসেছি। এক বছরের বেশি সময় ধরে তাহেরের সাথে আমার দেখা নেই। এক সময় যে ব্যক্তি আমাকে ধৈর্য ধরে দেশের সেচ কাঠামোর প্রাচীন ইতিহাস আর আধুনিক বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জটিল ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সেই জনই এখন দেখি বিপ্লবী অভ্যুত্থানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব।

তাহের আমাকে বললেন ঘটনার গতি প্রকৃতি তাদের তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে বাধ্য করেছে। তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন তাদের হিসাবে ছিয়াত্তরের মার্চ-এপ্রিলের মধ্যেই প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক প্রস্তুতি করে নেয়া যেত। অর্থাৎ আরো ছয় মাসের ব্যাপার। আগের বছর জাসদ সমর্থক ও সদস্যদের ওপর ব্যাপক ধরপাকড় হয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন এই সময়ের মধ্যে শুধু যে তাদের সামরিক সংগঠনগুলোই উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠবে তা নয়, সেই সাথে শহরে ও গ্রামে তাদের গণসমর্থনকে তাঁরা আবার সংগঠিত করে তুলতে পারবেন।

তাহের দাবি করেন যে, ক্যুদেতা ও পাল্টা-ক্যুদেতা সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিকদের গভীরভাবে বিচলিত করে তুলেছে। সাধারণ সৈনিকরা এটা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে যে সামরিক অভ্যুত্থান শুধু সুবিধাবাদী শ্রেণীর এক অংশের জায়গায় অন্য অংশকে প্রতিস্থাপিত করে মাত্র। এতে করে দেশের অগণিত গরিব মানুষের ভাগ্যে কোন মৌলিক পরিবর্তন আসে না। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলো থেকে শুরু করে কুমিল্লা ব্রিগেড গঠনের মধ্য দিয়ে তাহের বার বার বলে এসেছেন যে সৈনিকদের কাছে দেশপ্রেম মানেই হচ্ছে নিপীড়িত মানুষের স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দেয়া। পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম দরিদ্র যেই দেশ, সেখানে সেনাবাহিনীর মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি রাজনীতি সচেতন যাঁরা, তাদের অনেকের মর্মেই পৌঁছে গিয়েছিল এই কথার অর্থ।

এরাই তখন জাসদ ও তাহেরকে চাপ দেন সক্রিয় হয়ে উঠবার জন্য। নিঃসন্দেহে বলা যায় ব্যাপারটা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করা হলেও এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্তটা নেয়া হয়েছিল তাড়াহুড়ো করেই। সবাই বুঝতে পারছিলেন যে তারা কিছু করুন আর নাই করুন বিদ্রোহ একটা হবেই। জাসদের শুধু সিদ্ধান্ত নেবার ছিল তাঁরা এতে নেতৃত্ব দান করবেন কিনা। তাঁরা তখন এতে নেতৃত্ব দেবার মতো একটা অবস্থানে ছিলেন। তাঁরা

নেতৃত্ব দিলে বিদ্রোহের একটা সুসংহত দিক-নির্দেশনা পাবার সম্ভাবনা ছিল। আলাপ আলোচনার পর এগিয়ে যাবার পক্ষেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যে সমাজে সমাজতন্ত্রের নাম ভাঙিয়ে লোকে চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে আর আরামসর্বস্ব নরম গদিতে বসে বসে জীবন কাটিয়ে দেয়, হয়তো সে সমাজে থেকে থেকে তারাও অস্থির হয়ে উঠেছিলেন।

তবে প্রশ্ন হচ্ছে একটা অভ্যুত্থানকে সফল করতে হলে যেই জটিল ও কঠিন কর্মসূচি নেয়া দরকার তার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি তাদের ছিল কি-না। অনেকে বলেন ছিল না। তাই যত চাপই আসুক না কেন তাদের উচিত ছিল সংযমের সাথে অপেক্ষা করা। যেখানে বাঁচা মরার প্রশ্ন জড়িত রয়েছে ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায় সেখানে দ্বিতীয় বারের সুযোগ খুব কমই আসে। এই সব ক্ষেত্রে এমনকি পূর্ণ প্রস্তুতির পরও সময়ের গুরুত্বটাই সবচেয়ে বেশি।

নভেম্বরের পনের তারিখে তাহের বলেছিলেন যে তাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়াটা ছিল এক কঠিন ব্যাপার। সবার মধ্যেই একটা ভয় ছিল যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি পুনঃসংগঠিত হয়ে উঠবে, তাদের (জাসদের) সমর্থকদের ছত্রভঙ্গ করে ফেলবে। আসলেই তো এর পরের তিনটা বছর চরম প্রতিহিংসার সাথে তাই করা হয়েছিল। অথচ এটা তো বোঝা উচিত ছিল যে উপযুক্ত সময়ের আগেই কোন কিছু করে ফেললে সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে পিছু হটবার যথেষ্ট প্রস্তুতি থাকাটাও দরকার, নতুবা ফলাফল এরকম হতে পারে।

বিদ্রোহের একসপ্তাহ পর তাহের সংক্ষিপ্ত এক আলোচনায় জানান যে, জাসদ যেভাবে জনগণকে ব্যাপকভাবে সক্রিয় করে তুলতে পারবে বলে তিনি ভেবেছিলেন আসলে জাসদ তা পারে নি। যদিও সিপাহীদের উৎসাহিত ও অভিনন্দিত করতে দলে দলে লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে এসেছিল তবু আগের মতো ছাত্র ও শ্রমিকদের কার্যকরীভাবে সক্রিয় করে তোলা হয় নি। চৌঠা ও পাঁচই নভেম্বর জাসদের গোপন নেতৃত্ব সভায় বসলে এই সব শক্তিগুলোকে সক্রিয় করবার দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল। তবে মনে হয় যাদের ওপর দায়িত্ব ছিল তারা যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে জোর দিয়ে চেষ্টা করেন নি। অভ্যুত্থানের কয়েকটা পর্যায় ছিল। শুধু সামরিক শক্তির সমাবেশ নয় সেই সাথে ছাত্র ও শ্রমিকদের অবহিত করে সংগঠিতভাবে ঐক্যবদ্ধ কায়দায় তাদের সক্রিয় করে তোলার পরিকল্পনাও ছিল। বিদ্রোহের সার্বিক নেতৃত্ব জাসদের হাতে রাখতে হলে দরকার ছিল একই সময়ে একসাথে সবকটা আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ হওয়ার।

ষাটের দশকের শেষে ও সত্তরের দশকের শুরুর দিকে রাজধানীর শ্রমিক এলাকা আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ সুসংগঠিত মিছিল আর বিরাট র‍্যালীর মধ্য দিয়ে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। যারা এইসব গণজামায়েতগুলোর আয়োজন করেছিলেন তারাই ছিলেন তখন জাসদের মধ্যমণি। অথচ সাত তারিখ সকালে তারা আগের সেই যাদুকরী দীপ্তি হারিয়ে ফেললেন। সাত তারিখের পরের দিনগুলোতেই শুধু বেসামরিক কর্মীরা সক্রিয় হয়ে উঠছিল বলে মনে হয়। তবে তারাও শীগগিরই তাদের এই উদ্যোগ হারিয়ে ফেলেন।

যে রকম আশা করা হয়েছিল সেভাবে কেন সংগঠিত সমর্থন তৈরি করা সম্ভব হয় নি তা নিয়ে অনেক চিন্তাশীল বিতর্ক হয়েছে। লোকজন বছরের পর বছর জেলে কাটিয়েছেন এই চিন্তা মাথায় নিয়ে। এদিকে ছাত্র, শ্রমিকদের সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সক্রিয়

করে ব্যাপক জনসমর্থনের ভিত্তি আনার আগেই বিদ্রোহের সামরিক মাত্রাটা সফল হয়ে যায়। যে সংগঠন তিহাত্তরে আর চুয়াত্তরে তাদের জনসমাবেশে লাখ লাখ লোকের সমাবেশ ঘটিয়েছিল তাদের জন্য এমন একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করা ক্ষমতার বাইরে বলে মনে হয় নি। সাত তারিখ সকালে জাসদের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট একটা রাজনৈতিক কর্মসূচি তুলে ধরা হয় নি। এর ফাঁকে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শীরা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে ও বিদ্রোহের দিক ঘুরিয়ে দেয়। কয়েকটা শ্লোগানেই কাজ হয় নি। জনগণের একটা বিরাট অংশ অনেক দিন পর্যন্তও জানতো না কারা মূলত এই বিদ্রোহের পেছনে ছিলেন, তাদের কোন নীতি ছিল কি-না আর থেকে থাকলে কোন নীতির ভিত্তিতেই বা তারা এটা ঘটিয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতিতে বিশ্বাসী একটা সংগঠনের জন্য এটা ছিল নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ব্যর্থতা, একটা সর্বনাশা ভুল।

ঐতিহাসিকদের ভাষায় 'প্রতি-বাস্তব' (কাউন্টার ফ্যাকচুয়াল) বলে একটা শব্দ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঐতিহাসিকদের 'কি হতে পারতো'। অতীতের ঐকান্তিক বিশ্লেষণে এদের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ? কেউ একটা বিশেষ মুহূর্তে 'যদি' অন্যভাবে কাজ করতো তাহলে ইতিহাস কি হতে পারতো সেটা যতনা গুরুত্বপূর্ণ তার থেকে 'কেন, এমন হলো সেটাই বড় প্রশ্ন। এটা সহজেই অনুমেয় যে বিদ্রোহের দিন সাতই নভেম্বর সকালে জাসদ একটা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির পেছনে ব্যাপক গণসমর্থন আদায় করতে পারলে আর পরের দিনগুলোতে যদি তারা এই কর্মসূচির ভিত্তিতে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাগুলোকে সার্থকভাবে জাগিয়ে তুলতে পারতো তাহলে জিয়াউর রহমান বা অন্য কোন উর্ধ্বতন সামরিক অফিসার তাদের অবস্থানের পরিবর্তন করলেও তাতে কিছু এসে যেত না। 'কেন' তা হয় নি? সেটাই বড় প্রশ্ন।

এর কোন সহজ বা সাজানো উত্তর নেই। অনেকে বলেন, যাদের হাতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, তারা তা পালন করতে ব্যর্থ হন। আবার কেউ কেউ বলেন, তেসরা নভেম্বরের খালেদ মোশাররফদের কুদ্যেতা আর সাত তারিখের অভ্যুত্থানের মধ্যে সময় এত কম ছিল যে যথেষ্ট প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব ছিল না। এদের অভিমত হচ্ছে যতই চাপ আসুক না কেন জাসদের উচিত ছিল সংমের সাথে অপেক্ষা করা।

পাঁচ বছর পরে যখন নেতাদের বেশির ভাগই জেল থেকে ছাড়া পেলেন, তখন দেখা গেল সংগঠনের উপরের স্তরে যারা আছেন, বাস্তব ঘটনার মুখোমুখি হবার মতো মানসিক শক্তি তাদের নেই। কয়েক বছরের বন্দী জীবনের ভয়াবহতা, সাতাত্তরের গণহত্যার* কালো স্মৃতি আর খুলনা ও আরো কয়েক জায়গায় জেল বিদ্রোহের ফলে সংঘটিত কারাবন্দী হত্যা ; এসব নিয়ে নিষ্ঠুরতার এক ভয়াবহ স্মৃতি চেপে বসেছিল। তা মাথায় নিয়ে আবার নতুন করে শুরু করা মোটেও সোজা ছিল না।[৪] তবুও নিজস্ব তত্ত্ব-ভাবনা ও তার প্রয়োগের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেবার, এমনকি সেই পথে চরম ব্যর্থতারও যথাযথ মূল্যায়ন করতে অসমর্থ যেই রাজনৈতিক আন্দোলন তার পক্ষে সফলভাবে পুনঃসংগঠিত হয়ে সামনে এগুনো সম্ভব নয়।

---

* উনিশ শ' সাতাত্তরের দোসরা অক্টোবরের ব্যর্থ সৈনিক বিদ্রোহের পর বিভিন্ন কারাগারে গণহারে সৈনিকদের ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। লেখক এখানে সেই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। —অনুবাদক

অভ্যুত্থানের পর তারা যখন প্রথমবারের মতো আবার একসাথে বসলেন তখন অতীতকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পুনঃনিরীক্ষণের ব্যর্থতা একেবারে প্রকাশ্য হয়ে ওঠে। ব্যর্থতাকে মেনে নিয়ে বর্তমান রাজনৈতিক মঞ্চে নতুন কর্মসূচি ও সতেজ প্রাণের সজীবতা নিয়ে এগিয়ে আসতে তারা ব্যর্থ হয়েছিলেন। নেতৃত্বের ওপরের স্তরে যারা ছিলেন তারা নিজ কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি না দিয়ে বরং সরে পড়েন। অন্যদের সরিয়ে দেয়া হয়, তারা অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে আপস মীমাংসায় এসেছিলেন।

একদিকে এটা আসলে বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার পরিকল্পিত চক্রান্তেরই ফসল। এদের পরিকল্পনা ছিল যাদেরকে সম্ভব তাদের মধ্যে দুর্নীতির বীজ ঢুকিয়ে দেয়া আর যাদের বেলায় তা সম্ভব নয় তাদের একেবারে ধ্বংস করে দেয়া। এটা একটা খুব প্রচলিত নমুনা। তবে এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ অন্য একটা ব্যাপার রয়েছে। সংগঠনের সবচেয়ে উৎসর্গীকৃত কর্মী ছিলেন যারা, সেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের নেতারা জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তাদের পুরনো দীক্ষাদাতাদের ছায়া থেকে সরে এসে নতুন নেতৃত্বের অধীনে সংগঠনকে আবারো গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন। এতে ব্যর্থ না হলে একটা প্রাসঙ্গিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থান ফিরে পাওয়া যেত। কিন্তু তা না করতে পারার কারণে বাংলাদেশের বিপ্লবী রাজনীতির ইতিহাসে সবচেয়ে সাহসী ও নাটকীয় এক পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

জাসদ তার সামনে যে বিপ্লবী উদ্দেশ্যগুলো রেখেছিল, সেগুলো সফল করবার মতো যথেষ্ট পরিমিতিবোধ জাসদের ছিল কি-না তা অবশ্য বিতর্কের ব্যাপার। এশিয়ায় আরো অনেক জায়গায় বিশেষ করে কাম্পুচিয়া ও আফগানিস্তানে স্বঘোষিত বিপ্লবী ও সমাজতান্ত্রিক দলগুলো ক্ষমতায় আসার পর 'মুক্তির' যে নিষ্ঠুর প্রহসন মঞ্চস্থ করে, তাতে করে যে জনগণকে তারা বন্দীদশা থেকে মুক্ত করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই জনগণই উল্টো ধাঁধায় পড়ে যায়।

আবার অনুন্নত বিশ্বের কোথাও কোথাও বিশেষ করে নিকারাগুয়ায় কয়েক দশকের সশস্ত্র স্বৈরাচারের হাত থেকে মুক্তি এসেছে। নিকারাগুয়ায় যারা জেনারেল অগাস্টো সানডিনোর আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন তারাই উনিশ শ' চৌত্রিশে তাঁর মৃত্যুর অর্ধশতাব্দী পর আবারো জেগে উঠেন। তাহেরের মতো সানডিনোও বিশ্বাসভঙ্গের শিকার হয়েছিলেন, তাঁকেও হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু ঊনআশিতে ক্ষমতায় আসার পরই স্যান্ডিনিস্টরা মৃত্যুদণ্ডের বিধান বাতিল করে। এটা ছিল তাদের গৃহীত সংস্কারগুলোর মধ্যে অন্যতম। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মিলিয়ে পশ্চিম গোলার্ধে সর্বপ্রথম তারাই এমন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। যে আন্দোলনের মূল প্রায় সব নেতাকেই নির্যাতন করে বা অন্য কোন উপায়ে মেরে ফেলা হয়েছে সেখানে এমন একটা পদক্ষেপ তাদের প্রজ্ঞারই প্রকাশ। তাঁদের আত্মবিশ্বাস ও মানবতার পরিচায়ক। এর সাথে তুলনা করে দেখুন কাম্পুচিয়ায় কি হয়েছিল।

ভিক্টর টিরাডো লোপেজ বলেছেন— 'শুধু রক্তক্ষয় আর মহৎ আত্মত্যাগের মাধ্যমেই বিপ্লব আসে না। বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতার। সানডিনো ছিলেন সামরিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার এক মূল্যবান উৎস।[৫] হয়তো আবু তাহেরের দৃষ্টান্ত এমনি বুদ্ধিদীপ্ত অনুপ্রেরণার জোয়ার আনবে। চারপাশে নির্যাতিত মানুষের ভিড় দেখে

যারা আত্মজিজ্ঞাসায় ব্রতী হবেন, জানতে চাইবেন তাদের মধ্যে কেউ কোনদিন পৃথিবী বদলে দিতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন কিনা, তাদের জন্য নতুন অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করবে হয়তোবা।

তবে একটা অধ্যায়ের শেষ হলেও আবু তাহেরের মতো লোকদের সৃষ্টি হয়েছিল যেই পরিবেশে, তাঁদের বিশ্বাসের জন্ম হয়েছিল যে অবস্থায় ও তাদের কর্মে অনুপ্রাণিত করেছিল যে সময়, তা এখনো শেষ হয় নি। এখনো আগের মতোই তা বর্তমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দৈনিক, **'দ্য নিউইয়র্ক টাইমস'** পত্রিকায় কয়েকদিন আগে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটা পড়লেই পরিষ্কার বোঝা যায় আগের অবস্থাটা এখনো চলছে। আজ কোন পর্যায়ে নেমে এসেছে বাংলাদেশ। টাইমস সংবাদদাতা শাফিয়া খাতুনের কথা লিখেছেন, সে চৌদ্দ বছরের বালিকা। ঢাকাতে এসে 'গ্রামীণ দরিদ্রতার পর্যায় থেকে উঠে এসে জনাকীর্ণ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে নিচু আয়ের একটা কাজের সংস্থান করেছে, সত্যিই এ এক পথভ্রষ্টাসুলভ যাত্রা।' টাইমসের মতো পত্রিকাই হয়তো পারে ভূমিহীন কৃষিজীবীর পর্যায় থেকে দরিদ্র শ্রমিকের পর্যায়ে উত্তরণকে 'পথভ্রষ্টসুলভ' বলে ভাবতে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে শাফিয়া খাতুনের মতো "মেয়েদের শ্রম" বাংলাদেশের জন্য "আশীর্বাদ বিশেষ। মাসে তিনশ সাতাত্তর টাকা মজুরির জন্য (যা ৩০ ডলারের সমতুল্য) তাকে এমন এক পরিবেশে কাজ করতে হয় যা কেবল ডিকেন্সের উপন্যাসে বর্ণিত শ্রম-পরিবেশের সাথে তুলনীয়। অথচ সেই ঊনবিংশ শতকেও ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই পরিবেশে কাজ করা শিশু ও এমনকি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যও আইন করে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

আজ বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য উপনিবেশ পরবর্তী সমাজে পশ্চিমী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোই এই ধারার কর্মকাণ্ডের পৃষ্ঠপোষক। শাফিয়া খাতুনের নিয়োগকর্তা সালেহা গার্মেন্টসের স্বত্বাধিকারী জনাব রেদওয়ান আহমেদ তার শ্রমিকদের সম্বন্ধে বলেন, এবং "জন্ম থেকেই গোলামীসুলভ আচরণে অভ্যস্ত" মাসে তের ডলারের বিনিময়ে কাজ করতে প্রস্তুত আর "কোন রকম প্রতিবাদ না করেই কঠোর পরিবেশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে যায়।" একজন গবেষক দেখিয়েছেন কিভাবে "ফ্যাক্টরি মালিকরা অনেক সময় দরজায় তালা মেরে মেয়েদের নির্ধারিত সময়ের পরও অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেয়" আবার "মাঝে মাঝেই—ন্যায্য মাহিনা বদলে দেয়।" এই শোষণের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে একটা রপ্তানিমুখী শিল্প। টাইমস সংবাদদাতারা দাবি করেন "(বাংলাদেশে) পরিকল্পনাবিদরা এখন সাহস করে শিল্পায়নের প্রসঙ্গ তুলেন, তারা এমনকি সতর্ক আশাবাদও ব্যক্ত করেন।"

টাইমস সংবাদদাতা মনে করতে পারবেন না, তবে এমন অনেকেই আছেন যাদের ঠিকই মনে আছে স্বাধীনতার পরের দিনগুলোর কথা। তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন একদল পরিকল্পনাবিদ সম্পূর্ণ অন্য এক পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন সামাজিক কাঠামোর ভিত্তিতে শিল্পোন্নয়নের কথা বলতেন।[৬] পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক শিল্পায়নের অধীনে গড়ে উঠায় বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত বিশ্ব বাজারের প্রতাপশালী দেশগুলোর বেঁধে দেয়া নিয়মের পথেই নিজেকে শিল্পায়িত করতে শুরু করেছে। টাইমসের রিপোর্টে আছে—

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতি তার কোটা ব্যবস্থা উন্মুক্ত করে দেয়ার পরই গার্মেন্টস ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন সে দেশের মোট উৎপাদিত বস্ত্রের শতকরা পঁচাশি ভাগ কিনে নেয়। বাংলাদেশ এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষষ্ঠ বৃহত্তম বস্ত্র যোগানদার দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার বস্ত্র রপ্তানি ১৯৮৪ সালের ৪৫ মিলিয়ন ডলার থেকে উঠে গত বছর ৩০০ মিলিয়ন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে।

মিলানের একজন পোশাক প্রস্তুতকারক পাওলো ট্যাচ্চিনার্ডি বলেন— "এই দেশে সবচেয়ে সস্তায় কাজ করানো যায়। শ্রমিকদের বেতন, ম্যানেজার ও জাহাজীদের পাওনা এসব মিটিয়ে দেবার পরও সাটটা যখন ইতালিতে পৌঁছায় তখনো তার দাম তিনগুণ কম থাকে। আপনি হয়তো মনে করবেন আমরা মহিলা ও শিশুদের শ্রমে তৈরি কাপড় পরছি। কিন্তু আমরা এদের কাজ দিতে না এলে এদের কিছুই থাকতো না।" (দ্য নিউইয়র্ক টাইমস এপ্রিল ১৭, ১৯৮৮)

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির যে কোন নিষ্ঠাবান ছাত্রের জন্যই ইতালিয় পোশাক প্রস্তুতকারক ও আমদানিকারক ট্যাচ্চিনার্ডির এই তত্ত্বের সমুচিত জবাব দেয়া অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। শাফিয়া খাতুনের মতো শিশুদের "কাজ" দেয়ার জন্য মিলান থেকে ট্যাচ্চিনার্ডি না এলে এদের "কিছুই থাকতো না", সত্যিই কি তাই? এটাই কি বাংলাদেশের জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ ছিল? এখনো কি এটাই একমাত্র সম্ভাব্য উপায়? আগের দিনে উপনিবেশিক আনুগত্যের বিনিময়ে ইউরোপীয়রা দক্ষিণ এশীয়দের সাম্রাজ্য আর বিধাতা দান করেছিল। আজ আধুনিক যুগের মহত্ত্বে সে তাদের দেয় 'কাজ'। তাতে করে সাধারণ অবস্থায় ইউরোপে একজন ফড়িয়ার যতটুকু লাভ থাকে তার থেকে তিনগুণ বেশি লাভ নিশ্চিত হয়। এখনো দেখি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ছায়া লেগেই আছে।

এক সময় যে জাতি এশিয়ার বাজারে যোগান দিত অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্রের, তৈরি করত সেরা মসলিন, সূতী ও রেশমি কাপড় আজ তারাই নিউইয়র্ক, প্যারিস ও টোকিওর দোকানগুলোর জন্য কাপড় সেলাইয়ের সস্তা কাজে নেমেছে। কি এক অধঃপতন। যে জাতির উচিত তার বস্ত্রহীন জনসাধারণের কথা মনে রেখে কাপড় প্রস্তুত করা। অভ্যন্তরীণ বাজারে তাদের ধরা-ছোঁয়ার আওতায় সরবরাহ নিশ্চিত করার চেষ্টা চালানো সেই জাতি কি না রপ্তানির পেছনে ছুটছে। ঋণের বোঝাটাই হচ্ছে আসল কারণ।

একথা মনে রাখতেই হবে, তাহেরের মতো আরো অনেকে যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন তাদের সামনে তখন ছিল ভিন্ন এক স্বপ্ন, ভিন্ন এক আদর্শ। যদি বাংলাদেশের মানুষ দেশের মাটিতে আবারো দাসে পরিণত হতে না চায়, তাহলে তাদের এই স্বপ্ন ফিরিয়ে আনতেই হবে।

নিউ হ্যাভেন, কানেক্‌টিকাট **লরেন্স লিফশুলৎস**

২০শে জুন ১৯৮৮।

তথ্যসূচি

১. দেখুন আজিজুর রহমান খান ও কিথ গ্রিফিনের যৌথ সম্পাদনায় সাতাত্তর সালে জেনেভাভিত্তিক আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত *Poverty and Landlessness in Rural Asia* গ্রন্থের একশত সাতচল্লিশ পৃষ্ঠায় আজিজুর রহমান খান রচিত "*পোভার্টি অ্যান্ড ইনইকুয়ালিটি ইন রুরাল বাংলাদেশ*"।

২. ব্যাঙ্কক থেকে আই.এল.ও. এবং এ. আর. টি.ই.পি. কর্তৃক প্রকাশিত এবং আজিজুর রহমান খান ও এডওয়ার্ড লি রচিত *Poverty in Rural Asia* গ্রন্থের একশত পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় আজিজুর রহমান খান রচিত *"রিয়্যাল ওয়েজেস অব এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স ইন বাংলাদেশ"*।

৩. *Far Eastern Economic Review* নভেম্বর ১৫, ১৯৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত *"আ ডেথ ট্র্যাপ কলড্ রংপুর"*।

৪. *Economic and Political Weekly* মার্চ ২৫, ১৯৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত *"মার্ডার ইন ঢাকা"* *The Washington Post* ফেব্রুয়ারি, ১০, ১৯৭৮ সংখ্যায় প্রকাশিত *"বাংলাদেশ একজেকিউশানস্"*।

৫. টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়, অস্টিন কর্তৃক উনিশ শো ছিয়াশিতে প্রকাশিত এবং ডোনাল্ড সি. হজেস রচিত *The Intellectua! Foundations of the Nicaraguan Revolution* দ্বিতীয় পৃষ্ঠা।

৬. ঢাকা থেকে প্রকাশিত *The Business Review* পত্রিকার জানুয়ারি, ১৯৭৩ সংখ্যায় মুদ্রিত এবং ড. আনিসুর রহমান রচিত *"ফরেন এইড ভার্সাস সেলফ্ হেলপ্"*।

লেখকের মূল ভূমিকার বাংলারূপ

দু'শ বছরেরও বেশি আগের কথা। প্রায় আটশ' ইউরোপীয় অনিয়মিত সৈন্য বাংলার নবাবের প্রায় পঞ্চাশ হাজার নিয়মিত সৈন্যের বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হল। সেদিন শুধু লোক বলে নয়, কামানের শক্তি ও কারিগরি নৈপুণ্যেও বাঙালিরা ছিল ইউরোপীয়দের ওপরে। তবুও এই যুদ্ধে ইউরোপীয়দের সহজ বিজয় হয়। পৃথিবীর ইতিহাস বদলে যায় এর ফলে। 'ভাগ্য-নির্ধারণী লড়াই বলে যেসব যুদ্ধ চিহ্নিত হয়ে এসেছে তার মধ্যে এটিই ছিল সর্বকালের শোচনীয়তম খণ্ডযুদ্ধ।'[১] তখন সতের শ' সাতান্ন সাল। দিনটা ছিল তেইশে জুন। এটাই সেই বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধ।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিংবদন্তীর জন্ম নেয়। তবে বাংলা বিজয় কোন অতিপ্রাকৃত ব্যাপার নয়। আধুনিক পশ্চিমা গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞদের ভাষায় আসলে এই যুদ্ধে লোকচক্ষুর অন্তরালে সাফল্যের সাথে 'গোপন ষড়যন্ত্র' চালানো হয়েছিল মাত্র। বাংলার নবাবের সেনারা কখনোই ইউরোপীয়দের কাছে সামরিক শক্তিতে পরাজিত হয় নি। আসল ব্যাপারটা আরো অনেক সাধারণ। উভয়পক্ষের সৈন্যদল পলাশীর আম্রকাননে আক্রমণে পৌঁছবার আগেই নবাবের বাহিনীর সেনাপতিকে ব্রিটিশেরা হাত করে নিয়েছিল।

ব্রিটিশেরা বাঙালি নেতৃত্ব ও শাসক শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যমান বিভেদের গভীরতা বুঝতে পেরেছিল। চরম ধূর্ততার পরিচয় দিয়ে এরা দেশপ্রেমিকদের থেকে দুর্নীতিবাজদের আলাদা করে চিনতে সক্ষম হয়। আর এরা এসব ক্ষমতালোভী নীতিবিবর্জিত লোকজনদের সাফল্যের সাথে ব্যবহার করে চতুরভাবে বাজির চাল দিয়েছিল। রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ব্রিটিশ অভিযোদ্ধাবাহিনী পূর্বনির্ধারিত রাজনৈতিক চক্রান্ত অনুযায়ী সামরিক বিজয় অর্জন করল। 'পলাশীর ঘটনার পর ব্রিটিশরা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে একটার পর একটা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় ও ভারতে তাদের আসন পাকাপোক্ত করে নেয়। এরা নিজেদের স্বার্থে উপমহাদেশের সনাতন স্বনির্ভর গ্রাম ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে এক অভিজাতশ্রেণীর সৃষ্টি করে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার ভাগ্যের সাথে যাদের ভাগ্য ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত।'[২]

উনিশ শতকে পৃথিবী ব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। বাংলাদেশে প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার পূর্ণ রূপান্তর ঘটানো হয়। নীল, পাট, চা, আফিমের চাষ, জমির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব, জমিদারি প্রথা ও ভূমি কর থেকে শুরু করে কৃষকের দেনা শোধ করতে তার জমি ক্রোক

করার অধিকার পর্যন্ত সব ধরনের আইন করা হয়। এভাবেই দক্ষিণ এশিয়ার এই ঘাঁটি থেকে কখনো যুদ্ধে জয়ী হয়ে, কখনো অবরাতি দ্বারের 'অধিকারের' ছুতো দেখিয়ে ব্রিটিশেরা পুরো এশিয়ায় ইউরোপীয় ধাঁচের আধুনিক শিল্প ব্যবস্থা ও খোলা বাজার ব্যবস্থার প্রবর্তন করে।

এই সব কিছুরই শুরু হয়েছিল পলাশীতে। এই বইয়ের মূল ঘটনার সূত্র ধরতে হলে স্মৃতির সভায় এই ঘটনাগুলো আবারো ফিরিয়ে আনাটাই হবে যুক্তিযুক্ত। বাঙালিরা এই মঞ্চের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত। তাদের কাছে এসব চেনা ঠেকতে পারে। তবে অন্যান্য পাঠক হয়তো বহু প্রাচীন এক অভ্যুত্থানের এই করুণ ইতিহাসের সাথে ততটা পরিচিত নন। তবে যারা গুয়েতেমালার আরবেঞ্জ, ইরানে মোসাদ্দেক, কঙ্গোতে লুমুম্বা, ক্যাম্বোডিয়ার সিহানুক কিংবা চিলিতে আলেন্দের ভাগ্যে কি ঘটেছিল তা' বিশ্বস্তভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন আমার বক্তব্য বুঝতে তাদের অসুবিধা হবার কথা নয়। এক অর্থে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার কাহিনী ছিল ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের ইতিহাসের জন্য পূর্ব অধ্যায়।

১৭৫৬ সালের এপ্রিলে মাতামহ আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মৃত্যুর আগে বৃদ্ধ আলীবর্দী খান সিরাজকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও স্বেচ্ছাচারিতার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিলেন। বৃদ্ধ তার পৌত্রকে সাবধান করে বলেছিলেন, রাজ্যের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন। মৃত্যুর আগে তিনি সিরাজকে একটা ব্যবস্থা নিতে বলে যান কথিত রয়েছে—

> দেশে ইউরোপীয়দের যে শক্তি রয়েছে তার কথা সব সময় মনে রাখবে। তেলিঙ্গা এলাকায় (দাক্ষিণাত্য) তাদের সমর রাজনীতি সম্বন্ধে সজাগ থাকবে। রাজাদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহের অজুহাতে তারা মুঘল সম্রাটের সাম্রাজ্য দখল করে এই সাম্রাজ্যের জনসাধারণ ও তাদের সম্পদ বিভক্ত করে ফেলেছে। তিন জাতির বিরুদ্ধে (ইংরেজ, ফরাসি আর ওলন্দাজ) একই সাথে লড়তে যেয়ো না। ইংরেজদের শক্তি সাংঘাতিক ওদের সবচেয়ে আগে শক্তিহীন করবে। তাদের হারাতে পারলে অন্যদের বিরুদ্ধে তোমাকে বেশি বেগ পেতে হবে না। দাদু মনে রেখো ওদের কোন অবস্থাতেই দুর্গ বানাতে বা সৈন্য বাড়াতে দিও না। যদি দাও তাহলে বুঝবে এদেশ আর তোমার নেই।[৩]

ক্ষমতায় এসেই সিরাজ আইন করে বিদেশি আর্মেনিয়ানদের সাথে ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য সুবিধা সমান করে দেন। বহুদিন ধরে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার যে অধিকার ব্রিটিশদের ছিল এই আইন জারির ফলে তার অবসান ঘটে। এর সাথে প্রায় দু'শ বছর পর উনিশ শ' একান্নতে মোসাদ্দেক সরকার ইরানে যা করেন তার তুলনা করা চলে। এ্যাংলো-ইরানীয়ান তেল কোম্পানির অব্যাহত ব্রিটিশ মালিকানার বিরুদ্ধে ইরানে জাতীয়তাবাদী মনোভাব ও অসন্তোষ তখন তুঙ্গে।[৪] মোসাদ্দেক প্রধানমন্ত্রী হবার পরই তেলশিল্পের জাতীয়করণ করা হয়। এর ফলে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের ইরানীয়

প্রতিনিধি তরুণ শাহের সাথে মোসাদ্দেক সরকার অঘোষিত যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। দু বছরের মধ্যেই সি. আই. এ.-র মধ্যপ্রাচ্য ব্যুরো প্রধান কারমিট রুজভেল্টের মধ্যবস্থতায় সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশক্তির এক আঁতাত উনিশ শ' তিপান্ন সালের আগস্টে একটা সুসংগঠিত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মোসাদ্দেক সরকারের পতন ঘটায়; 'বিংশ শতকের তৃতীয় পাদের জন্য ইরানের তেল সম্পদ এভাবেই পশ্চিমা দুনিয়ার প্রতি উন্মুক্ত হয়ে যায়।[৫] বাংলাদেশে সেদিন যা ঘটেছিল পরবর্তীকালে তা সংশোধিত সংস্করণে আরো অনেক জায়গায় ঘটেছে। এটাতো একটা বহু পুরনো অধ্যায়। বহু পরিচিত ঘটনা। তবে যে পাঠক এই বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিবৃত ঘটনাবলির সাথে জড়িত হবেন তিনি যেন তখন ১৭৫৬—৫৭-তে কি ঘটেছিল তার খেই হারিয়ে না ফেলেন।

নবাব ইংরেজদের বাণিজ্য শুল্ক দিতে আদেশ তো দেনই, উপরন্তু কোলকাতায় সদ্যনির্মিত দুর্গ ত্যাগ করতেও নির্দেশ দেন। ইংরেজ বাণিজ্য প্রধান ওয়াটসের সাথে যোগাযোগের পর ইংরেজ গভর্নর ড্রেকের কাছে এক চিঠি লিখে নবাব জানান যে বণিক শ্রেণী হিসেবে বাংলায় বাণিজ্য করার জন্য তিনি সবসময়ই ব্রিটিশদের স্বাগত জানাবেন কিন্তু তাই বলে দুর্গ বানানোর অধিকার তাদের একেবারেই নেই। বাংলার মাটিতে কোন বিদেশি সামরিক ঘাঁটি সহ্য করা হবে না, কাজেই যা বনানো হয়েছে তা সব ভেঙ্গে ফেলতে হবে।' ইংরেজ গভর্নর জবাব দিতে তালবাহানা করেন ও পরে যে চিঠি দেন তা ছিল স্বভাবসুলভ কূটনৈতিক দুর্বোধ্যতায় ভরা। তাতে নবাবের আদেশ অনুযায়ী কোন পদক্ষেপ নেয়া হবে কি না তার কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল না। ড্রেকের ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাব পাবার পর রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে সিরাজ সতের শ' ছাপ্পান্ন সালের পহেলা জুন রওয়ানা দেন। পনের দিনের মধ্যে নবাব কোলকাতায় পৌঁছান। তিন দিন ধরে প্রতিরোধের হাস্যকর প্রচেষ্টার পর ড্রেক সদলবলে জাহাজে করে পালিয়ে যান। জুনের বিশ তারিখে নবাবের বাহিনী ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চাটুকারদের কাছে এই যুদ্ধের ইতিহাস মূর্ত হয়ে আছে কোলকাতার অন্ধকূপ ঘটনার মাধ্যমে। এতে একশোরও বেশি ইংরেজ বন্দী প্রাণ হারায় বলে অভিযোগ করা হয়ে থাকে। মনে হয় এই ঘটনার ওপর পুরো বিতর্কটাই চলে নবাবের অগোচরে। উপনিবেশবাদী প্রচারণা ও পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাসের অনেক খানি দখল করে আছে এই কাহিনী। স্পিয়ার লেখেন— 'পঞ্চাশ বছর ধরে এই ঘটনার ওপর তেমন কোন দৃষ্টি পড়ে নি। কিন্তু এরপর ঔপনিবেশবাদীদের কায়-কারবার প্রণেতারা নিজেদের জন্য একটা অনুকূল সূত্র পেয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে এর গুরুত্ব এতটা বাড়ানো হয়েছিল যে ভারত সম্বন্ধে "প্রত্যেক ইংরেজ স্কুলছাত্রের" দরকারি জ্ঞানের পরিধিতে পলাশীর যুদ্ধ আর সিপাহী বিপ্লবের সাথে "অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ড"-ও জায়গা পেয়ে যায়।'[৬] শেষে দেখা গেল এর পেছনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটাই অনেকে ভুলে গেছেন। অন্ধকূপের কাহিনী ইংরেজদের একটা আদি 'রক্তবিসর্জন তত্ত্বে' পরিণত হয় দু'শ' বছর পর ভিয়েতনামে তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সমর্থন করতে মার্কিনীরাও এই একই পথ ধরেছিল।

ব্রিটিশেরা এর পরে কোলকাতা থেকে তাদের ঘাঁটি ফলতাতে সরিয়ে নেয় এবং প্রতি-আক্রমণের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিতে থাকে। এই সময়েই আধুনিক গোয়েন্দা কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয় এমন অনেক কালজয়ী পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়। বাঙালি নেতৃত্বের মধ্যে বিদ্যমান রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও শত্রুতার সুযোগ পুরোমাত্রায় নেয়া হয়। বাংলার সিংহাসনের আরো দু'জন দাবিদার ছিলেন। ঢাকায় ঘসেটি বেগম আর পূর্ণিয়ার শওকত জঙ্গ। দু'জনই আলীবর্দী খাঁর বংশের লোক। জুনের যুদ্ধে পরাজয়ের আগেই ব্রিটিশেরা দু'-পক্ষের সাথে যোগাযোগ করে ও নবাবের বিরুদ্ধে গৃহীত কোন সম্ভাব্য পদক্ষেপকে সমর্থন দেয়ার ইঙ্গিত দেয়। শওকত জঙ্গের কাছে লেখা এক চিঠিতে ব্রিটিশেরা খোলাখুলি আশা প্রকাশ করে যে তিনি যেন 'সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করতে পারেন।' কিন্তু নবাব খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি অসামরিক চাল খেলে ঘসেটি বেগমকে নিষ্ক্রিয় করেন আর ফোর্ট উইলিয়াম যুদ্ধের পর শওকত জঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাকে হত্যা করেন।

এর মধ্যে দক্ষিণ দিকে মাদ্রাজের ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে নবাবের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসার রবার্ট ক্লাইভকে এই অভিযানের নেতৃত্ব দেয়া হয়। রবার্ট ক্লাইভ পাঁচ বছর আগে মাদ্রাজে ফরাসিদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে সবিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। এই রবার্ট ক্লাইভই পরে হন বাংলার ইংরেজ গভর্নর। ডিসেম্বরে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ফল তাতে পৌছায়। এরপর জুন পর্যন্ত দু'দলের মধ্যে পর্যায়ক্রমে কখনো যুদ্ধ, কখনো আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। শেষে ব্রিটিশেরা কোলকাতা পুনর্দখল করে। নবাব তাঁর পূর্ণ অস্ত্র বল প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হন।

ডিসেম্বর আর জুনের মধ্যের সময়টাতে ক্লাইভ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসে সম্ভাব্য সর্বকালের গুরুত্বপূর্ণ 'গুপ্তচক্রান্তের' আয়োজন করেন। ব্যাপারটা ছিল ব্রিটিশদের জন্য নিতান্তই সহজ। সিংহাসনের দাবিদার প্রয়াত শওকত জঙ্গের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ইংরেজরা জানতে পেরেছিল যে শওকত জঙ্গ নবাব বাহিনীর অনেক উচ্চপদস্থ সেনানায়কদের সাথে গোপন যোগাযোগ রাখেন। তারা আরো জানতো ব্রিটিশের সাথে সহযোগিতার বিনিময়ে ক্ষমতা পাবার নিশ্চয়তা পেলে এরা নবাবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতেও প্রস্তুত। নবাব তখন ক্লাইভের বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ক্লাইভ এ সময় নবাবের সেনাপতি মীরজাফরের সাথে গোপনে চুক্তি সারলেন। এতে মধ্যস্থতা করে জগৎশেঠ আর উমি চাঁদ দু'জনেই প্রচুর টাকা আত্মস্থ করেন। পলাশীর যুদ্ধের এক পক্ষ আগে দশই জুন এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক স্পিয়ারের মতে এক আনুষ্ঠানিক চুক্তিপত্রে—'মীরজাফর কোম্পানির বিশেষ সুবিধা বজায় রাখার আশ্বাস দেন। তিনি কোলকাতায় পরাজয়ের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দশ লাখ পাউন্ড ও কোলকাতার ইউরোপীয় বাসিন্দাদের আরো পাঁচ লাখ পাউন্ড দিতে রাজি হন। এ ছাড়াও গোপন চুক্তিপত্রের মাধ্যমে কোম্পানি প্রধানদের বড়সড়ো ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যাপারেও ঐকমত্য হয়।'[৭] প্রতিদানে ব্রিটিশেরা মীরজাফরকে বাংলার পরবর্তী নবাব পদে অধিষ্ঠিত করতে আশ্বাস দেয়। এভাবেই দু'পক্ষের সেনাদল পরস্পরের মুখোমুখি হবার দু'সপ্তাহ আগেই পলাশীর যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।

বাইশে জুন ক্লাইভের সেনাদল পলাশীর প্রান্তরে মীরজাফরের নেতৃত্বে জমায়েত নবাব বাহিনীর মুখোমুখি হয়। পরদিন সকালে মীরমদন ও মোহনলালের নেতৃত্বে ছোট দুটো দল পাঠানো হয় ক্লাইভের বাহিনীর মুখোমুখি হবার জন্য। হঠাৎ ছুটে আসা এক গুলিতে মীরমদন প্রাণ হারান। কিন্তু মোহনলালের বাহিনী সামনে এগিয়ে যায়।

ক্লাইভের বাহিনীকে পিছু হঠতে বাধ্য করে। এসময় কোন কারণ না দেখিয়েই মোহনলালের সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাদপসারণের আদেশ দেয়া হয়। মোহনলাল অবাক হয়ে গিয়েছিলেন—'এখন পিছু ফেরার সময় নয়, আমরা এতদূর এগিয়ে এসেছি যে যুদ্ধের ভাগ্য এখনই নির্ধারিত হবে।'[৮] মোহনলালকে আবারো আদেশ করা হয়, শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে বাধ্য হয়ে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে পিছু ফিরে আসেন। অন্যদিকে মীরজাফরের অধীন ইউনিটগুলো হঠাৎ করে পিছু হঠলে সামনের সারিতে প্রতিরক্ষা ব্যূহ সৃষ্টিকারী সেনাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। 'মীরজাফরের নেতৃত্বাধীন উচ্চপদস্থ সেনানায়করা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য কোনরকম চেষ্টাও করেন নি। ক্লাইভ ঠিক এই সুযোগের অপেক্ষায় বসে ছিলেন। স্পিয়ার লিখেছেন—'বসওয়ার্থে স্ট্যানলির মতো মীরজাফর তখন দূর থেকে তাকিয়ে, তার অপরিণামদর্শী বিশ্বাসঘাতকতার ফসল হিসাব করতে ব্যস্ত।'[৯]

পাঁচ দিনের মধ্যেই আঠাশ তারিখে ক্লাইভের সৌজন্যে মীরজাফর তার বহু আকাঙ্ক্ষিত বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। সিরাজউদ্দৌলা ধরা পরার চার দিন পর মীরজাফরের পুত্র মীর মীরনের ইশারায় আলীবর্দী খাঁর পালিত মোহাম্মদী বেগ নামক এক ঘাতকের দ্বারা নিহত হন। উডরফ লিখেছেন—'পতন হলো সিরাজউদ্দৌলার, উত্থান হলো মীরজাফরের। এসময় কোন কিছুই হওয়া অসম্ভব ছিল না।'[১০] দীর্ঘ দিন ধরে বাংলা থেকে ব্রিটিশ বেনিয়াদের উচ্ছেদ করার জন্য 'সামন্ত জাতীয়তাবাদী' সিরাজের এক বছরের সংগ্রাম যখন মনে হচ্ছিল সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে, তখনি তা চিরদিনের জন্য হাতছাড়া হয়ে গেল। এর পরবর্তীকালের মর্মান্তিক অবমূল্যায়ন করেছেন স্পিয়ার এই বলে—'শুরু হলো নতুন যুগের।[১১] এই যুগ আধুনিক ইতিহাসের দীর্ঘতম উপনিবেশিক শাসনের যুগ।

তিন বছর পর প্রভূত গৌরবের সাথে কোলকাতা ত্যাগ করার আগেই মীরজাফরের সাথে গোপন ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্লাইভ নগদ অর্থে দু'লাখ চৌত্রিশ হাজার পাউন্ড ছাড়াও চব্বিশ পরগণা জেলা জায়গীর হিসেবে পেয়েছিলেন, যার বাৎসরিক আয় ত্রিশ হাজার পাউন্ড। পুতুল নবাব হিসেবে মীরজাফর তিন বছর মুর্শিদাবাদে ক্ষমতায় টিকে থাকতে সক্ষম হন। শেষে কোলকাতাবাসী ব্রিটিশদের বিরক্তিভাজন হয়ে উঠলে ক্লাইভের উত্তরসূরি ও বন্ধু হেনরী ভ্যান্সিটার্ট ১৭৬০ সালের অক্টোবরে মদ্যপ জনবিচ্ছিন্ন মীরজাফরকে ফুরিয়ে যাওয়া মদের বোতলের মতো ছুঁড়ে ফেলে দেন। মীরজাফরের জায়গায় তার জামাতা মীর কাশিমকে ক্ষমতায় বসান হয়। তিন বছর পরে ব্রিটিশদের অবাধ লুটপাটে অতিষ্ঠ হয়ে মীর কাশিম প্রতিবাদী হয়ে উঠলে জাতীয়তাবাদী নবাবকে সরিয়ে ১৭৬৩ সালে পুরনো বিশ্বস্ত ভৃত্য মীরজাফরকে আবারো নবাব বানানো হয়। দু'বছর পর পলাশীর বিশ্বাস ঘাতকদের 'নায়ক' মীরজাফর মারা যান।

প্রশ্ন উঠতে পারে এতদিন পর কেন আবার সেই নীতিভ্রষ্ট বিশ্বাসঘাতকদের পুরনো কথা টেনে আনা। কারণ শুধু এই নয় যে, বাঙালি জাতীয় মানসে এই কাহিনীর প্রভাব আজো অপরিসীম। আজো বাংলার ঘরে ঘরে সেনাপতি মীরজাফরের নাম বিশ্বাসঘাতকতার সাথে সমার্থক হয়ে রয়েছে। তবে এই কাহিনীর গুরুত্ব এইখানে যে আজকের বাংলাদেশে আবারো বিশ্বাসঘাতকতা আর বীরত্বের সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আগের ঘটনাকে বলা যায় বর্তমান ঘটনার পূর্বসূরি। আধুনিক কালের ঘটনার নায়ক ঢাকার ক্ষমতাধিকারী জেনারেল জিয়াউর রহমান। তাঁর বিরোধীরা তাঁকে 'একালের মীরজাফর' বলেন। শুধু স্থান-কাল-পাত্র মাত্র পৃথক, তা ছাড়া আগের ঘটনার সাথে এবারের ঘটনার কোন তফাৎ নেই। হতে পারে জিয়ার বিরুদ্ধে অপবাদটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। তাহলেও তা সতর্ক তদন্তের দাবি রাখে। আর জিয়া যদি সত্যি সত্যিই আধুনিক কালের মীরজাফর হয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় বাংলাদেশের ক্ষমতালোকে আরও অনেক মীরজাফর আজ ক্ষমতার ধান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এ বইয়ের দুটো ভাগ রয়েছে। প্রথম ভাগে বর্ণিত হয়েছে সাতই নভেম্বরের অভ্যুত্থান ও তৎপরবর্তী তাহেরের হত্যাকাণ্ড। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে পনেরই আগস্টের যে অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব নিহত হন তার বিবরণ। এঁরা দু'জনেই ছিলেন জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনা সম্পন্ন। স্বাধীন বাংলাদেশ তার অস্তিত্বের জন্য এই উভয় ব্যক্তির কাছেই বিশেষভাবে ঋণী। তাহের ছিলেন একজন বিপ্লবীজাতীয়তাবাদী ও মার্কসবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ আর মুজিব উন্নত পুঁজিবাদী দেশে প্রচলিত সোশ্যাল ডেমোক্রেসির একজন সমর্থক, মূলত একজন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী।

তাহেরের জীবন ও তাঁর ফাঁসিকাষ্ঠে যাওয়ার কাহিনীই আগে বিবৃত হয়েছে। অবশ্য সময়ের ধারাবাহিকতায় মুজিব যে অভ্যুত্থানে মারা যান সেটাই আগে আসে। তাহের যে বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা তার কয়েক মাস পরেই ঘটেছিল। এই অবিন্যস্ত বিন্যাসের কারণ হচ্ছে বইয়ের দু' অংশের দুটো পৃথক পাণ্ডুলিপির উৎস। যে গোপন বিচারে তাহেরের ফাঁসি হয় সেই গোপন বিচার চলাকালীন সময়ে ঢাকায় আমি একজন বৈদেশিক সংবাদদাতা হিসেবে অবস্থান করছিলাম। এই সময়েই বইয়ের প্রথম ভাগের তথ্য সংগৃহীত হয় তাহেরের মামলার ঘটনা সম্বন্ধে বিস্তারিত খোঁজ করতে গিয়েই আমি পনেরই আগস্টের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে নতুন খবর পেয়ে যাই। দেশি-বিদেশি অনেককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে আমি আস্তে আস্তে বুঝতে পারি গত চল্লিশ বছরে প্রথমবারের মতো ছিয়াত্তর-এর জুলাইতে তাহেরের মৃত্যুদণ্ডের জন্য নেপথ্যে বাড়াবাড়ি করেছিলেন যে ক'জন গুটিকয়েক কর্মকর্তা তারা সবাই মুজিবের মৃত্যুর পরপরই উচ্চ ক্ষমতায় আসীন হন। এদের অনেকের জীবন বৃত্তান্ত পর্যবেক্ষণ করে এটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এদের অনেকেই পাকিস্তান আমলে উচ্চপদস্থ নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তা ছিলেন। অনেকে আবার একাত্তরে পাকিস্তানিদের পক্ষে দালালিও করেছিলেন। পরে যখন গবেষণায় হাত দিলাম, দেখি কখনো বিস্ময়, কখনোবা কাকতালীয় যোগাযোগ বেড়েই চলেছে। এভাবেই দু'-একটা ছোট খাট ঘটনার সূত্র ধরে আস্তে আস্তে বড় বড় সব যোগাযোগ বেরিয়ে আসতে থাকে। তখন ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ-এর দক্ষিণ

এশীয় সংবাদদাতা হিসেবে মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর আমি যে রিপোর্ট করেছিলাম তা' আমার কাছে সম্পূর্ণ বর্জনীয় মনে হয়। সহকর্মীদের সাথে মিলে আমি যে রিপোর্ট দাখিল করি তা ছিল প্রথম দৃষ্টির অভিমত। এ ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয়ে থাকে এটা ছিল অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তিকর। একেবারে প্রকাশ্য ব্যাপারগুলোই আলোচিত হয়েছিল মাত্র। অবশ্যই অভ্যুত্থানের নায়করা চেষ্টায় ছিলেন তাদের দিক থেকে সবার দৃষ্টি সরিয়ে নেবার কিন্তু এটাও স্বীকার করতে হয় যে স্থানীয় ও বিদেশি সাংবাদিকরা ঘটনার গভীরে যেয়ে পুনঃনিরীক্ষণের মাধ্যমে এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও পরিণতি উদঘাটন করতে ব্যর্থ হন।

এর কারণ খুঁজুন। তাহলেই বুঝবেন আধুনিক সাংবাদিকতার ধারা, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের পাশ্চাত্য সাংবাদিকতার ধারাটা কি রকম। গত দশ বছর ধরে অকুস্থলীয় বিবরণ ও ত্বড়িৎ সাংবাদিকতার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। আগের সেই আবাসিক সাংবাদিকতার ধারা আর নেই। তখন সাংবাদিকরা সে দেশের ভাষা ও ইতিহাস শিখতেন, প্রতিদিনের রাজনৈতিক ঘটনাবলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে সে দেশের অস্তিত্বের গভীরে ঢুকে যেতেন। এটা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। আজকের যুগের সাথে যেন তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নিউইয়র্ক টাইমস্-এ আমার এক সহকর্মী বলেছিলেন কথাটা—'আজকালকার দিনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ৭৫০টা শব্দের মধ্যে এমন একটা প্রবন্ধ লেখা যাতে ছুটির পরদিন সকালে উঠে ষোল বছরের যে কেউ তা পড়ে সহজেই বুঝতে পারে।' এর থেকে গভীর বিশ্লেষণে যাবার মানেই হচ্ছে বেশি করা। আজকের দিনে আমার এক প্রাক্তন রিভিউ সহকর্মী হার্ভে স্টকউইনের ভাষায় 'বুদ্ধিদীপ্ত সাংবাদিকতা'-র বড় অভাব। হয়তো ঘটনার গভীরে নিয়ে যেতে এই শব্দটা জুতসুই নয়। তবু আমার মতে এটাই প্রয়োজনীয়। খুব কম সাংবাদিকই আছেন যারা একবার প্রথম পৃষ্ঠায় খবর ছাপাবার পর আবার তা নিয়ে মাথা ঘামান। তখন পরে দেখা যায় যে আসল ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম।

বাঙালি সাংবাদিক সমাজের ক্ষেত্রেও এই কথাগুলো পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। সেন্সরশীপের ভার আর ভয় দেখানোর ধারাটা ঢাকায় কিছুদিন ধরে প্রবলভাবে বিরাজমান, একথা মনে রেখেও বলা যায় যে ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা কিংবা পাকিস্তানে জিয়াউল হকের সামরিক আইনের সামনে সে দেশের সম্পাদকরা যেভাবে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন সে তুলনায় বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক মহল থেকে একেবারে নিষ্প্রভ প্রতিরোধ এসেছে। বিগত বছরগুলোর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে।

তাহেরের মৃত্যুর এক বছর পর লন্ডনে তাহেরের কয়েকজন পুরনো সহকর্মী ও আত্মীয়স্বজন মিলে কনওয়ে হলে এক সভার আয়োজন করেন। সেখানে আমাকে কিছু বলতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমি যা বলেছিলাম তার কিছু অংশ আজও উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করি—

> তাহের স্মৃতি সংসদ আমাকে যখন প্রথমে অনুরোধ করেন এই সভায় যোগদানের জন্য তখন কি করব তা নিয়ে আমি কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলাম।

দক্ষিণ এশিয়ায় সংবাদদাতা হিসেবে আমার কাজ ছিল প্রতিদিনের ঘটনাবলি রেকর্ড করা। যে বৃহৎ সমস্যা নিয়ে উপমহাদেশে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভেদ ও রাজনৈতিক মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে তাতে বিভিন্ন পক্ষের আদর্শ নিয়ে বিতর্কের জন্ম দেয়াটা আমার কাজ নয়। আমি সমস্ত ব্যাপারটা সাংবাদিকের দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করেছি। আমি একটা ঘটনাকে নিজের দৃষ্টভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠকের সামনে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছি।

সম্পাদকরা আজকাল বারবার তাদের সংবাদদাতাকে একটা গুণের কথাই মনে করিয়ে দেন, তা হচ্ছে 'বস্তুনিষ্ঠতা'। এই পেশার মূল কথাই যেন বস্তুনিষ্ঠ হওয়া। এই শব্দটা নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেকেই যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছেন। আমি এ ব্যাপারে একটা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যা আমার মতে তাহেরের ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাংবাদিকরা অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ হবার ব্যাপারে আপস করতে পারেন না। তবে অনেক সময়েই নিরপেক্ষ থাকা যায় না। একটা উদাহরণ দেই পঁচাত্তরে ভারতীয় সরকার স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোর ওপর কড়া সেন্সরশীপ আরোপ করেন আর সেই 'জরুরি অবস্থার' সময় সেদেশে অবস্থানরত বিদেশি সংবাদদাতাদের ওপরও খবরদারির চেষ্টা করেন। দিল্লীতে থাকাকালীন সেই সময় আমি সেন্সরশীপের কাঠামো ও তা ভাঙ্গার অভিযোগে আটক স্থানীয় সাংবাদিকদের অবস্থা বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করি। সোজাসুজিভাবে আমি নতুন নিয়ম-কানুনগুলোর কথাই রিপোর্ট করি। তবে, অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে আমি সেন্সরশীপের ব্যাপারে নিরপেক্ষ ছিলাম না। আমি বস্তুনিষ্ঠভাবে রিপোর্ট করেছি। কিভাবে কোন নিয়ম কখন কাজ করে। কারা এর খপ্পড়ে পড়লেন। কিন্তু সেন্সরশীপের ব্যাপারে আমার কোন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। আমি এর সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম—যেমন বিরোধী ছিলাম ইন্দিরার 'গরিবী হঠাও' আন্দোলনের নামে বস্তি ভেঙ্গে দেয়ার, ভিক্ষুকদের গ্রেফতার করার, সত্তর লক্ষ লোকের বাধ্যতামূলক বন্ধ্যাকরণের, পাইকারী হারে গ্রেফতারের আর এদের ওপর চাপিয়ে দেয়া নিষ্ঠুর শাস্তির।

অনেকেই দেখতে পান না কিন্তু আমি নিরপেক্ষ আর বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টিং-এর মধ্যে বিরাট ফাঁরাক দেখতে পাই। একেবারে খাঁটি সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে যেমন কোন আপস করার উপায় নেই তেমনি এটাও স্বীকার করতে হবে কিছু কিছু প্রশ্নের নিরপেক্ষতা বলে কোন কিছুই নেই। এজন্যেই আমি এই সভায় বক্তৃতা দেয়ার জন্য তাহের স্মৃতি সংসদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। গোপন বিচার ও গোপন মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে আমি নিরপেক্ষ নই। তা জিয়াউর রহমান করুন কিংবা ফ্রাঙ্কো, স্ট্যালিন যে-ই করুন না কেন আমি তার নিন্দা করবই। এটা একটা কাকতালীয় যোগাযোগই বটে, যে সময় আমি বাংলাদেশে পৌঁছাই তখন এই ধরনের একটা বিচার বিশ্বাসঘাতকতা, অবিচার আর মৃত্যুর পরিধিতে মর্মান্তিক এক বিয়োগান্ত নাটকের ব্যাপ্তি নিয়ে এক এক করে তার অধ্যায়গুলো মেলে ধরছিল।...

আমি আর দুটো ব্যাপারে বলতে চাই। জাতীয়তাসূত্রে আমি একজন মার্কিনী। আমাদের দেশেও আশ্চর্যরকম অবিচারের বহুবিদিত অধ্যায় রয়েছে। সেখানেও 'রাষ্ট্রের স্বার্থে' ব্যবহৃত হয়েছিল আইনের প্রক্রিয়া। আজও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রোজেনবার্গ, জো হিল, স্যাকো আর ভ্যানজেটির মতো আরো অনেকের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি জাগরুক হয়ে আছে।

আজ আমার দু'জনের নাম মনে পড়ছে—বার্থোলোমেও স্যাকো আর গিউসেপ্পে ভ্যানজেটি। এই দু দরিদ্র ইটালিয়ান নতুন আর সুন্দর জীবনের আশায় আমেরিকায় পাড়ি দিয়ে চক্রান্তের বেড়াজালে জড়িয়ে যান। তাদের হত্যা করা হয়, কেননা আমেরিকায়ও রয়েছে সালাউদ্দিন আহমেদ আর সফদারের মতো লোক। স্যাকো ও ভ্যানজেটির আমলে তাদের ডাকা হতো অ্যাটর্নি জেনারেল পামার ও জে. এডগার হুভার নামে। আজ আমি এদের প্রসঙ্গ টানছি তার কারণ মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর ম্যাসাচুসেটস্ অঙ্গরাজ্যের গভর্নর মাইকেল ডুকাকিস ঘোষণা করেছেন ; অঙ্গরাজ্যের সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এই যে এই দু'জন নিরপরাধ ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। গভর্নর ঘোষণা করেছেন, প্রতিবছর এদের মৃত্যুদিবসে ম্যাসাচুসেটস্ অঙ্গরাজ্যের অধিবাসীরা 'স্যাকো এন্ড ভ্যানজেটি মেমোরিয়াল ডে' পালন করবেন। এই অঙ্গরাজ্যেই তাদের বৈদ্যুতিক শক দিয়ে মারা হয়েছিল। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ফাঁসিকাষ্ঠে যা ঘটেছে তার সঠিক মূল্যায়ন করতে বাঙালি জাতি কি এত লম্বা একটা সময় নেবে? আমার তো মনে হয় না।

শেষ করার আগে আরেকটি কথা বলতে চাই। উনিশ শ' একষট্টিতে লেখা পল বরনের একটা প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। বরন একজন মার্কিন অর্থনীতিবিদ যার লেখা— *'দ্য পলিটিকাল ইকনমি অব গ্রোথ'* বইটিকে তৃতীয় বিশ্বের অনগ্রসরতার ওপর প্রথম শ্রেণীর বিশ্লেষণীমূলক সমীক্ষা হিসেবে এখনো গণ্য করা হয়ে থাকে। আমি অবশ্য তাঁর কোন অর্থনীতির প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিতে চাই না। আমার উদ্ধৃতি তাঁর লেখা 'দ্য কমিটমেন্ট অব ইন্টেলেকচুয়াল' প্রবন্ধ থেকে। আমার বিশ্বাস আজকের বাংলাদেশের ছাত্র, সাংবাদিক ও আইনজীবীরা এই উদ্ধৃতির সাথে প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাবেন—

'সি. পি. স্নো-এর লেখা পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে শুধু সত্যের সন্ধানেই বুদ্ধিজীবীর অঙ্গীকার সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।... একদিকে এই সীমানা যদিও বুদ্ধিজীবীর মূল অঙ্গীকারের ভিত্তিভূমি সৃষ্টি করে দিয়েছে, অন্যদিকে আসল সমস্যাটায় কিন্তু তা' মোটেও হাত দেয় নি। সত্য কথা বলা হলো কি বলা হলো না তা নিয়ে আসল সমস্যা নয় তার সাথে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সত্যের ধরনও আলোচিত হওয়া উচিত। কতটুকু বলা হলো আর কতটুকু চেপে যাওয়া হলো তার খেয়াল রাখা দরকার।... আজকের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কালে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে ক্রমাগত সেই ধরনের সত্যি কথাগুলো বলে যাওয়া

হয় যেগুলো 'স্থিতাবস্থা' রক্ষার জন্য আদর্শবাদী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। আর সেইখানে জোরও দেয়া হয় সবচেয়ে বেশি। কিন্তু অন্যদিকে যেখানে সত্য প্রকাশ করাটা দরকার সেখানে তা স্পষ্ট করে বললে, অখণ্ড সত্যটা প্রকাশ করলে, তার খণ্ড খণ্ড অংশের পেছনে সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণ বের করে তাদের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় করতে গেলেই গোলমাল বাধে। পেশাগত বৈষম্যমূলক আচরণ চালানো হয়। সোজা কথায় এঁরা সমাজচ্যুত হয়ে যান। অনেক সময় এতেও কাজ না হলে সোজাসুজি ভয় দেখানো হয়। কাজেই বুদ্ধিজীবী হবার জন্য মাত্র একটা শর্ত হচ্ছে সত্য প্রকাশ করার ইচ্ছে থাকা। সেইসাথে প্রয়োজন সাহসের। যা হয় হউক না কেন, যে কোন অবস্থায় সঙ্গতিপূর্ণ তদন্ত চালিয়ে যাবার দৃঢ়তা থাকা দরকার। "অস্তিত্বমান সব কিছুর তীক্ষ্ণ সমালোচনায় হাত দিতে হবে। নিজ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ সমালোচনা করার সাহস থাকতে হবে। ক্ষমতাসীনদের সাথে সংঘর্ষের ভয়ে যেন তা গুটিয়ে না যায়।" কাজেই একজন বুদ্ধিজীবী হচ্ছেন মূলত একজন সামাজিক সমালোচক। যার দায়িত্ব হচ্ছে আরো উন্নত, আরো মানবিক ও যুক্তিযুক্ত সামাজিক ব্যবস্থা তৈরির পেছনে বাধাগুলো চিহ্নিত করা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা অতিক্রম করতে সাহায্য করা।... অনিবার্যভাবেই 'স্থিতাবস্থা' সংরক্ষণে ব্যস্ত শাসক শ্রেণী আর তাদের পোষ্য বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা তিনি "গোলযোগকারী" ও "উৎপাত" বলে চিহ্নিত হন। এসব বুদ্ধিজীবীরা এঁদের কখনো ভদ্র ভাষায় কাল্পনিক বা আধিভৌতিক বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। আর খেপে গেলে এদের অন্তর্ঘাতী ও রাষ্ট্রদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করেন এই অবস্থায় বুদ্ধিজীবীর জন্য তাঁর অঙ্গীকার ও কর্তব্যে পূর্ণভাবে বিশ্বস্ত থাকাটা একান্ত জরুরি, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এইতো সুযোগ। মূলত এ ধরনের একটা অবস্থায় একজন বুদ্ধিজীবীর ঘাড়ে দায়িত্ব বর্তায় মানবতা, যুক্তি ও প্রগতির ঐতিহ্যকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা। গোটা সভ্যতার ইতিহাসে এইতো আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান উত্তরাধিকার।'[১২]

শেষ করছি বরনের অনুসরণে। বর্তমানে শুধু এতটুকুই আশা করা যায় যে একদিন বাংলাদেশও উপহার দেবে সেই ধরনের মানুষদের যারা তাঁদের উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করবেন। এঁরা তাদের নীতি রক্ষার সংগ্রামে অটল রইবেন আর শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষের কাছে তাহেরের জীবন ও ঐতিহ্যের বিশ্বস্ত ইতিহাস তুলে ধরতে পারবেন।

ক্যামব্রিজ
পহেলা মে, ১৯৭৯

লরেন্স লিফশুলৎস

তথ্যসূচি

১. Philip Woodruff, *The Men who Ruled India* Vo. 1, (Schocken Books, New York 1964). p. 100.

২. Harry Magdoff, *Imperialism From the colonial age to the present* (Monthly Review, New York. 1978) p-24.

৩. Ramsey Muir, *The Making of British India* 1756-1858 (Longmans, Green & Co., London, 1917), pp-40—1.

৪. Fred Halliday, *Iran Dictatorship and Development,* (Penguin, London, 1979) p-24.

৫. 'CIA Agent Planned Downfall of Mossadeq' *The Guardian*, 30 March 1979.

৬. Pevcival Spear, *The Oxford History of Modern India* 1740-1947, (Oxford University Press, London, 1965) p-35.

৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।

৮. Ramakrishna Mukherjee, *The Rise and Fall of the East India Company,* (Monthly Review, London, 1974), p-267.

৯. স্পিয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।

১০. উডরাফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০।

১১. স্পিয়ার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।

১২. Paul A. Baran, *The Longer View* (Monthly Review, New York, 1969) p-13.

তাহেরের শেষকথা

তখন উনিশ শ' আট সাল। সময়টা বসন্তকাল। ক্ষুদিরাম বসু নামে এক তরুণ বাঙালির জীবনকে ঘিরে পূর্ব ভারতে এক কিংবদন্তীর জন্ম নিয়েছিল। সে বছর মে মাসে তাঁকে গ্রেফতার করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়? ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট ডি. এইচ. কিংসফোর্ডকে হত্যা করার প্রচেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছিল। গুপ্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত সদস্যদের ওপর চাপানো বিভিন্ন পদ্ধতির শাস্তির জন্য এই কিংসফোর্ড রীতিমত বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রপথিকদের জনসমক্ষে চাবকানোর আদেশ দেয়াই ছিল তার অভ্যাস।

কিংসফোর্ডের ওপর আক্রমণ ব্যর্থ হয়, ক্ষুদিরামকে তার সহযোগীদেরসহ গ্রেফতার করা হয়। 'আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত দীর্ঘস্থায়ী এই বিচারের রায়ে আসামীদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ক্ষুদিরাম আর কানাইলালের ফাঁসির পর সারাটা কোলকাতা শহর যেন ভেঙ্গে পড়েছিল এদের শবযাত্রায় যোগ দিতে। বিশাল ও স্বতঃস্ফূর্ত এই জনসমাবেশ স্থানীয় ঔপনেবেশিক শাসনকর্তাদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। এরপর থেকেই বিপ্লবীদের প্রকাশ্য শেষকৃত্যানুষ্ঠানের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল।

কয়েক বছরের মধ্যেই এই বিচারের সরকারি পক্ষের উকিল আর তদারককারি সরকারি কর্মকর্তা-পুলিশের সহকারী সুপারকে জাতীয়তাবাদীরা গুলি করে হত্যা করে। ব্রিটিশরা এই সময়কে তাদের ভাষায় 'সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন'-এর প্রাথমিক পর্যায় বলে চিহ্নিত করে। অবশ্য, উপমহাদেশের বুদ্ধিজীবী আর সাধারণ কৃষক জনতার কাছে এই সময় হচ্ছে জঙ্গী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্যায় মাত্র।

বাংলার ঘরে ঘরে ক্ষুদিরামের নাম কিংবদন্তীতে পরিণত হয়। বাউলরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তাঁর সাহসকিতার প্রশংসা করে নতুন নতুন গান বাঁধেন। লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত প্রতিদিন শত ক্ষুদিরামের জন্ম হবে। যে দেশে কবিতা আর সঙ্গীতের রয়েছে নিজস্ব এই গতিময়তা, ইতিহাস আর সুরের চলমান ধারায় প্রতি বছরের বানের স্রোতের থেকেও দ্রুতগতিতে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে বাংলার আনাচে-কানাচে; বটগাছের শিকড়ের চেয়েও গভীর হয়ে তা গেঁথে যায় বাঙালির মনে। লোকে বলাবলি করতে থাকে যে এখনো শহরে-গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়ায়, মুখে তার জাতীয়বাতাদের বুলি। কালজয়ী এক জনপ্রিয় লোকগীতির একটা লাইন হচ্ছে— 'চিনতে যদি ভুল করিস মা, দেখবি গলায় ফাঁসি'।

বিক্ষুব্ধ বাংলায় ছাব্বিশ বছর পর ব্রিটিশরা আবারো একটা রাজনৈতিক মৃত্যুদণ্ডের আয়োজন করে। ১৯৩৪-এ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতা বিপ্লবী সূর্যসেনকে ফাঁসি দেয়া হয়। এরপর এখন পর্যন্ত আর কখনো এদেশে কোন রাজনৈতিক ফাঁসি দেয়া হয় নি।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে এই সময়ের মধ্যে এদেশে অগণিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও গণহত্যা হয় নি। ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চল হচ্ছে পৃথিবীর দরিদ্রতম অঞ্চলগুলোর অন্যতম। বৃহৎ জমির মালিক আর ক্ষেতমজুরদের মধ্যে প্রায়ই এখানে লড়াই বাধে। এ উপমহাদেশের চাষীরা মরতে মরতে কোন রকমভাবে বেঁচে আছে। বিদ্রোহ দমন-পীড়নের ক্রমাবর্তমান চক্রে আবর্তিত হচ্ছে তাদের ভাত, জমি, আর পানির সংকটের তথা বাঁচামরার প্রশ্নের জবাবটি। আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে এরা প্রতিদিনই মারা যাচ্ছে, জীবন দিচ্ছে। যেখানে গ্রাম্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হচ্ছে মূলত খাদ্য উৎপাদন সেখানে জমির মালিকানা স্বত্বের ওপরই সব চোখ বার বার ফিরে আসে আর পুরনো ভূমি কাঠামো বজায় রাখতে পারার ওপরই নির্ভর করে সরকারের ক্ষমতায় টিকে থাকা। ব্রিটিশদের হাত বদল হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা ভারত ও পাকিস্তানের জাতীয় বুর্জোয়া শাসকদের হাত ঘুরে শেষে একাত্তরে বাঙালিদের হাতে ফিরে আসা পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় ধরে 'বিপ্লবী' হবার অপরাধে সরকারিভাবে অন্তত এ বাংলায় কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় নি। জেলখানায় হাজারো রাজবন্দী ধুঁকে ধুঁকে মরেছে আজো মরছে। কিন্তু ফাঁসি? নাহ, হয়তো ক্ষুদিরাম বা সূর্যসেনের কথা মনে হলে নতুন শাসকেরা ভয়ে পিছপা হতেন। সরকারিভাবে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার মাঝে এখনো ঔপনিবেশিক আমলের ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে।

ইরান থেকে আর্জেন্টিনা পর্যন্ত পৃথিবীর সবখানেই যেখানে মার্ক্সবাদীদের ধরে ধরে সরকারিভাবে মৃত্যুদণ্ড দেয়াটা ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার সেখানে ভারতীয় উপমহাদেশের এই আপেক্ষিক সংযম এক অবাক হবার মতোই ব্যাপার। এটা সাধারণ অবস্থার বিস্তৃত রূপ মাত্র, হয়তো বা মনে হবে এ বিষয়টি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে না। কিন্তু এই পটভূমি বিচার করলেই কেবল বোঝা যাবে ৭৬-এর একুশে জুলাই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কর্নেল আবু তাহেরের ফাঁসি কার্যকর করায় বাঙালির মনে কি তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল।

জেলখানার চিঠি

আবু তাহেরের জীবনী যেমন খুব সহজে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়—তেমনি অসম্ভব, যে ঘটনাপ্রবাহের চূড়ান্ত পরিণতিতে তাঁর জীবনের আকস্মিক ও বীরোচিত পরিণতি ঘটেছে, তার সরল ব্যাখ্যা দেয়া। আমাদের ঘটনাপ্রবাহ আধ-দশকেরও বেশি সময় নিয়ে বিস্তৃত। সময়টা ছিল জটিল ; রক্তাক্ত সংঘাত আর নিষ্ঠুরতায় ভরা। পঁচাত্তরের পর থেকে বাংলাদেশে পর পর চারটি সরকার এসেছে (লেখক ঊনআশিতে বইটা লেখেন, সেই প্রেক্ষিতে চিন্তা করতে হবে—অনুবাদক) যার প্রতিটি সরকার পরিবর্তন হয়েছে অস্ত্রের

জোরে। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রায় দশ লাখ লোক অনাহারে আর যুদ্ধে মারা যায়। ১৯৭৪-এ একটা মানব-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের বলি হয় লক্ষ কৃষক। পঁচাত্তরে বাংলাদেশ প্রবেশ করে রাজনৈতিক সংকটের এক নতুন পর্যায়ে। পরপর দুটো সামরিক অভ্যুত্থান, হত্যাকাণ্ড আর কলঙ্কজনক জেলহত্যা অধ্যায়ের পর আসে এক 'বিপ্লবী সিপাহী বিদ্রোহ'। ১৯৭৫-এর সাতই নভেম্বরের এই বিদ্রোহ বাংলাদেশকে নাড়া দেয় প্রবলভাবে, এই বিদ্রোহ-ই আবু তাহেরকে নিয়ে যায় খ্যাতির শীর্ষে।

ফাঁসি কার্যকর হবার তিন দিন আগে আবু তাহের জেলখানা থেকে শেষ চিঠি লেখেন, সেই চিঠি দিয়েই আমাদের শুরু—

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল
১৮ই জুলাই, ৭৬ সাল

শ্রদ্ধেয় আব্বা, আম্মা, প্রিয় লুৎফা, ভাইজান ও আমার ভাই ও বোনেরা।
গতকাল বিকেলে ট্রাইবুন্যালের রায় দেয়া হল। আমার জন্য মৃত্যুণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে। ভাইজান (তাহেরের বড় ভাই আবু ইউসুফ খান—অনুবাদক) ও মেজর জলিলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত। আনোয়ার, ইনু, রব ও মেজর জিয়ার ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, দশ হাজার টাকা জরিমানা। (আনোয়ার—তাহেরের ছোট ভাই ড. আনোয়ার হোসেন, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগের অধ্যাপক, ইনু—জাসদের সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু। মেজর জিয়া—মেজর জিয়াউদ্দিন, একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বারো বৎসরের কারাদণ্ড হয়েছিল—অনুবাদক) সালেহা, রবিউলের ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ৫ হাজার টাকা জরিমানা। (সালেহা—যশোরের প্রাক্তন জাসদ নেত্রী, রবিউল—সালেহার স্বামী, তৎকালীন যশোর জেলার জাসদ নেতা—অনুবাদক) অন্যান্যের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড। ড. আখলাক, সাংবাদিক মাহমুদ ও মান্নাসহ তেরো জনকে মুক্তিদান। (সাংবাদিক মাহমুদ—কে. বি. এম. মাহমুদ অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক 'ওয়েভ' পত্রিকার সম্পাদক। মান্না-মাহমুদুর রহমান মান্না, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক সহ-সভাপতি—অনুবাদক) সর্বশেষে ট্রাইবুন্যাল আমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে বেত্রাহত কুকুরের মত তাড়াহুড়া করে বিচার কক্ষ পরিত্যাগ করল।

হঠাৎ সাংবাদিক মাহমুদ সাহেব কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চাইলে তিনি বললেন আমার কান্না সে জন্য যে একজন বাঙালি কর্নেল তাহেরের মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করতে পারল। বোন সালেহা হঠাৎ টয়লেট রুমে যেয়ে কাঁদতে শুরু করল। সালেহাকে ডেকে এনে যখন বললাম—'তোমার কাছ থেকে এ দুর্বলতা কখনই আশা করি না।' সালেহা বলল—'আমি কাঁদি নাই আমি হাসছি। হাসি-কান্নার এই বোনটি আমার অপূর্ব। জেলখানার এই বিচারকক্ষে এসে প্রথম তার সাথে আমার দেখা। এই বোনটিকে আমার ভীষণ ভাল লাগে। কোন জাতি এর মত বোন সৃষ্টি করতে পারে?

সশস্ত্র বাহিনীর অভিযুক্তদের শুধু একটা কথা কেন তাদেরকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল না। মেজর জিয়া বসে আমার উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখল। জেলখানার এই ক্ষুদ্র কক্ষে হঠাৎ আওয়াজ উঠল, 'তাহের ভাই লাল সালাম।' সমস্ত জেলখানা প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। জেলখানার উঁচু দেওয়াল এই ধ্বনিকে কি আটকে রাখতে পারবে। এর প্রতিধ্বনি কী পৌঁছবে না আমার দেশের মানুষের মনের কোঠায়।

রায় শুনে আমাদের আইনজীবীরা হঠাৎ হতবাক হয়ে গেলেন। তারা এসে আমাকে বললেন যদিও এই ট্রাইবুন্যালের বিরুদ্ধে আপিল করা যায় না। তবুও তারা সুপ্রিমকোর্টে রিট করবেন। কারণ সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে এই আদালত তার কাজ চালিয়েছে ও রায় দিয়েছে। সাথে সাথে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করবেন বলে বললেন। আমি তাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলাম রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করা চলবে না, এই রাষ্ট্রপতিকে আমি রাষ্ট্রপতির আসনে বসিয়েছি, এই দেশদ্রোহীদের কাছে আমি প্রাণভিক্ষা চাইতে পারি না।

সবাই আমার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শুনতে চাইল। এর মধ্যে জেল কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে সরিয়ে নেয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল। বললাম আমি যখন একা থাকি তখন ভয়, লোভ-লালসা আমাকে চারদিক থেকে এসে আক্রমণ করে। আমি যখন আপনাদের মাঝে থাকি তখন সমস্ত ভয়, লোভ-লালসা দূরে চলে যায়। আমি সাহসী হই, আমি বিপ্লবের সাহসীরূপে নিজকে দেখতে পাই। সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করার এক অপরাজেয় শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করে। তাই আমাদের একাকিত্বকে বিসর্জন দিয়ে আমরা সবার মাঝে প্রকাশিত হতে চাই। সে জন্যই আমাদের সংগ্রাম।

সবাই একে একে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। অশ্রুসজল চোখ। বেশ কিছুদিন সবাই একত্রে কাটিয়েছি। আবার কবে দেখা হবে। সালেহা আমার সাথে যাবে, ভাইজান, আনোয়ারকে চিত্তচাঞ্চল্য, স্পর্শ করতে পারে নি। কিন্তু তাদেরকে তো আমি জানি। আমাকে সাহস দেবার জন্য তাদের অভিনয়। বেলালের চোখ ছলছল করছে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে চায়। (বেলাল—তাহেরের ছোট ভাই ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল—অনুবাদক) জলিল, রব, জিয়া আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল। এই আলিঙ্গন অবিচ্ছেদ্য। এমনিভাবে দৃঢ় আলিঙ্গনে আমরা সমগ্র জাতির সঙ্গে আবদ্ধ। কেউ তা ভাঙ্গতে পারবে না। সবাই চলে গেল। আমি আর সালেহা বের হয়ে এলাম। সালেহা চলে গেল তার সেলের দিক। বিভিন্ন সেলে আবদ্ধ কয়েদি ও রাজবন্দীরা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে বদ্ধ সেলের দরজা জানালা দিয়ে। মতিন সাহেব, টিপু বিশ্বাস ও অন্যান্যে দেখাল আমাকে বিজয় চিহ্ন। এই বিচার বিপ্লবীদেরকে তাদের অগোচরে এক করল।

ফাঁসির আসামীদের নির্ধারিত জায়গা সেলে আমাকে নিয়ে আসা হল। পাশের তিনটি সেলে আরো তিনজন ফাঁসির আসামী। ছোট্ট সেলটি ভালই, বেশ পরিষ্কার। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যখন জীবনের দিকে তাকাই তাতে লজ্জার তো কিছুই নেই। আমার জীবনের নানা ঘটনা আমাকে আমার জাতির সাথে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এর চাইতে বড় সুখ, বড় আনন্দ আর কী হতে পারে?

নীতু, যীশু ও মিশুর কথা—সবার কথা মনে পড়ে। তাদের জন্য অর্থ সম্পদ কিছুই আমি রেখে যাই নি। কিন্তু আমার সমগ্র জাতি রয়েছে তাদের জন্য। আমরা দেখেছি শত সহস্র উলঙ্গ মায়া-ভালোবাসা বঞ্চিত শিশু। তাদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় আমরা গড়তে চেয়েছি। বাঙালি জাতির জন্য উদ্ভাসিত নতুন সূর্যের আর কত দেরি? না, আর দেরি নেই—নেই, সূর্য উঠল বলে। এ দেশ সৃষ্টির জন্য আমি রক্ত দিয়েছি। সেই সূর্যের জন্য আমি প্রাণ দেব যা আমার জাতিকে আলোকিত করবে, উজ্জীবিত করবে এর চাইতে বড় পুরস্কার আমার জন্য আর কী হতে পারে।

আমাকে কেউ হত্যা করতে পারে না। আমি আমার সমগ্র জাতির মধ্যে প্রকাশিত। আমাকে হত্যা করতে হলে সমগ্র জাতিকে হত্যা করতে হবে। কোন শক্তি তা করতে পারে। কেউ পারবে না।

আজকের পত্রিকা এল। আমার মৃত্যুদণ্ড ও অন্যান্যের বিভিন্ন শাস্তির খবর ছাপা হয়েছে প্রথম পাতায়। মামলার যা বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা। রাজসাক্ষিদের জবানবন্দীতে প্রকাশ পেয়েছে আমার নেতৃত্বে ৭ই নভেম্বর সিপাহী বিপ্লব ঘটে। আমার নির্দেশে জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করা হয়, আমার প্রস্তাবেই বর্তমান সরকার গঠন করা হয়। সমগ্র মামলায় কাদেরিয়া বাহিনীর কোন উল্লেখই ছিল না। এডভোকেট আতাউর রহমান খান (প্রবীণ রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান—অনুবাদক,) জুলমত আলী (বর্তমানে বি. এন. পি, নেতা—অনুবাদক) ও অন্যান্যে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা যেন এই মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ করেন ও সমগ্র মামলাটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক চক্রান্তকারী জিয়া আমাকে জনগণের সামনে হেয় করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আতাউর রহমান ও অন্যান্যকে বলবে সত্য প্রকাশ করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে যদি তারা ব্যর্থ হন তবে ইতিহাস তাদেরকে ক্ষমা করবে না।

তোমরা আমার অনেক শ্রদ্ধা, ভালবাসা, আদর নিও। বিচার ঘরে বসে জিয়া অনেক কবিতা লেখে, তারই একটি অংশ—

জন্মেছি, সারা দেশটাকে কাপিয়ে তুলতে
কাপিয়ে দিলাম।
জন্মেছি, তোদের শোষণের হাত দুটো ভাঙ্গব বলে
ভেঙ্গে দিলাম।
জন্মেছি, মৃত্যুকে পরাজিত করব বলে
করেই গেলাম।
জন্ম আর মৃত্যুর দুটি বিশাল পাথর
রেখে গেলাম।
পাথরের নিচে শোষক আর শাসকের
কবর দিলাম।
পৃথিবী—অবশেষে এবারের মত বিদায় নিলাম।

তোমাদের তাহের

(এটি অনূদিত পাঠ নয়, মূল চিঠি। বানান ও যতিচিহ্নের ব্যবহার প্রয়াত কর্নেল আবু তাহেরের। চিঠিটি মিসেস লুৎফা তাহেরের সৌজন্যে প্রাপ্ত।—অনুবাদক)

এই বইয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে যেসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাতই নভেম্বরের অভ্যুত্থান হয়েছিল তার ইতিহাস জনসম্মুখে তুলে ধরা।[১] কিন্তু তার চেয়েও বেশি দরকার হচ্ছে তাহেরের গোপন বিচার ও পরবর্তী হত্যাকাণ্ডের কাহিনী প্রকাশ করা। তাহের যাদের প্রতি অনুরোধ করেছেন নৈতিক দায়িত্ব পালন করার নতুবা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মধ্যে যে কোন একটা পথ বেছে নিতে, আজকের বাংলাদেশে প্রকাশ্যে একটা কথাও বললে তারা গ্রেফতার হবেন। (বইটি জিয়ার শাসনামলে প্রকাশিত হয়, তৎকালীন সরকারের আমলে এই বিষয়ে প্রকাশ্যভাবে কোনকিছু বলা পুরোপুরি নিষিদ্ধ ছিল।—অনুবাদক)

সন্দেহ নেই একদিন তারা মুখ খুলবেন। কিন্তু যতদিন তা না হয়, ততদিন আমার এই রিপোর্ট ও তাহেরের জবানবন্দীর প্রকাশনা এই মামলার তথ্য উদঘাটনের পথে হবে প্রথম পদক্ষেপ।

বিদ্রোহের পূর্বকথা

পঁচাত্তরের সাতই নভেম্বর, বাংলাদেশ এক বিপ্লবী অভ্যুত্থানে জেগে উঠল। দক্ষিণ এশিয়ার দূর কোণে অবস্থিত বাংলাদেশের রয়েছে যথেষ্ট সামরিক গুরুত্ব। স্বাধীনতার পর থেকেই তাই তিনটি বৃহৎ বিদেশি শক্তি ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এদেশে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। এদের কাছে এই অভ্যুত্থান ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। এর আগেও পনেরই আগস্ট আর তেসরা নভেম্বর পরপর দুটো সামরিক অভ্যুত্থানে দেশের শাসকশ্রেণীর ঐক্যে বড়সড় ফাটল ধরেছিল। উনিশ শ' পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট সকালে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার এক সামরিক অভ্যুত্থানে উৎখাত হন। এই অভ্যুত্থানের নায়ক ছিলেন ছয়জন আর্মি মেজর আর তাদের নেতৃত্বাধীন হাজার সৈন্যের বাহিনী। যদিও এই অভ্যুত্থানের অনেক ব্যাপারই এখনো অজানা রয়ে গেছে তবুও এ এখন জানা কথা যে এই অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক সংগঠকদের অবস্থান ছিল শেখ মুজিবের নিজের দল আওয়ামী লীগের মধ্যেই। এরা বহুদিন ধরে মার্কিন-পন্থী বলে পরিচিত ছিল।

এই আগস্ট অভ্যুত্থানের প্রধান ও চিহ্নিত চরিত্র হলেন তাহেরুদ্দিন ঠাকুর—তথ্যমন্ত্রী, খোন্দকার মোশতাক আহমেদ—মুজিব সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রী, পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্র বিভাগীয় কর্মকর্তা মাহবুব আলম চাষী। এই অভ্যুত্থানের পেছনে কোন বিদেশি হাত থেকে থাকলেও তা কতদূর পর্যন্ত তার সবটুকু এখনো জানা যায় নি। তবে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান এ ব্যাপারে আগে থেকেই ওয়াকিফহাল ছিল এবং এতে তাদের যথেষ্ট প্রত্যক্ষ ভূমিকাও ছিল। এছাড়াও দেশের অপরিবর্তিত প্রশাসনিক, পুলিশ-গোয়েন্দা কাঠামোতে পাকিস্তানের বিগত দিনের অখণ্ডতার প্রতি অনুরক্ত কিছু সংখ্যক বাঙালি কর্মকর্তা এতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। সামরিক অভ্যুত্থানের পরপরই এদের অনেকেই উচ্চতর প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হন।

আগস্টের সেই দিনের সকালে মুজিবের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণি, ভগ্নীপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাতসহ তাদের পরিবারের প্রায় সকলেই নিহত হন। বাংলাদেশে এর প্রতিক্রিয়া ছিল আচমকা বিস্ফোরণের মতো, তবু সামরিক অভ্যুত্থানের নায়কদের বিরুদ্ধে বাঙালিরা ব্যাপক গণবিক্ষোভ গড়ে তোলে নি। বরং দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিতে অভ্যস্ত অত্যাচারী এই সরকারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে তারা যেন কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিল। মুজিবের রাজনৈতিক অধঃপতনের পেছনে কার্যকর শক্তি ও কারণ সম্বন্ধে আরো জানা যাবে, তবুও একথা বলা যায়, যে মুজিব বাহাত্তরে পাকিস্তানের কারাগার

থেকে ফিরে এসেছিলেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা হয়ে—সেই মুজিব তিন বছর পর মারা গেলেন প্রায় সমর্থনহীন অবস্থায়।

পঁচাত্তরের আগস্ট আর নভেম্বরের মধ্যে অচলাবস্থা আর উত্তেজনার এক অস্থির জীবন যেন স্থান করে নিয়েছিল বাংলাদেশে। বাণিজ্য মন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহ্‌মেদ ইতিমধ্যেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন। একাত্তরের অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারে খোন্দকার মোশতাক ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ইনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি পরম অনুরক্ত। পররাষ্ট্র সচিব মাহবুব আলম চাষীকে নিয়ে তিনি একাত্তরের শেষের দিকে 'পূর্ব পাকিস্তান সংকট'-এর সমাধানের প্রশ্নে মার্কিন প্রস্তাব নিয়ে গোপনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর তিনি অভ্যুত্থানের নায়ক ছয় মেজর এবং ট্যাংক ও গোলন্দাজ বাহিনীর কিছু সংখ্যক সিপাহীসহ রাষ্ট্রপতি ভবনের চার দেয়ালের ভেতর আশ্রয় নিলেন। ক্ষমতায় এসেই তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর মুজিব আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ও আঠার মাসের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন। তবে প্রায় বাষট্টি হাজার রাজবন্দীর মুক্তির দাবির প্রতি তিনি কোন কর্ণপাত করেন নি। তবে কিছু দিনের মধ্যেই আসল সংকটটা পরিষ্কার হয়ে গেল। দেশের শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন বিবাদমান অংশ স্ব স্ব বিদেশি প্রভুদের নিয়ে বাংলাদেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেবার কোন্দলে জড়িয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে পনেরই আগস্টে বেসামরিক সরকারের কাঠামো ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় এই কোন্দলে জড়িয়ে গিয়েছিলেন সামরিক বাহিনীর উচ্চতর পদস্থ অফিসাররা।

সেনাবাহিনী উপ-প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানসহ অনেক উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারকেই মুজিবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে অংশ নেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, তবে অভ্যুত্থান ব্যর্থ হতে পারে এমন আশঙ্কার কারণে তারা এতে উৎসাহ দেখান নি। কিন্তু জিয়া যিনি অতি শীঘ্রই একজন শক্তিশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন তিনি ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে আগে থেকে জেনেও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ ছিলেন। আগস্ট অভ্যুত্থানের সাফল্যের পর সশস্ত্র বাহিনীতে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আগস্ট অভ্যুত্থানের পরপরই মুজিব সরকারের তিন বাহিনী প্রধানকে রাষ্ট্রদূত করে বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয় অন্যদিকে অভ্যুত্থান সংগঠনকারি জুনিয়র অফিসারেরা জেনারেলদের মতো চালচলন শুরু করে। জিয়াউর রহমান নতুন সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন আর খালেদ মোশাররফ জেনারেল স্টাফ প্রধানের পদে পদোন্নতি পান। এর মধ্যে মুজিবের হত্যাকারী জুনিয়র অফিসারদের ভাগ্য নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। উর্ধ্বতন অফিসাররা আগস্ট অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের আদেশ দেন ব্যারাকে ফিরে আসতে কিন্তু নিরস্ত্র হবার ভয়ে তারা ব্যারাকে ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানায়। খালেদ মোশাররফ তাঁর সহকারিদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে এক দেশে দু'টো সৈন্যদল থাকতে পারে না। তারা চাইছিলেন সেনাবাহিনীতে নিয়মিত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক, ব্যারাকে ফিরে আসতে ব্যর্থ হওয়ার

কারণে ছয় মেজরসহ তাদের নেতৃত্বাধীন সৈনিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হোক। কিন্তু সেনাবাহিনী প্রধান জিয়া আগস্ট অভ্যুত্থানের নায়কদের বিরুদ্ধে কোন রকম ব্যবস্থা নিতে অস্বীকার করেন। (লরেন্স লিফশুলৎস তাঁর বইতে 'ছয় মেজরের' কথা উল্লেখ করলেও তিনি নির্দিষ্টভাবে এদের নাম দেন নি। এন্থনি ম্যাসকারেন্‌হাস তাঁর **'বাংলাদেশ-এ লেগেসি অব ব্লাড'** বইতে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করেন নি। তবে সেখানে আগস্ট অভ্যুত্থানে সরাসরি জড়িত মোট সাতজন মেজরের নাম পাওয়া যায়। এরা হচ্ছেন— মেজর ফারুক রহমান, মেজর খন্দকার আবদুর রশীদ, মেজর শারফুল হক ওরফে মেজর ডালিম, মেজর বজলুল হুদা, মেজর আবদুল আজিজ পাশা, মেজর শাহ্‌রিয়ার রশীদ খান ও মেজর নূর। তবে পঁচাত্তরে সেই সময়ে 'ছয় মেজর' কথাটা লোকমুখে খুব প্রচলিত ছিল। সেই থেকেই বোধ হয় শব্দটি এসেছে—অনুবাদক)

তাই তিন মাস না যেতেই উনিশ শ' পঁচাত্তরে নভেম্বরের তিন তারিখে দ্বিতীয়বারের মতো অভ্যুত্থান হলো। এবারের নায়ক ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, তার সমর্থনে ছিলেন কর্নেল সাফায়াত জামিল ও তাদের নেতৃত্বাধীন ঢাকা বিগ্রেড। সকাল বেলায় এরা বঙ্গভবন ছাড়া বাকি সব গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের দখল নিতে সক্ষম হন। মেজর জেনারেল জিয়াকে গ্রেফতার করে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। খালেদ মোশাররফ কালবিলম্ব না করে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি নেন ও নিজেকে নতুন সেনাবাহিনী প্রধান বলে ঘোষণা করেন। সেদিন সারাদিন ধরে গুজব শোনা যাচ্ছিল সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে একটা গৃহযুদ্ধ বেধে যেতে পারে। অন্যদিকে আগস্ট অভ্যুত্থানের নায়করা গোলন্দাজ ও ল্যান্সার বাহিনীর সহায়তায় বঙ্গভবন থেকে মরণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যাবার হুমকি ঘোষণা করলো। অবশেষে দুই দলের মধ্যে বোঝাপড়া হলো। মধস্থতাকারিদের মাধ্যমে ঠিক করা হলো মুজিবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানকারী অফিসারদের নিরাপদে প্রবাসে নির্বাসনে পাঠানো হবে। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় এরা এক বিশেষ ফ্লাইটে ব্যাংকক পাড়ি দিলেন। দেশ ত্যাগের আগের মুহূর্তে এদের অনুগত বলে কথিত লোকদের মধ্যেই কেউ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক মুজিব সরকারের চারজন প্রভাবশালী মন্ত্রীকে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে। এঁদেরকে তাঁদের জেলকক্ষেই হত্যা করা হয়। তাজুদ্দিন আহমেদ, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান, মনসুর আলী আর সৈয়দ নজরুল ইসলাম—এই চারজন খালেদ মোশাররফের একটি সফল অভ্যুত্থানের পর মুজিবপন্থীদের ক্ষমতা প্রত্যাবর্তনে নেতৃত্ব দিতে পারতেন।

তেসরা নভেম্বর অভ্যুত্থানের সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এতে ভারতের প্রতিক্রিয়া। পাঁচই নভেম্বর জেলহত্যার খবর প্রকাশ হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতীয় বেতার এবং সংবাদপত্রগুলো এই অভ্যুত্থানের খবরে উচ্ছ্বসিত আনন্দ প্রকাশ করে। ভারতীয় পত্রিকাগুলো কড়াকড়িভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত। কাজেই ভারতীয়দের এই বাঁধভাঙ্গা খুশির বহর দেখে সবাই সন্দেহ করে এর পেছনে ভারতীয়দের গোপন হাত রয়েছে। অভ্যুত্থানের পক্ষে ভারতীয় 'সরকারি' পত্র-পত্রিকার সুসংগঠিত গোপন খবরের প্রচারণাগুলো স্বতঃস্ফূর্ত না হয়ে বরং সাজানো বলেই মনে হচ্ছিল।

চৌঠা নভেম্বর শেখ মুজিবের স্মৃতি স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা শোভাযাত্রা বের হয়। এই শোভাযাত্রা প্রায়াত প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন পর্যন্ত যায়। এতে খালেদ মোশাররফের মা ও ভাই নেতৃত্ব দেন। এই মিছিলের আয়োজন করে মঞ্চোপন্থী দুই দল, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর), আর বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি (মণি) তাঁর মৃত্যুর পর এটাই ছিল মুজিবের প্রতি সহানুভূতির প্রথম প্রকাশ। কিন্তু মিছিলটা ছিল খুবই ছোট, বেশি লোক তাতে ছিল না। ইতিমধ্যে ঢাকায় গুজব ছড়িয়ে যায় যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা'র' (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং) খালেদ মোশাররফের সহযোগিতায় এই অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। সেনাবাহিনীর ভেতরে খালেদ মোশাররফের সহযোগীরা অবশ্য দাবি করেন যে শুধু সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ সংকটের কারণেই এই অভ্যুত্থান ঘটে, এতে কোন বিদেশি হাত ছিল না। আগস্টের সেই অভ্যুত্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়, তেসরা নভেম্বরের এই অভ্যুত্থানের বেলায় তেমনি কোন বিদেশি শক্তির বিশেষত ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন হাত যদি থেকেও থাকে তবে কতদূর পর্যন্ত তা এখনো প্রতিষ্ঠার অপেক্ষায়।[২]

মূল ঘটনা যাই ঘটে থাকুক না কেন, ক্ষমতায় আসতে না আসতেই খালেদ মোশাররফ "ভারত-সোভিয়েত অক্ষশক্তির" চর হিসেবে চিহ্নিত হন। এই গুজবগুলো সারা শহরে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। শহরটা পরিণত হয় গুজবের আখড়ায়। সত্যাসত্য যাই থেকে থাকুক না কেন এসব গুজবে পরিণতিতে একটা বিস্ফোরণমুখ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

মুজিবের শাসনামলের শেষের দিকে ভারতের প্রতি আর ভারতের সাথে মুজিবের রাজনৈতিক সাদৃশ্যের প্রশ্নে মানুষের মনে প্রবল বিদ্বেষ জন্মায়। এই অবস্থার সৃষ্টি হয় বিশেষ করে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের পর। তেতাল্লিশের যেই দুর্ভিক্ষে প্রায় ত্রিশ লাখ মানুষের অপমৃত্যু হয়েছিল চুয়াত্তর তারই কথা মনে করিয়ে দেয়।[৩] পঁচাত্তরের মধ্যে ভারতের প্রতি বিদ্বেষ আর মুজিবের ওপরে বিতৃষ্ণা সমার্থবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উনিশ শ' চুয়াত্তরটা ছিল একদিকে বিশ্বপণ্য বাজারের জন্য চরম সংকটের কাল, সেইসাথে বিশ বছরের মধ্যে ভয়ংকরতম প্রলয়ংকরী বন্যা এর সাথে যুক্ত হয়। দেশের কোন কোন জায়গায় চালের দাম প্রাক-স্বাধীনতা আমলের তুলনায় শতকরা হাজার ভাগ বেড়ে যায়। অনেকেরই তখনো মনে ভাসছিল শেখের সেই প্রতিজ্ঞা—চালের দাম স্বাধীনতার পর অর্ধেক নেমে আসবে, আর উল্টো কিনা দাম দশ গুণ বেড়ে গেল! অনাহারে-অর্ধাহারে থাকা দরিদ্র বাংলাদেশীদের কানে ভেসে এসেছিল অবিশ্বাস্য সব খবর—ভারতে অবৈধ উপায়ে চাল আর পাটের চোরাচালান করে লোকে নাকি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে। শেখ মুজিবের এক ভাই ছিলেন চোরাচালানীদের অন্যতম নেতা। সীমান্ত চোরাচালানী তৎপরতার খবর ছিল সত্য। ভারত একদিন পাকিস্তানি গণহত্যা বন্ধ করতে যুদ্ধ করেছিল, এখন আর বাঙালির কাছে ভারতের সেই আগের বন্ধুসুলভ ইমেজ রইল না, বরং ভারতকে দেখা হতে লাগল একটা উপ-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে, যে ভারত বাংলাদেশকে রক্তশূন্য করে তুলছিল।

একদিকে খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান ভারত-পন্থী হবার অভিযোগে কলঙ্কিত। অন্যদিকে আকাশবাণীর উচ্ছ্বসিত আনন্দ তখন সেই গুজবে পাকা ভিত্তি দিয়ে দিল। খালেদ মোশাররফের রাজনৈতিক ও সামরিক ভিত্তি ছিল সংকীর্ণ, এবারে তা-ও তার পায়ের তলা থেকে সরে যেতে লাগল। এধরনের এক পরিস্থিতিতে যখন বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশ একে অন্যের বিরুদ্ধে স্বার্থপর লড়াইয়ে ব্যস্ত বিভিন্ন বিবাদমান দলগুলো তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি তারা এক অভূতপূর্ব বিপ্লবী অভ্যুত্থানের দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে।

সাতই নভেম্বরের অভ্যুত্থান

তেসরা নভেম্বরের রাত্রি। সে বছরে দ্বিতীয় বারের মতো অভ্যুত্থান ঘটানোর প্রস্তুতিতে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বাধীন সেনারা বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিয়েছে। প্রথমেই তারা সেনাবাহিনী প্রধান মেজর-জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাসভবন ঘেরাও করে ফেলে। তখন ভোর চারটে। জিয়া ঘুম থেকে উঠেই অবস্থা বুঝে ঢাকার বাইরে একটা জরুরি টেলিফোন করলেন। অন্যপ্রান্তে এই কল রিসিভ করেন কর্নেল আবু তাহের, জিয়ার একসময়ের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত বন্ধু ও স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন এগারো নম্বর সেক্টরের সহযোদ্ধা।[৪] এবারে জিয়ার নিজের জীবনই বিপন্ন। জিয়া তাহেরকে একটা কিছু করার জন্য অনুরোধ করেন বলে শোনা যায়। জিয়া তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না, তার আগেই লাইন কেটে গেল।

তাহেরের সাংগঠনিক নির্দেশনায় নভেম্বরের চার থেকে ছয় তারিখের মধ্যে প্রতিদিন রাত্রিতে জুনিয়র অফিসার আর সিপাহীদের মধ্যে গোপন সভা অনষ্ঠিত হয়। তাহেরসহ এরা সবাই 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার' অধীনে কাজ করছিলেন। গোপনে এই সংস্থার কাজ চলছিল কিছুদিন ধরেই, কিন্তু সাত তারিখের সকালেই এর অস্তিত্ব প্রথমবারের মতো জনসমক্ষে প্রকাশ পায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্তন গেরিলা সৈনিক সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল 'বিপ্লবী গণবাহিনী'। এর সাথে মিলে ঢাকা সেনানিবাসের সিপাহীরা খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' আর 'বিপ্লবী গণবাহিনী'—এ দুটোই জাসদের সশস্ত্র শাখা। বাংলাদেশের মার্কসীয় ধারায় জাসদ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তি।

তাহের ছিলেন বিপ্লবী বাহিনীর গোপন সামরিক অধিনায়ক। সাতই নভেম্বরে তাহের ও জাসদ যা ঘটিয়েছিলেন তাকে শুধু পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনার একটা মাধ্যম হিসেবে দেখলে ভুল হবে। মুজিবের উৎখাতের কয়েক মাস আগে থেকেই জাসদ এক সার্বিক গণঅভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মুজিবের ক্ষমতাচ্যুতির পর জাসদ এই শাসকগোষ্ঠীর পতনে খুশি হয়েছিল, কিন্তু হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানাতে ভুল করে নি। হত্যাকাণ্ড আর প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলে রাষ্ট্রযন্ত্র মৌলিকভাবে খুব কমই পরিবর্তিত হয়। আগস্টের পর জাসদের পক্ষ থেকে কর্মীদের মার্কসের রচিত **'ফ্রান্সের শ্রেণী সংগ্রাম'** বইটা বিশেষ করে এতে সন্নিবেশিত এঙ্গেলস্-এর ভূমিকা পড়তে ও বুঝতে উৎসাহিত করা হয়। এঙ্গেলস্ তাঁর ভূমিকায় সামরিক অভ্যুত্থানের শাসকশ্রেণীয় এবং জনবিচ্ছিন্ন চরিত্র উন্মোচন করে দিয়েছিলেন।

আগস্টের পর থেকে দেশে একটার পর একটা অভ্যুত্থান হচ্ছিল। জাসদ এবং তাহের ভিন্ন পথ নেয়ার কথা বলছিলেন। এরা বলেন যে, সামরিক বাহিনীতে কিছু সংখ্যক সংকীর্ণমনা ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সাধারণ সিপাহীদের একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছে। তারা সাধারণ সিপাহী কিংবা দেশের নির্যাতিত জনগণের শ্রেণী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না। নভেম্বরের পাঁচ তারিখে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার' নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন সেনানিবাস ও শহর এলাকায় হাজার হাজার প্রচারপত্র ছড়িয়ে দেয়া হয়। সিপাহীদের আহ্বান করা হয় সামরিক অফিসারদের ষড়যন্ত্র-পাল্টা-ষড়যন্ত্রের খেলায় গুটি হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্যে প্রস্তুত হবার জন্য। গণঅভ্যুত্থানের ডাক হিসেবে বারো দফা দাবি পেশ করা হয়।

অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা দুটো আলাদা ভাগে বিভক্ত ছিল। ছয় তারিখ সন্ধ্যায় তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বিদ্রোহের প্রথম পর্ব কার্যকর করার চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়া হয়। এতে ঢাকার সব সেনা ইউনিটের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। একই সাথে দেশের অন্যান্য সেনানিবাসেও নির্দেশ চলে যায়। বিদ্রোহের প্রথম পর্বে করণীয় ছিল মেজর জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করা আর সম্ভব হলে খালেদ মোশাররফকে তার অন্যান্য সঙ্গীসহ জীবন্ত আটক করা। একই সাথে শুরু দ্বিতীয় পর্বের। দ্বিতীয় পর্বের পরিকল্পনা ছিল খালেদ চক্রের পরাজয়ের পর সাত তারিখ সকালে অভ্যুত্থানকে সমর্থন করে মিছিলের আয়োজন করা আর সৈনিকদের বারো দফা দাবিকে মূল দাবি হিসেবে জনগণের সামনে তুলে ধরা। জিয়ার মুক্তি হবে অভ্যুত্থানের প্রতীকী ব্যাপার কিন্তু সিপাহীদের দাবি হবে বিদ্রোহের মূল ভিত্তি। বিদ্রোহের এই দ্বিতীয় পর্যায় সাতই নভেম্বরের বিদ্রোহকে পনেরই আগস্ট ও তেসরা নভেম্বরের দুই সংকীর্ণ ষড়যন্ত্র থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে তুলেছিল। তাছাড়া সেদিন হাজার হাজার মানুষ ঢাকার রাস্তায় বের হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহী সৈনিকদের স্বাগত জানায়, এর আগে তা দেখা যায় নি।

সৈনিকদের বারো দফা দাবিতে একদিকে 'বিপ্লবী সেনাবাহিনী' গঠন করার দাবি থেকে শুরু করে ব্রিটিশ রাজত্বের ত্রিশ বছর পরও দোর্দণ্ড প্রতাপে প্রচলিত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সামরিক কালাকানুন বাতিলের দাবি পর্যন্ত সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত ছিল। বারো দফা দাবির ভূমিকা ছিল এই রকম—

> আমাদের বিপ্লব নেতা বদলের জন্য নয়। এই বিপ্লব গরিব শ্রেণীর স্বার্থের জন্য। এতোদিন আমরা ছিলাম ধনীদের বাহিনী। ধনীরা তাদের স্বার্থে আমাদের ব্যবহার করেছে। ১৫ই আগস্ট তার প্রমাণ। তাই এবার আমরা ধনীদের দ্বারা বা ধনীদের স্বার্থে অভ্যুত্থান করি নি। আমরা বিপ্লব করেছি। আমরা জনতার সঙ্গে একত্র হয়েই বিপ্লবে নেমেছি। আমরা জনতার সঙ্গে থাকতে চাই। আজ থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হবে গরিব শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার একটি গণবাহিনী।[৫]

সৈনিকদের দ্বিতীয় দাবি ছিল সকল রাজবন্দীর মুক্তিদান। সাতই নভেম্বরের ঘোষণায় অন্যান্য দাবির মাধ্যমে মূলত অফিসার ও সাধারণ সেপাইদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টিকারী

নিয়ম-কানুনের অবসান দাবি করা হয়। এই ঘোষণায় শ্রেণীহীন সমাজের পূর্বশর্ত হিসেবে শ্রেণীহীন সেনাবাহিনীর দাবি জানানো হয়। বিশেষ শিক্ষালয় থেকে পাস করা দেশের সুবিধাভোগী অভিজাতক শ্রেণীর সন্তানদেরকে সশস্ত্র বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সুবিধাদানের ব্যাপারেও তারা আপত্তি জানায়। (লেখক 'বিশেষ শিক্ষালয়' বলতে ক্যাডেট কলেজের কথাই বুঝিয়েছেন।—অনুবাদক) এর বদলে সাধারণ সৈনিকদের মধ্য থেকে অফিসার নিয়োগের দাবি জানানো হয়। সিপাহীরা 'ব্যাটমান' প্রথার অবলুপ্তি দাবি করে এই নিয়মের অধীনে সিপাহীদের উচ্চপদস্থ অফিসারদের বাড়িতে চাকর-বাকরের কাজ করতে হতো। এরা উচ্চতর বেতন আর বিনে ভাড়ায় বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দাবিও জানায়।

সৈনিকদের এই দাবিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনীতে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক সামরিক কর্তৃত্ব ও নীতি নির্ধারণী সংস্থা সৃষ্টির দাবি। এই ঘোষণায় বলশেভিকদের সৃষ্ট 'সেনা সোভিয়েত' ব্যবস্থার অনুকরণে কমিটি গঠনের আহ্বান জানানো হয়। 'বিপ্লবী সৈনিকদের দায়িত্ব' শিরোনামে এক অনুচ্ছেদে এরা 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' গঠনের জন্য সব সেনা ইউনিটের কাছে আহ্বান জানান। এসব ইউনিটের কাজ হবে পুরো ঢাকা সেনানিবাসের জন্য সৃষ্ট একটা কেন্দ্রীয় বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। ঘোষণাপত্রে বলা হয়—

> এই কেন্দ্রীয় সংস্থার অধিকার থাকবে সব ধরনের নীতি-নির্ধারণ করবার। জেনারেল জিয়া কেবল এদের সাথে আলোচনার পরই কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। এই কেন্দ্রীয় সংস্থা বাকি সেনানিবাসগুলো ছাড়াও বিপ্লবী ছাত্র-জনতা-কৃষক শ্রমিকের সাথে এক হয়ে কাজ করবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই বিপ্লবী বাহিনীর সাথে প্রগতিশীল শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতা সক্রিয়ভাবে যুক্ত।[৬]

একটা সংগঠিত সেনাবাহিনী থেকে এধরনের শক্তিশালী বিপ্লবী শক্তির উত্থান দক্ষিণ এশিয়ার জন্য এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। কিন্তু আসলে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তলিয়ে দেখতে গেলে এতে অবাক হবার কিছুই নেই। বহু আগে একাত্তরের মার্চ মাসেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী থেকে বাঙালি সেনারা নিয়মিত বাহিনীর সব প্রচলিত আইন-কানুন ছুঁড়ে ফেলে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। বহুদিন ধরেই এসব সেনা ইউনিটের অফিসার ও সিপাহীরা সামরিক ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে আসছিল। উপজাতীয় অসন্তোষ আর বিদ্রোহ দমন করেই এতদিন এদের সময় কাটছিল। হঠাৎ করেই পরিস্থিতি এদের ঠেলে দিল বিপরীত মেরুতে। গ্রামে গ্রামে গেরিলা বাহিনী সংগঠন করে এক ব্যাপক গণজাগরণের নেতৃত্ব দেয়ার ভার পড়ল তাদের ওপর। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সেনাবাহিনীর অনেক অফিসার ও সিপাহীর চিন্তাধারাকে বদলে দেয়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক সাথে যুদ্ধ করতে যেয়ে এদের অনেকেই বিভিন্ন মার্কসীয় সংগঠনের এমন অনেক সদস্যদেরকে পাশাপাশি সহযোদ্ধা হিসেবে পান—যাদের

স্বাধীনতা অর্জনই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবও। দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্রে পৃথিবীর দরিদ্রতম অঞ্চল। সেই প্রেক্ষিতে তাদের এই লক্ষ্যের যথেষ্ট আবেদন ছিল। বছরের পর বছর ধরে শক্তি সঞ্চয়ের পর নভেম্বরের সাত তারিখে এরাই বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ফ্রন্টিয়ার মন্তব্য করে—

> বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিকেরা তাদের অফিসারদের বিরুদ্ধে এক গণঅভ্যুত্থানের আয়োজন করে, এর মাধ্যমে 'চর' খালেদ মোশাররফের অপসারণই তাদের একমাত্র দাবি ছিল না। সেই সাথে তারা বারো দফা দাবির তাৎক্ষণিক বাস্তবায়নের দাবি জানায়। এই দাবি শুধু প্রতিদিন পেট ভরে ডাল-ভাত পাবার নিশ্চয়তার দাবি না, এটা হচ্ছে একটা সংগঠিত সেনাবাহিনীতে সুপরিকল্পিত বামপন্থী ধারার বহিঃপ্রকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার জন্য এ-এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। এটা হচ্ছে একটা নিয়মিত বাহিনীকে একাত্তরে গেরিলা বাহিনীতে পরিণত করার ফল, গত চার বছরে যা তিলে তিলে অঙ্কুরিত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।[৭]

ছয় তারিখের মধ্যরাত্রির মধ্যেই বিদ্রোহের সব প্রস্তুতি শেষ হয়। গভীর রাতে শুরু হলো গোলাগুলি। আসল লড়াই সীমাবদ্ধ ছিল ঢাকা সেনানিবাস এলাকায়। সেইসাথে রংপুর আর চট্টগ্রামেও বিদ্রোহ শুরু হয়। কুমিল্লা আর যশোর থেকে বিদ্রোহের সমর্থনে সেনারা ঢাকায় রওয়ানা হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিপ্লবের প্রথম পর্ব সাফল্যজনকভাবে শেষ হয়। ৩রা নভেম্বরে যারা ক্ষমতা দখল করেছিলেন সেই খালেদ মোশাররফ ও তাঁর সহযোগী অফিসারদেরকে উৎখাত করা হয়। খালেদ ও তাঁর সহযোগীরা তখন পালাবার চেষ্টায় মরিয়া, এ সময় ঢাকা সেনানিবাসের বাইরে দ্বিতীয় রাজধানী বলে পরিচিত এক জায়গায় বিদ্রোহী সেনারা তাদের হত্যা করল। (পাকিস্তান আমলে জায়গাটি 'দ্বিতীয় রাজধানী' বলে পরিচিত ছিল, বর্তমানে তা 'শেরে-বাংলা নগর নামে পরিচিত— অনুবাদক।)

বিদ্রোহের তাজা আমেজ তখন পুরো ঢাকা শহরে। পনেরই আগস্ট আর তেসরা নভেম্বরে ঢাকা যেন ছিল 'মৃতের নগরী'। সেদিন সিপাহীদের সমর্থনে সমবেত উচ্ছ্বসিত জনতার উল্লাসে ঢাকার রাস্তাঘাট নতুন প্রাণ ফিরে পেল। সৈন্যরা ফাঁকা গুলি করতে করতে ও শ্লোগান দিতে দিতে ঢাকার রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সবার মুখে তখন একই শ্লোগান— 'সিপাহী-জনতা ভাই ভাই'। চারদিকে খুশির আমেজ। দুর্ভিক্ষ, বন্যা আর দুর্নীতির অন্ধকারে ঢেকে যাওয়া একাত্তরের সেই উৎসাহ-উদ্দীপনা, মনে হচ্ছিল যেন তা আবার ফিরে এসেছে।

সাত তারিখ সকালে কর্নেল তাহের দ্বিতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর সদর দপ্তরে যান। এখানে সিপাহীরা জিয়াকে উদ্ধার করার পর নিয়ে এসেছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, জিয়া আর তাহেরের মধ্যে সেই সাক্ষাৎ ছিল চরম আবেগময়। রাতের পোশাক পরিহিত জিয়া তাহেরকে দেখার সাথে সাথেই সবার সামনে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। তিনি তাঁর জীবন রক্ষার জন্য তাহেরকে ধন্যবাদ জানান। পরে সিপাহীরা জিয়ার গলায় ফুলের মালা

পরিয়ে দিলে জিয়া তা তাহেরের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেন— 'এই লোকই মালা পাবার যোগ্য।' দীর্ঘদিন ধরে এই দু' ব্যক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে এরা একই সেক্টরে যুদ্ধরত ছিলেন। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন কৌশলগত প্রশ্নেও দু'জন একই মত পোষণ করতেন। স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন প্রশ্নে বিতর্কের সৃষ্টি হলেও সেনাবাহিনী উপ-প্রধান হিসেবে জিয়া তার দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যথাক্রমে ঢাকা ও কুমিল্লা বিগ্রেডের অধিনায়ক কর্নেল জিয়া আর কর্নেল তাহেরের দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার ছিলেন ও কৌশলে তাদের সমর্থন করে যান। সেনাবাহিনী সংগঠনের ব্যাপারে নিজেদের বামপন্থী চিন্তাধারার জন্য জিয়াউদ্দিন আর তাহেরকে মুজিব সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার করার পরও জিয়ার সাথে তাহেরের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন ছিল। কাজেই এটা খুবই স্বাভাবিক যে, চার তারিখে জিয়া প্রাণ বাঁচাবার আশায় তাহেরের কাছেই টেলিফোন করবেন। প্রশ্ন আসতে পারে জিয়া কি তাহেরের সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন? অবশ্যই না, কিন্তু জিয়া কল্পনাও করতে পারেন নি যে তাহের এবং জাসদের নেতৃত্বে সংগঠিত অভ্যুত্থান এ-ধরনের ব্যাপকরূপ নিতে পারে।

সাত তারিখের খুশির আমেজ বেশিক্ষণ টিকল না। জিয়ার ব্যক্তিগত ইতিহাস থেকে সিপাহীরা ধারণা করে নিয়েছিল যে জিয়া অভ্যুত্থানের বিপ্লবী মাত্রা সমর্থন না করলেও প্রত্যক্ষভাবে সৈনিক-কমিটি গঠনের বিরোধিতা করবেন না। সাত তারিখ সন্ধেবেলায় জিয়া বারো দফা দাবিতে সমর্থনের স্বাক্ষর করেন ও তা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেন। 'জিয়ার এই সমর্থন কি ছিল ক্ষণিকের বিশ্বাস, না শুধুই ছলনা তা ভাববার বিষয়। বিপ্লবীরা কোনদিন ভাবতেও পারে নি, এই জিয়াই পরে ডানপন্থী শক্তির পুনরুত্থানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবেন। কিন্তু জিয়াকে সমর্থন দেয়াই বিপ্লবীদের কাল হলো।[৮] লেনিন বলে গিয়েছিলেন, সেনাবাহিনীর অর্ধেক অংশ বিপ্লবীতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত কোন দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হতে পারে না। অভ্যুত্থান ও তার পরবর্তীকালে যদিও আরো অনেকেই বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়েছিলেন, তবুও প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে লেনিন যতটুকু শ্রেণী-চেতনা বাহিনীর কথা বলেছিলেন, স্পষ্টতই বাংলাদেশের সেনাবাহিনী তখনো সেই পর্যায়ে পৌঁছে নি।

বিদ্রোহের পর বিশ্বাসঘাতকতা, সাহসিকতা আর মৃত্যুবরণের যে করুণ নাটক অনুষ্ঠিত হয় তার বিশ্বস্ত রূপায়ণ হয়তো কেবল শেক্সপীয়র কিংবা থুসিডিয়াসের মতো নাট্যকাব্যের পক্ষেই সম্ভব। একসময়ের দু ভ্রাতৃসম ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাহের আর জিয়া যে প্রশ্নে পরস্পর শত্রুতে পরিণত হন, বলা যায় সেই একই প্রশ্নে পুরো অনুন্নত পৃথিবীটাই দু ভাগ হয়ে রয়েছে। কি হওয়া উচিত? পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র একটি দেশে বিপ্লবী সমাজতন্ত্র নাকি মার্কিন সাহায্যপুষ্ট ও বিশ্বব্যাঙ্কের পরিকল্পনাপুষ্ট পুঁজিবাদী উন্নয়ন?

সাত আর আট-ই নভেম্বর একই সাথে অন্যান্য সেনানিবাসেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। অফিসার ও সিপাহীদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। ঢাকা আর রংপুরে সিপাহীরা প্রায় চল্লিশজন অফিসারকে হত্যা করে বলে ধারণা করা হয়। প্রাণে বেঁচে যাওয়া অফিসাররা পরিবার পরিজন নিয়ে সেনানিবাস থেকে পলায়ন করেন। নয়-ই

নভেম্বর একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার অভিযোগ করেন যে, মাত্র এক-তৃতীয়াংশ অফিসার তাদের নেতৃত্ব বজায় রেখেছেন, বাকিরা পলায়ন করেছেন। বিদ্রোহীদের হাতে যেসব অফিসার মারা যান, তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত; অন্যরা মারা যান বারো দফা বাস্তবায়নের আন্দোলনকারী সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে। অনেক অফিসার যদিও বিপ্লবের প্রথম অংশ সমর্থন করেছিলেন, অন্যান্য দাবির বাস্তবায়নে তারা তীব্র প্রতিরোধ করেন। অনেক অফিসার এই পর্যায়ে তাদের সামরিক কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করে নিজ নিজ ইউনিটকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন। অনেক ইউনিট এসময় তাদের অধিনায়কদের জানায় যে, অফিসাররা আর নেতৃত্বে নেই। নির্দিষ্ট কিছু লোক তাদের অফিসারদের ইউনিফর্ম থেকে পদমর্যাদাসূচক ব্যাজ ছিঁড়ে ফেলে বলে জানা যায়। বিভিন্ন বিগ্রেড ও ব্যাটেলিয়নের অধিনায়কদের জানিয়ে দেয়া হয় কর্তৃত্বের নতুন কাঠামো হিসেবে বিপ্লবী সেনা-কমিটি গঠনে তাদের অবশ্যই সায় দিতে হবে। এই মুহূর্তে নিজ নিজ অবস্থান সংহতকরণের ইচ্ছায় উভয় পক্ষই অন্যদিকে অস্ত্র তাক করে, গোলাগুলি শুরু হলে অনেক সিপাহী ও অফিসার মারা যায়। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল কুমিল্লা। সেখানে কোন বড়সড় ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই অভ্যুত্থান সফল হয়। অফিসারদের আটক করে ফেলে তাদের নেতৃত্ব উদ্ধার করার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়া হয়। এভাবেই মৃত্যু এড়ানো গিয়েছিল। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার পক্ষ থেকে নির্দেশ জারি করা হয়, যে সমস্ত 'প্রতিক্রিয়াশীল' অফিসাররা বিপ্লবী দাবির প্রতি সমর্থন দানে ব্যর্থ হবেন তাদের যেন আটক করে রাখা হয়, সংস্থার লক্ষ্য ছিল এদের অবশেষে সামরিক দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দেয়া।

রাজধানীতে অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার পর তা খুব তাড়াতাড়ি বিভিন্ন জেলাশহরে ছড়িয়ে পড়ে। পরে তা এমনকি গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে যায়। এসব ঘটনাপ্রবাহ গ্রামাঞ্চলে কেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল তা নিয়ে খুব কম রিপোর্টই লেখা হয়েছে। তারাপুর গ্রামের ওপর অভ্যুত্থানের প্রভাব নিয়ে এমন একটা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য এই রিপোর্টের প্রায় পূর্ণাংশই উদ্ধৃতির যোগ্য—

> তারাপুরে পার্টির কাজকর্ম গত এক বছর ধরে চলত খুবই বিচ্ছিন্নভাবে। মাঝে মাঝে স্থানীয় জাসদ কর্মীরা এসে পার্টিতে যোগ দিয়ে সমাজতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্য গ্রামের তরুণদের আহ্বান করতো। গ্রাম্য যুবকদের অনেকেই এই তরুণদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছিল, এমন কি নিজেদের বাড়িতেও তারা এদের রাতে থাকতে দিত। কিন্তু সার্বিকভাবে গ্রামবাসীদের প্রায় সবাই কোনকিছু করতে পারার ব্যাপারে এদের ক্ষমতা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। একাত্তরের বিভীষিকা আর মুজিব শাসনামলের দুর্দশা পার করার পর এরা সহজে কোন রাজনৈতিক দলকে বিশ্বাস করতে চাইতেন না। অবশ্য ধনিক বিরোধী, সরকার বিরোধী শ্লোগান এখনও এদের কানে মধুর লাগে... সাতই নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর তারাপুরের রাজনৈতিক

আবহাওয়ার বড়ো রকমের পরিবর্তন আসে। কাছের সেনানিবাসের সিপাহীদের বিপ্লবী অভ্যুত্থান আর অনেক দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ অফিসারের মৃত্যুদণ্ডের ঘটনা গ্রামের লোকদের বহুল আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। জাসদের কর্মীরা তাদের অস্ত্র লুকোনোর কোন চেষ্টা না করে এমনকি দিনের বেলায়ও ঘোরাফেরা করতে থাকে। প্রথম দিকে জিয়া যতদিন বারো দফা দাবির বাস্তবায়নের প্রতি অনুরক্ত থাকবেন, ততদিন তাঁর প্রতি সমর্থন দানের জন্য এরা আহ্বান জানায়। তারা এলাকায় জাসদ সমর্থকদের এক বিরাট প্রকাশ্য মিছিলের আয়োজন করে। নতুন সরকার দক্ষিণপন্থী হয়ে পড়ছেন বলে বিবেচনা করার পর জাসদ কর্মীরা প্রকাশ্যে জিয়ার সমালোচনা করে ও তাৎক্ষণিক নির্বাচনসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবি জানায়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে— এরা তারাপুর গ্রামবাসীকে গুরুত্বের সঙ্গে সংগঠিত করতে থাকে। ক্ষমতা দখলে জাসদের ব্যর্থতা সত্ত্বেও সাত তারিখের বিপ্লব যেভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয় ও সেনা বাহিনীতে অধিক মাত্রায় বিপ্লবীদের সমাবেশ করে তাতে তারাপুর গ্রামের সবচেয়ে হতাশ লোকটাও ভাবতে শুরু করে যে, এবারে হয়তো অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে।

অভ্যুত্থানের কয়েক সপ্তাহ পরে কাটাবন্দুক হাতে এক তরুণ জাসদ কর্মী তারাপুরে আসে। গ্রামের যুবকরা তার চারদিক ঘিরে ধরলো, বৌ-ঝিরা ঘোমটা দিয়ে বেড়ার ফাঁকে এসে দাঁড়ালো—তারা এই অদ্ভুতযন্ত্রের কাজ দেখতে চায়। তারপর সেই রহস্যময় যন্ত্রের রহস্য উন্মোচিত হলো। সেদিন সন্ধ্যায় এক সভা হয়। এতে উপস্থিত বেশির ভাগই তরুণ যুবক, অবশ্য প্রবীণরাও মাঝে মাঝে এসে যোগ দিচ্ছিলেন। গ্রামের শিক্ষিত যুবকদের ওপর দায়িত্ব দেয়া হলো মার্কসের লেখা থেকে সহজ কিছু তত্ত্ব পড়ে তা অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে বলার জন্য। বিপ্লবী গণবাহিনীতে নিয়োগের জন্য সদস্য যোগাড় করার কথাও চিন্তা করা হয়। কিন্তু বাড়ির কাজকর্মের জন্য তরুণদের কেউই কাজ করতে নিজে থেকে উৎসাহ দেখাল না। অবশ্য গণযুদ্ধের ব্যাপারে তারা খুব উৎসাহ দেখায়।

সেখানে জাসদের কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল নীতিতে শিক্ষিত জাসদের একদল কর্মী গড়ে তোলা, যার পরে আশে-পাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে ও সাধারণ মানুষকে সচেতন ও সংগঠিত করে তুলবে। গ্রাম থেকে কয়েকজন তরুণকে পাঠানো হয় পাশাপাশি কয়েকটা ইউনিয়নের জাসদ কর্মীদের এক বড় সমাবেশে যোগ দেয়ার জন্য। সভায় তারা দলের স্থানীয় নেতৃত্বের সাথে পরিচিত হয়। এই এলাকার জন্য ব্যাপকভিত্তিতে যে লক্ষ্য গৃহীত হয়, তা ছিল ডাকাত উচ্ছেদ করা, দুর্নীতিপরায়ণ অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগ সদস্যদের পাকড়াও করা আর এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার

ভার পার্টির হাতে নেয়া। অবস্থাপন্ন জোতদার ও গ্রামীণ সমাজের ওপরতলার লোকদের ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণের পরিকল্পনা হঠকারী হিসেবে বিবেচিত হয়। অবশ্য স্থানীয় কিছুসংখ্যক নেতাকে এই বলে সাবধান করে দেয়া হয় যে, কোনভাবে দলীয় কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টির চেষ্টা করলে কিংবা কোন কর্মীকে পুলিশের হাতে উঠিয়ে দিলে তাদের হত্যা করা হবে। এতেই কাজ হয়। প্রাণের ভয়ে এরা সবাই পার্টির স্বার্থে সহযোগিতা করতে রাজি হয়। অনেকে এমনকি কর্মীদের রাতে ঘোরাফেরা করার জন্য গরম চাদর থেকে শুরু করে সভার জন্য বিড়ি সিগারেট পর্যন্ত পাঠাতে শুরু করে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এলাকার দুজন দুর্ধর্ষ ডাকাতকে দল কর্তৃক হত্যা করা হয়। স্থানীয় জনগণকে নানাভাবে উত্যক্ত করা ছাড়াও এদের বড়ো দোষ ছিল যে তারা জাসদের নামে ডাকাতি করতো। সেই অপরাধ তাদের জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। ছোটখাট চোরদেরও হালকা শাস্তি দেয়া হয়। চুরি-ডাকাতির বিরুদ্ধে দলের অভিযানের ফলে সাধারণের মধ্যে এর ব্যাপক শুভ প্রতিক্রিয়া পড়ে। আগে যেখানে থাকা-খাওয়ার চিন্তায় কর্মীদের তটস্থ থাকতে হতো, এখন হঠাৎ করেই চারদিক থেকে তাদের কাছে দাওয়াত আসতে থাকে। এক বৃদ্ধা বলেন—'মুজিবও শেষে তার কর্মের ফল পেয়েছে, তেমনি চোরগুলোও এবারে মজা বুঝুক। সেই দলের লোকেরা তাদের শাস্তি দিবে। কাল রাত্রিতে এসে তারা জেনে গেছে কারা আওয়াল মিঞার বাড়ি থেকে চাল চুরি করেছে।' আসল সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে যখন প্রথমবারের মতো একের পর এক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে তখন এলাকার শাসন পরিচালনায় দলের যোগ্যতার ওপর জনগণের আস্থাও দিন দিন বেড়ে যায়। আগে পুলিশ আর সেনাবাহিনী সম্পর্কে গ্রামবাসীদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল ঠিক উল্টো রকম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এলাকার সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ ব্যক্তির সাথেই ছিল সরকারি লোকের উঠাবসা। কোন অজুহাত পেলেই এরা অবাধে গ্রামবাসীদের বাড়ি লুট করে বিনা কারণে ব্যাপক ধরপাকড় চালাতো। এলাকায় আইনের কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে জাসদ কর্মীরা দেখিয়ে দিল যে, আইন ও বিচার-ব্যবস্থার ব্যাপারে তাদের ধারণা রাষ্ট্রীয় ধারণা থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন।

এক সময় আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন ও মুজিবের শাসনামলে বিপুল পরিমাণে রিলিফ সামগ্রী আত্মসাৎ করেছিলেন—এমন একজন জোতদার তারাপুরের কাছেই থাকতেন। অতীতের কুকর্মের জন্য দলীয় অনেক কর্মীই তার শিরচ্ছেদ করার অপেক্ষায় ছিল। এ ব্যাপারে গ্রামের দলীয় সমর্থকদের পরামর্শ চাওয়া হলে তারা জোর দিয়ে বলেন যে, একদিকে এতে গ্রামে সরকারি নির্যাতন নেমে আসবে, আবার অন্যদিকে অনেকেই এই হত্যাকাণ্ডে দিশেহারা হয়ে একে অপ্রয়োজনীয় রক্তারক্তি মনে করবে, পার্টি অনেক সমর্থক হারাবে। এর বদলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, বরং তার কাছে যেয়ে ভয় দেখানো

হোক—পার্টির কাজে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে হত্যা করা হবে। মুজিব-আমলের দুর্ধর্ষ-নির্দয় এই রাজনীতিবিদ এবার নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে শুরু করলেন। পার্টি সভ্যদের সাথে দেখা করে প্রায়ই তিনি মোলায়েম কণ্ঠে জানতে চাইতেন কোনোভাবে তাদের সাথে যোগ দেয়া যায় কি-না। এই কৌশলের সাফল্য গ্রামবাসীদের একতায় নতুন শক্তি জাগায়। তারা আশান্বিত নেত্রে তাকাতে থাকেন সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে যেদিন এর মতো আরো অন্যান্য ঘৃণিত সমাজবিরোধীদের প্রকাশ্যভাবে জনতার আদালতে বিচার করা সম্ভব হবে। ছেঁড়া কাপড় গায়ে বর্গাচাষীরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করতো—বড় বড় জমির মালিকদের বিরুদ্ধে তারা যদি প্রতিশোধ নেয়া শুরু করে তাহলে শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা কি দাঁড়াবে।[৯]

সাতই নভেম্বরের বিপ্লব সময়ের অনিবার্য ফলাফল, সেইসাথে তা নতুন এক দিগন্তের পথ দেখায়। ইতিহাসের আরো অনেক বিপ্লবের মতোই সমস্ত সমাজকাঠামো ভেঙ্গে দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিচুতলার মানুষেরা জেগে উঠেছিল উপরতলার লোকদের বিরুদ্ধে। ষড়যন্ত্রের মরণ খেলায় মত্ত সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্রাংশ কিংবা কয়েকজন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বদলে পুরো বাঙালি সমাজ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে ধাবিত হলো। অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলেও সৃষ্টি হলো নতুন রাজনৈতিক পরিবেশ, শুরু হলো নতুন দিগন্তের।

জাতীয় প্রশ্ন আর জাতীয় স্বাধীনতা

পঁচাত্তরের দুর্যোগ ছিল মূলত পর্দার আড়ালে দীর্ঘ সময় ধরে উদ্ভূত পরিস্থিতির ফলাফল। এর সবচেয়ে কাছের ঘটনা হচ্ছে এক শক্তির পুনর্জাগরণ যার জন্ম একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের দিনগুলোয়। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা ছাড়া বাংলাদেশের এই ঘটনা প্রবাহের ক্রমবিকাশের সঠিক চিত্র পাওয়া সম্ভব না। দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ আধিপত্যের পুরো সময়টাই বিবেচনায় আনা দরকার, ভালোভাবে বুঝতে গেলে দরকার ব্রিটিশেরা নিজেদের লাভের জন্য যেভাবে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্পর্ককে ব্যবহার করেছিল তা অনুধাবন করা। সাতচল্লিশের স্বাধীনতার পর উপমহাদেশ ভারত ও পাকিস্তান এই দু দেশে ভাগ হয়ে যায়। বিভক্তির সাথে সাথে দু দেশে বিশেষত পাকিস্তানে জাতীয়তার সংজ্ঞা নিয়ে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। যে ইসলামী রাষ্ট্রের তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। একাত্তরের যুদ্ধের সাথে সাথে তার মৃত্যু ঘটে। বাংলাদেশের প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ বাধবার এক সপ্তাহ আগে আসন্ন যুদ্ধে চীনের অবস্থান নিয়ে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই ব্রিটিশ সাংবাদিক নেভিল ম্যাক্সওয়েলের সাথে পিকিং-এ এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

> নভিল ম্যাক্সওয়েল পুরো ব্যাপারটায় দুটো দিক রয়েছে। একদিকে এই বাংলাদেশ আন্দোলনের পেছনে নিশ্চিতভাবেই সর্বাত্মক ভারতীয় মদদ রয়েছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে পূর্ব পাকিস্তানে একটা সত্যিকার বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন রয়েছে। আর এটা তো বলা যায় যে পাকিস্তান নিজেই সৃষ্টি হয়েছে এই উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশদের তল্পি গুটানোর ফলে।
> চৌ-এন-লাই এসব গোলমালের মূলে আছে ব্রিটেন। বিশেষ করে মাউন্টব্যাটেনের নীতি। মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশরাজ্যের 'ভাগ করে শাসন কর' এই নীতি অনুসরণ করে গোলমালের অনেক শেঁকড় গেড়ে যান উপমহাদেশে। এগুলো এখন একটার পর একটা টাইম-বোমার মতো বিস্ফোরিত হচ্ছে। এই নিয়ম আসলে উপনিবেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রণীত। উপনিবেশবাদীরা যখন একটা অঞ্চলের শাসন হাতে নেয়, তখন শোষণের স্বার্থে তারা পুরো অঞ্চলকে এক করে দেয়, আর চলে যাবার সময় দূর থেকে নিয়ন্ত্রণের সুবিধার জন্য কিছু ঝামেলার বীজ তারা রেখেই যায়। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের উপনিবেশের শাসক হিসেবে এক দল দালাল রেখে যায়। ভারতের কখনোই কোন একক সত্তা ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশিক শাসন

উঁচু তলার ব্রাহ্মণদের মনে একটা একক ভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলার অভিলাষ গড়ে তোলে। নেহেরুও এই নীতি অনুসরণ করেন। একবার যুদ্ধ বেধে গেলে তা মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছার পরিধির বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। গোলমাল সহজে থামানো যায় না।.... আর এর পর থেকে উপমহাদেশে কখনো শান্তি থাকবে না।[১০]

সাতচল্লিশের চোদ্দই আগস্ট, ব্রিটিশ-ভারতের বিভক্তির মাধ্যমে ভারত আর পাকিস্তান আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। চল্লিশের তেইশে মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর ঘোষণায় ভারতীয় মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করা হয়। রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের প্রস্তাব করা হয় মূলত এই তত্ত্বের ভিত্তিতে যে ভারতে দু'টো আলাদা জাতি রয়েছে— হিন্দু আর মুসলমান। একদিন না একদিন এ দু জাতি আলাদা হয়ে যাবেই। এটা এক 'অনিবার্য ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা'।

সাধারণ মুসলমানদের যে ভয় ছিল স্বাধীনতার পর দেশে হিন্দুদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে— ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারা তা অবহেলা করেন, অন্যদিকে ছিল নিজেদের জন্য আলাদা একটা দেশ পাবার জন্য বুর্জোয়া মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা। ভারতীয় উপমহাদেশকে বিভক্ত করার জন্য ব্রিটিশরা এ দু ধারাকে কাজে লাগায়। চলে যাবার ধরনটাই এমন ছিল যাতে ভূ-রাজনৈতিক প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে, যায়, তাই আজ ত্রিশ বছর পরও সহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে তা পথ খুঁজে পাবার চেষ্টায় রত।

ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অন্তর্গত বালুচিস্তান, সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পূর্ব বাংলাকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, এদের নিয়েই গঠিত হয় নতুন রাষ্ট্র 'পাকিস্তান'। ধর্মভিত্তিক এই বিভক্তির সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রায় পাঁচ লাখ লোক তাদের জীবন হারায়, এক কোটি লোককে শুধু অন্য ধর্মাবলম্বী হবার জন্য পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ত্যাগ করে সীমান্ত অতিক্রম করতে বাধ্য করা হয়। উগ্র ধর্মান্ধরা দীর্ঘকালব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করে।[১১]

পাকিস্তানের মতো ভারতও সৃষ্টি হয়েছিল স্বতন্ত্র ভাষা-সংস্কৃতি-ইতিহাস সম্পন্ন অনেক জাতি নিয়ে। ভারতীয় কংগ্রেস পার্টির পেছনে ছিল তৃতীয় বিশ্বের সবচেয়ে পরিণত ও শক্তিশালী বুর্জোয়া শ্রেণী। ধর্মনিরপেক্ষ একটি সংসদীয় গণতন্ত্র ভিত্তিক শাসনব্যবস্থার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ এই দল তাই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অঞ্চলগত ও ভাষাগত রেষারেষি কাটিয়ে উঠে দেশের মূল জাতিগুলোর মধ্যে ভৌগোলিক সীমানা চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। ভারতের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য জাতীয় বুর্জোয়া শক্তিগুলোর তিন দশকের চরম ব্যর্থতা সত্ত্বেও এরা শুধু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বস্ততার জন্যই বিভিন্ন প্রশ্নে স্থানীয় বিদ্রোহ-অসন্তোষ ও অঞ্চলগত বৈরিতা দমন করতে সমর্থ হন। ব্যতিক্রম শুধু বৈরী নাগা ও মিজোরা। এছাড়া রয়েছে কাশ্মীরে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে অচলাবস্থা।[১২]

অন্যদিকে উৎকট ইসলামী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণে পাকিস্তানিরা এই একই কাজে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। এদের ইসলামী মৌলবাদী চিন্তাধারার ভিত্তি ছিল—আল্লাহর চোখে সবাই সমান। জাতীয় একতা ও ইসলামের দোহাই দিয়ে উনিশ' শ বায়ান্ন সালে উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা হয়—যে ভাষাতে মোট জনসংখ্যার শতকরা সাত ভাগেরও কম লোক কথা বলে। সাথে সাথে পূর্ব-পাকিস্তানে আন্দোলন শুরু হয়ে যায় বাঙালি সংস্কৃতি রক্ষার জন্য, বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য। অন্যদিকে আঞ্চলিক গোলযোগ মেটাতে ভারতের উদাহরণ গ্রহণ করে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহনশীলতার নীতি অনুসরণ না করে পাকিস্তানিদের সশস্ত্র শক্তির ব্যবহার ও সামরিক রাজনীতির গোয়াতুর্মি দেশে জাতিগত সমস্যাকে জটিল এবং তীব্র করে তোলে। ইসরাইলের পর পাকিস্তান হচ্ছে আধুনিক যুগে একমাত্র রাষ্ট্র যা স্থাপিত হয় মূলত ধর্মীয় নীতির ওপর। তাই প্রতিষ্ঠার প্রায় ত্রিশ বছর পরও রাষ্ট্রীয়-ধর্মীয় আদর্শ এখনো একটা বিতর্কিত ব্যাপার। মূল তত্ত্ব ছিল এই যে শুধু ইসলামের মাধ্যমেই সিন্ধি, বালুচ, পাঠান, পাঞ্জাবি আর বাঙালির স্বতন্ত্র সংস্কৃতির মধ্যে একটা ঐক্য সৃষ্টি সম্ভব। আল্লাহ্ ও রাষ্ট্রের চোখে দেশের সবাই প্রথমত পাকিস্তানি, অন্য কিছু নয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল অন্য ব্যাপার। বিভক্তির সময়ে প্রতিরক্ষা বাহিনীতে প্রাধান্য ছিল পাঞ্জাবিদের। পাঞ্জাব তুলনামূলকভাবে অন্যান্য প্রদেশের চাইতে অগ্রসর। এরা পাকিস্তানি রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করে। স্বাধীনতার পরে তারাই 'সংখ্যালঘুদের' ওপর তো বটেই এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের ওপরও নিজেদের আধিপত্য কায়েম করে। অন্যদিকে ভারত থেকে আসা মোহাজেররা ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন পেশায় দ্রুত কর্তৃত্বমূলক অবস্থান দখল করে। চুয়ান্নতে পশ্চিম পাকিস্তানে 'ওয়ান-ইউনিট' প্রথা চালুর মাধ্যমে পুরো গোলমেলে ব্যবস্থাটার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয় প্রাদেশিক সীমানা মুছে ফেলার মাধ্যমে।

এদিকে জাতীয়তার প্রশ্ন ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে। ৫৫ থেকে ৭০—এই সময়টা হচ্ছে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ওয়ান-ইউনিট প্রথার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রামের কাল। বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য ছিল খুব স্পষ্ট—এর মাধ্যমে তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র সংস্কৃতিকে তুচ্ছজ্ঞান করে অভিজাত শ্রেণীর পাঞ্জাবি ও মোহাজেরদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। উনসত্তরে প্রবল গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুব খানের এক দশকের পুরনো সামরিক শাসনের অবসান ঘটে।

নতুন রাষ্ট্রপ্রধান ইয়াহিয়া খান দু'টো বড় রকমের সংস্কারের আশ্বাস দেন। একদিকে তিনি ওয়ান-ইউনিট প্রথার বিলুপ্তি সাধনের আর অন্যদিকে সত্তরের ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেসামরিক সরকারে উত্তরণের আশ্বাস দেন। উনসত্তরের নভেম্বরে ইয়াহিয়া খান 'ওয়ান-ইউনিট; প্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করে পশ্চিম পাকিস্তানে সিন্ধু, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের আলাদা প্রাদেশিক সীমানা পুনঃনির্ধারণ করলেন। কিন্তু জাতিগত প্রশ্নের মীমাংসা এত তাড়াতাড়ি হবার নয়। সত্তরের নির্বাচন পূর্ব-পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগের জন্য বিরাট বিজয় নিয়ে আসে। সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তানে ওয়ালী খানের ন্যাশনাল আওয়ামী

পার্টি (ন্যাপ) প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ পায়। ন্যাপ ও আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক বিজয়ের কারণ হচ্ছে এ দু দলই বাংলা, বালুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের জনসাধারণের জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষার সার্থক প্রতিনিধিত্ব করে ছিল। নিজেদের কর্মসূচির মূল নীতি হিসেবে দু দলই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে প্রদেশগুলোর জন্য স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তুলেছিল।

পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭টি আসন। এর মানে পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও শেখ মুজিবের জন্য প্রধানমন্ত্রিত্ব। কিন্তু এক বাঙালি বুদ্ধিজীবীর ভাষায়—

> সে সময় এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে নির্ধারিত জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসলে আওয়ামী লীগ সহজেই তার স্বায়ত্তশাসনের কর্মসূচির ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করতে পারবে আর সেক্ষেত্রে পাকিস্তান পরিণত হবে একটা শিথিল কনফেডারেশনে। কিন্তু প্রতি বছর দেশের বাজেটের অর্ধেকেরও বেশি যারা পকেটস্থ করে, যারা উচ্চতম বেতন ও সুযোগ-সুবিধার অধিকারী—সেই পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর স্বার্থেই পূর্ব-বাংলাকে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ অংশ হিসেবে টিকিয়ে রাখাটা ছিল খুবই জরুরি।[১৩]

পাকিস্তানি সমর নেতারা ঠিক করলেন, নির্বাচিত আওয়ামী লীগ প্রশাসনের হাতে ক্ষমতা প্রত্যার্পণ করবেন না। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকতে সামরিক সরকারের অনিচ্ছার পেছনে অন্যতম মন্ত্রণাদাতা ছিলেন পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো। তার দল সিন্ধু ও পাঞ্জাবে মোট ৮১ টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। ভুট্টো গলাবাজী দাবি করে বললেন যে, পাঞ্জাব ও সিন্ধু হচ্ছে পাকিস্তানের ক্ষমতার দুর্গ আর যেহেতু তার দল এ দু প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে কাজেই তিনি আওয়ামী লীগের 'বর্বর সংখ্যাগরিষ্ঠতার' মাধ্যমে নির্ধারিত কোন সংবিধান মানবেন না। মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করে পাকিস্তানকে কয়েকটা প্রদেশের একটা শিথিল কনফেডারেশনে পরিণত করা হলে ভুট্টো সংসদ বর্জন করার হুমকিও দিলেন। একাত্তরের পহেলা মার্চ সামরিক শাসকেরা তেসরা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। পূর্ব পাকিস্তানে এর প্রতিক্রিয়া হয় ত্বড়িৎ এবং হিংসাত্মক। শক্তিশালী জঙ্গী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে সরাসরি স্বাধীনতার দাবি ওঠে। অসহযোগ আন্দোলন ও ধর্মঘটের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জীবন তখন অচল প্রায়। এই সময়ে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সাথে নতুন আলোচনায় বসলেন। আসলে এই সমঝোতা বৈঠক ছিল শুধু এই ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতির জন্য সময়ক্ষেপণের চাল মাত্র। একাত্তরের পঁচিশে মার্চের রাত্রিতে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে রাজনৈতিক দমনযজ্ঞের নিষ্ঠুরতম পর্যায় অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার রাস্তা ভরে যায় ট্যাঙ্ক আর সাঁজোয়া বাহিনীতে। এই কালরাত্রিতে কয়েক হাজার লোক প্রাণ হারায়। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ অন্য জায়গায় রয়েছে—এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয় গণহত্যার সেই ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করা। এটার উল্লেখ শুধু এটুকু বোঝাবার জন্য যে সেই রাত্রির ঘটনা

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে গুণগতভাবে সম্পূর্ণ নতুন ও স্বতন্ত্র এক দিগন্তের উন্মোচন করে।[১৪]

এক প্রজন্মেরও বেশি সময় ধরেই জাতীয়তার প্রশ্ন নানা বিতর্কে মার্কসীয় লেখকদের ব্যস্ত রেখেছেন। এই বিষয়ের ওপরে এই শতাব্দীর প্রথমদিকে লেনিন ও রোজা লুক্সেমবার্গের মধ্যে এ আলোচনা হচ্ছে অন্যতম পরিচিত একটি দলিল।[১৫] বহুদিন ধরে যেসব বিষয় নিয়ে এই বিতর্কের সূত্রপাত সাম্প্রতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ নিজেই তার চমকপ্রদ উদাহরণ। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনোই বোধহয় একটা জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের অবস্থান এত স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়ে দেখা দেয় নি।

যাহোক, জাতিগত প্রশ্নে বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান লেখার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতে লেনিনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। পাকিস্তানে বিপ্লবী রাজনীতির অভ্যুদয়ের পেছনে রয়েছে মূলত জাতিগত প্রশ্ন আর উপনিবেশ-পরবর্তী ধনতান্ত্রিক বিকাশের ব্যর্থতা। লেনিন তাঁর **ক্রিটিক্যাল রিমার্কস্ অন দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চন** বইতে মন্তব্য করেন—

> জনগণ ভাল করেই জানে একটা বড় রাষ্ট্র ও বড় বাজারের সাথে যুক্ত থাকার ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা কতখানি। কাজেই যখন একসাথে থাকা সম্পূর্ণ অসহ্য হয়ে ওঠে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবার সম্মুখীন হয়, তখনই শুধু তারা জাতীয় নিপীড়ন ও সংঘর্ষ থেকে মুক্তির জন্য আলাদা হতে চায়। এই অবস্থায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ ও শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশের স্বার্থে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবি মেনে নেয়াই উত্তম
>
> জাতিগুলোর আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকারের অর্থ হচ্ছে রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীনতার অধিকার, নির্যাতনকারী রাষ্ট্রের কাঠামো থেকে পৃথক হবার অধিকার। কিন্তু বিশেষভাবে গণতান্ত্রিক রাজনীতির দাবি বলতে বোঝায় আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হিসেবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য আন্দোলন করার অধিকার এবং বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে পৃথক রাষ্ট্র গড়ে তোলার ব্যাপারে গণভোট অনুষ্ঠানের পূর্ণ সংরক্ষিত অধিকার। কাজেই শুধু বিচ্ছিন্নতা, টুকরো করা আর ছোট ছোট রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য এই সব দাবি ওঠে না। বরং জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক ও সঙ্গত আন্দোলন হিসেবে এ সব দাবি ও আন্দোলন গড়ে ওঠে। পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার দানের পথে একটা রাষ্ট্র যতটুকু এগিয়ে যাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ততই কমে আসবে; অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও জনস্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে একটা বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রচুর অনুকূল সুবিধা রয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সব সুবিধা আরও বৃদ্ধি পায়। নীতিগতভাবে আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি আর যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বীকৃতি কিন্তু এক কথা না। একজন এই নীতির ঘোর বিরোধী ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বিশ্বাসী হয়েও জাতিগত বৈষম্যের চেয়ে বরং যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পূর্ণ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার একমাত্র উপায় হিসেবে মেনে নিতে পারেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি

থেকেই একজন কেন্দ্রপন্থী হয়েও মার্কস আয়ারল্যান্ডের ওপর ইংল্যান্ডের জোর নিপীড়নের চেয়ে বরং ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের মধ্যে ফেডারেশন গড়ার পক্ষপাতী ছিলেন।...

যেহেতু জাতিগত বা অন্য কোন ধরনের রাজনৈতিক নির্যাতনের বিলুপ্তি করতে হলে দরকার শ্রেণীর বিলোপ অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন, কাজেই সঙ্গত কারণেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এ নির্যাতন বন্ধ করা অসম্ভব। অর্থনীতি সমাজতন্ত্রের ভিত্তি হলেও সমাজতন্ত্র বলতে শুধু অর্থনীতি বোঝায় না। জাতীয় নিপীড়নের বিলুপ্তির জন্য একটা সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিপ্রস্তর থাকা দরকার কিন্তু এর সাথে গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত রাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত সেনাবাহিনী ইত্যাদির দরকার। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জায়গায় সমাজতন্ত্র কায়েম করে সর্বহারা শ্রেণী জাতিগত। নিপীড়ন বিলুপ্ত করার সত্যিকার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। এই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ পায় শুধু তখনই যখন সর্বস্তরে পূর্ণ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।[১৬]...

একাত্তরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরেও পাকিস্তানের জাতীয়তার প্রশ্নে সংকট শেষ হয় নি। দু বছরের মধ্যেই জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকেরা বালুচিস্তানের প্রাদেশিক সরকার বাতিল করে। স্বশাসিত স্থানীয় সরকারের দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলনের পর বালুচরা সত্তরে প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্ব দিয়েছিল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির হাতে। তিহাত্তরের ফেব্রুয়ারিতে ইরানের শাহ্‌র প্ররোচনায় ভুট্টো এই প্রাদেশিক সরকার ভেঙ্গে দেন। ভুট্টোর অভিযোগ ছিল বালুচেরাও বাঙালিদের মতোই বিচ্ছিন্নতাবাদী ছাড়া আর কিছুই নয়। নির্বাচিত সংসদের প্রতি সমর্থন বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা মেটাতে পাকিস্তানিরা চিরাচরিত সামরিক কায়দায় বরাবরের মতোই বালুচিস্তানে প্রচুর সংখ্যক সৈন্য পাঠায়। ফল হয় উল্টোটা। কঠোর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত বালুচ উপজাতি সামরিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে ওঠে। সেই থেকে আজও বালুচিস্তানের পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে তীব্র ও তিক্ত গেরিলা যুদ্ধ চলছে দু দলের মধ্যে। চার বছরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রায় ছয় হাজার সৈন্য হারিয়েছে যা তাদের একাত্তরের ক্ষয়ক্ষতির সাথে তুলনীয়।[১৭] বাঙালিদের মতো বালুচরা অবশ্য স্বাধীনতার দাবি তুলছে না। তবে লেখকের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বালুচিস্তানের গেরিলা নেতা চাকার খান মারী বাঙালি ও বালুচ এ দু জাতির কাছেই পাকিস্তানি রাষ্ট্রের কাঠামোতে যে প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল তা তুলে ধরেন। প্রায় এক শতক আগে লেনিন জাতীয়তার প্রশ্নে যে মন্তব্য করে ছিলেন চাকার খানের মন্তব্যে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষিতে তার আশ্চর্য প্রতিধ্বনি শোনা যায়। চাকার খান বালুচিস্তান গণমুক্তি ফ্রন্টের একজন সামরিক অধিনায়ক। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁর মাথার মূল্য ধার্য করেছেন পঞ্চাশ হাজার রূপি। চাকার খানের মতে—

বিচ্ছিন্ন হওয়ার বা স্বাধীনতার জন্য আমাদের এই আন্দোলন নয়। এই আন্দোলন পাকিস্তানি রাষ্ট্রের কাঠামোর ভেতরে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন, প্রতিটি জাতির জন্য তাদের নিজ প্রশাসনসহ সমান অধিকারের জন্য আন্দোলন। কিন্তু আজকের সমস্যার এই শেকড় রয়েছে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার মধ্যে। ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে দ্বিজাতিতত্ত্ব মতবাদকে আমরা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য মনে করি। ভারতের মুসলমান নেতৃবৃন্দ ভয় পেয়েছিলেন যে ব্রিটিশরা চলে যাবার পর তারা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বেন ; কাজেই ক্ষমতার ভাগ কোনদিনই তাদের কপালে নেই—সবসময় তাদের বিরোধী শিবিরেই থাকতে হবে। ক্ষমতার লোভেই তারা নিজেদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেন। মুসলিম লীগ ছিল এই মুসলিম বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধি। এরা কোনদিনও স্বীকার করেন নি ভারত থেকে আলাদা হওয়া দেশ পাকিস্তান হচ্ছে বাঙালি, সিন্ধি, বালুচ, পাঞ্জাবি আর পাঠানের সমন্বয়ে গঠিত একটা বহুজাতিক রাষ্ট্র। এরা বারবার বলতে থাকেন যে, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে এরা এক জাতি ও জাতীয়তার ধুয়া তুললেন। পাকিস্তান আর ইসরায়েল ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় নি। ধর্ম আমাদের মতে মানুষের নিজস্ব ব্যাপার। আজকের পাকিস্তানে মূল সমস্যা আবর্তিত হচ্ছে সংখ্যালঘু জাতিগুলোর অধিকারের প্রশ্নে। ইসলামের দোহাই দিয়ে একে আর ঢেকে রাখা যাবে না।

আজকের পাকিস্তানে সংখ্যালঘু জাতিগুলোর স্বাধিকারের দাবি হচ্ছে মূল জাতীয় প্রশ্ন। তিনটা প্রদেশ মিলিয়ে মোট জনসংখ্যার শতকরা চল্লিশ ভাগ লোক এই জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি। একাত্তরের আগে এই সমস্যার মুখোমুখি ছিল দেশের মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ লোক। একাত্তরে যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে জাতিগত অধিকারের প্রশ্ন আরও তীব্র হয়ে ওঠে। একটা বহুজাতিক রাষ্ট্রে একটা জাতি যদি রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে তাহলে সংখ্যালঘুরা স্বাভাবিকভাবেই সেই শোষণ প্রতিরোধ করবে। আসলে সরকারিভাবে পাকিস্তান একটা একজাতি রাষ্ট্র বলে যে প্রচারণা চালানো হয় পাকিস্তান ঠিক তা নয় বলে আমাদের বিশ্বাস। দেখা যাক একটা জাতি কাকে বলে। ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ভৌগোলিক ঘনিষ্ঠতার সূত্র হচ্ছে একটা জাতির মাপকাঠি। পাকিস্তানে ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নটি খুবই প্রকাশ্য ব্যাপার। একাত্তরে এর জন্য একটা গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত হয়েছে। এভাবে দেখতে গেলে পাকিস্তানে এই মুহূর্তে চারটি জাতির অস্তিত্ব রয়েছে। আমরা বলতে চাই যে, পাকিস্তান এক জাতির রাষ্ট্র নয়, বহুজাতিক রাষ্ট্র আর প্রত্যেক জাতির এখানে রয়েছে সমান অধিকার। আমরা চাই যে নিজস্ব ঐতিহ্যগত পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক প্রদেশের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি গড়ে উঠুক, বাইরের থেকে কোন জাতির ওপর যেন অন্য কোন সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়া না হয়। আমরা মনে করি যে,

আজকের পাকিস্তানের বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামোতে সংখ্যালঘু জাতিগুলোর এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বুর্জোয়া এসব সমস্যার সমাধানের বিরুদ্ধে ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। আমরা মনে করি যে সংখ্যালঘু জাতিগুলোর এই সমস্যার সমাধান একমাত্র কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমেই সম্ভব, সে জন্যে দরকার হলে তা সশস্ত্র আন্দেলনে রূপ নিতে পারে। আন্দোলনের গতির তালে তালেই স্পষ্ট হয়ে ওঠবে আন্দোলন কোন পথে চলা উচিত। আমাদের মনে হয় শেষ পর্যন্ত তা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের চেহারা নেবে।[১৮]

যদিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাঙালি ও বালুচ সমস্যার মধ্যে তফাৎ রয়েছে, তবুও সাধারণভাবে বলা যায় এ দু জাতিই স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি নিয়ে একটা অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মোকাবেলা করেছিল। উভয় ক্ষেত্রেই জাতিগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোকে এরা প্রাদেশিক পর্যায়ে নির্বাচিত করে। আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জাতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচিত হবার পর নিজেদের কাঙ্ক্ষিত অবস্থান গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়ে এরা সশস্ত্র আন্দোলনের পথে ঝুঁকে পড়ে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বামপন্থী দলগুলোর অবস্থান

পূর্ব বাংলায় যখন পাকিস্তানি নিধনযজ্ঞ শুরু হয়, জাতীয় প্রশ্নে দেশের বামপন্থী দলগুলো তখনও দ্বিধাবিভক্ত। যে তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হয় তার ফলে অনেক দলই দুর্বল ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, এর ফলে বাম শিবিরে যে ভাঙ্গন ধরে আজো তা টিকে রয়েছে। "পূর্ব পাকিস্তান সংকটে" চীনের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি পিকিংপন্থী দলগুলোর মধ্যে মস্ত বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ওপর সেই সময়ে এদের ছিল ব্যাপক প্রভাব। বাঙালির সর্বকালের সর্ববৃহৎ গণরাজনৈতিক আন্দোলনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব পিকিং-পন্থী দলগুলোর মনে যথেষ্ট হতাশার সৃষ্টি করে। আওয়ামী লীগ ছিল শ্রেণীগতভাবে জাতীয় বুর্জোয়াদের দল, সংগ্রামের পেছনে যাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত, স্বায়ত্তশাসন অর্জন ও শেষে স্বাধীনতা, অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিবাদীদের কাছে নিজেদের স্বার্থ জলাঞ্জলি না দিয়ে বাঙালি বুর্জোয়াদের নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। তাই পিকিং-পন্থী দলগুলো স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া সরকারের দমনযজ্ঞে নিন্দামুখর হয়ে উঠলেও 'ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ' ও 'সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ'-এর মদদপুষ্ট এক বুর্জোয়া জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দান করতে প্রস্তুত ছিল না।

মোহাম্মদ তোয়াহা ও আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী—লেনিনবাদী) ছিল এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় প্রশ্নে এদের অবস্থান ছিল ভদ্রলাকের ভাষায় দ্বিধান্বিত ; নিন্দুকের ভাষায় বলতে গেলে দালালির সমতুল্য। ষাটের দশকের শেষ দিকে এরা আবদুল মতিন ও আলাউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন পূর্ববাংলা কম্যুনিস্ট পার্টির তত্ত্বের প্রবল বিরোধিতা করেন। পূর্ববাংলা করা হলে এই অঞ্চলে সমাজতন্ত্রের প্রবেশের জন্য তা হবে সবচেয়ে অনুকূল পথ। তোয়াহার দল এই তত্ত্বের বিরোধিতা করে বলে যে এতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়াদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিদ্যমান সংঘাতকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর ফলে অভিন্ন শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের উভয় অংশে শহর ও গ্রামাঞ্চলের সর্বহারাদের সংগ্রাম বিপথে যাবে। তোয়াহা ও হকের দল আরো অভিযোগ করে যে, মতিনের দল পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয় বুর্জোয়া স্বার্থের প্রতিনিধি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তানকে বিভক্তিকরণে সাহায্য করবে মাত্র।[১৯]

পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর বর্বর হত্যাযজ্ঞ বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রয়োজনীয় করে তুললো। তবুও, এই কঠিন সংকটে কি করণীয় তা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-এর মধ্যে তীব্র মতানৈক্য। আবদুল হকের নেতৃত্বে এক দলের বক্তব্য ছিল যে, সমস্ত সংঘাতের সৃষ্টি করা হয়েছে শুধু পাকিস্তানের

অখণ্ডতা ভাঙ্গার জন্য যার পেছনে আসল হোতা হচ্ছে সোভিয়েত মদদপুষ্ট ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা। হকের সহকর্মী তোয়াহা কিন্তু হকের এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করতে পারলেন না। মুক্তিযুদ্ধের প্রায় চার মাসের মধ্যে এই দল ভেঙ্গে দু'ভাগ হয়ে যায়। হক দলের পুরনো নাম অর্থাৎ 'পূর্ব-পাকিস্তান' শব্দটা অক্ষুণ্ন রাখে, এরা এমনকি পাকিস্তান সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে ও ইঙ্গিত দেয় পাকবাহিনী তাদের স্বভাবসুলভ চরম বর্বরতা ত্যাগ করলে বিনিময়ে তারা অত্যাসন্ন ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সহায়তা করতে প্রস্তুত। স্বাধীনতার পর হকের নামে পাকিস্তানিদের দালালি করার অভিযোগ আনা হয়। উনিশ শ' সাতাত্তর সালেও 'পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টি (মা-লে)' নাম অক্ষুণ্ন রেখে এই দল গোপনে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। (বর্তমানে আবদুল হকের দলের নাম বাংলাদেশের বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টি, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী। সম্প্রতি প্রয়াত। —অনুবাদক) লেখক উনিশ শ' ছিয়াত্তরের জুনে ঢাকায় হকের বিস্তারিত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। অন্যদিকে মোহাম্মদ তোয়াহা নোয়াখালী, চট্টগ্রাম এলাকায় তার ঘাঁটি স্থাপন করেন। তিনি তার সমর্থকদের পূর্ব বাংলা কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) এই নতুন নামে সংগঠিত করেন। আওয়ামী লীগের কোলকাতা কেন্দ্রিক অস্থায়ী সরকার যে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মদদপুষ্ট সে ব্যাপারে তোয়াহা হকের সাথে একমত ছিলেন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করবেন কি-না সে ব্যাপারে তিনি স্থির সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হন। এদিকে গ্রামে-গঞ্জে সারা দেশের প্রতিটি মানুষ তখন পাকিস্তানি নির্যাতনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলনে জেগে উঠেছে। শেষে তোয়াহার দল এক-'দ্বি-মুখী যুদ্ধের' কৌশল গ্রহণ করলেন—একদিকে তারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন, আবার একই সাথে আওয়ামী লীগের অনুগত মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করে যান। কোন কোন সময় বোঝা খুব কষ্ট ছিল তোয়াহা কি মুক্তিবাহিনী না পাকবাহিনীকে তার বড় শত্রু বলে মনে করেন।

৭৬-এর এপ্রিলে পাকিস্তানে বালুচিস্তানের বন্দর নগরী গোয়াদারে নোয়াখালী সেক্টরে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রাক্তন কমান্ডার কর্নেল আশিক হোসেন এই লেখকের কাছে স্বীকার করেন মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে যৌথ সহযোগিতার ব্যাপারে তিনি ব্যক্তিগতভাবে তোয়াহার সাথে আলোচনা করেছিলেন। তিনি অবশ্য দাবি করেন যে, কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই আলোচনা বানচাল হয়ে যায়। তোয়াহার নিজস্ব শিবিরে তার এই দ্বিধাপূর্ণ অবস্থান নিয়ে প্রচণ্ড মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। জাতীয় অধিকারের প্রশ্নকে ঠিকভাবে বুঝতে তোয়াহার অক্ষমতার অভিযোগ তুলে বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দিন উমর দল ত্যাগ করেন। উমর পাকবাহিনীকেই প্রধান শত্রু মনে করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল স্বাধীনতার লক্ষ্যে সবার উচিত ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া এতে জাতীয় বুর্জোয়ারা নেতৃত্ব দিল কি দিল না তা নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয় বলে তিনি মনে করতেন। পিকিং পন্থী দলগুলোর বাকি অংশ মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধকে পুরোপুরি সমর্থন দান করে। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন কৃষক আন্দোলনের সংগঠক বর্ষীয়ান 'লাল মাওলানা' ভাসানী। তোয়াহা এক সময় যাঁর সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন।

চীন ও বাংলাদেশের আন্দোলন

স্বাধীনতা যুদ্ধের দিন গড়িয়ে চলার সাথে সাথে দেশের পিকিংপন্থী দলগুলো যে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার মধ্যে ডুবে যায় তা বুঝতে হলে এই সময় চীনের অবস্থান বিশ্লেষণ করা দরকার। চীন প্রথম থেকেই বলতে থাকে যে, পূর্ব পাকিস্তানের পুরো ঘটনাটাই হচ্ছে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, যেখানে বাইরের হস্তক্ষেপ নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। রেডিও পিকিং বারবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করতে থাকে, পাকিস্তানকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সুযোগটা কাজে লাগাবে। পঁচিশে মার্চের হত্যাযজ্ঞের ব্যাপারে চীনরা সরকারিভাবে কোন বক্তব্য দেয় নি। চীনাদের মত ছিল এ ধরনের কোন বক্তব্য দেয়া হবে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানোর শামিল। তাদের সব সরকারি বক্তব্যই ছিল এই এলাকায় বৃহৎ শক্তির দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী নীতি সম্পর্কিত। জাতীয় অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে কিংবা চরম নির্যাতনের মুখে জাতীয় 'আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার' নিয়ে লেনিনের মতবাদের ব্যাপারে তারা সরকারি বক্তব্যে কখনো কোন মন্তব্য করে নি।

এপ্রিলের তের তারিখে পাকিস্তান টাইম্‌সে ইয়াহিয়ার কাছে লেখা চৌ-এন লাইয়ের একটা চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিতে চৌ লেখেন-পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে একতা আর অখণ্ড পাকিস্তান হচ্ছে শক্তি ও উন্নতি অর্জনের পথে পাকিস্তানের মৌলিক গ্যারান্টি ; এছাড়াও চৌ পাকিস্তানের একতা নষ্ট করতে চায় এমন 'কিছু সংখ্যক লোকের' উল্লেখ করেন। এই চিঠি ছাপিয়ে ও পিকিং-এ জুলফিকার আলী ভুট্টোকে এক প্রবল প্ররোচণামূলক সফরে পাঠিয়ে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ একথা বুঝাতে চেয়েছিলেন যে ভারতের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে তারা চীনের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। ইয়াহিয়ার কাছে লেখা চৌ-এর চিঠি শেষ হয় এভাবে—'মহাত্মন নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সম্প্রসারণবাদী ভারতীয়রা আগ্রাসন চালানোর দুঃসাহস দেখালে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার ন্যায় সংগ্রামে আগের মতোই চীনা সরকার ও জনগণ পাকিস্তানকে পূর্ণ সমর্থন দেবে।'[২০]

ব্যক্তিগত পর্যায়ে চীনা কর্তৃপক্ষ অবশ্য পূর্ব-পাকিস্তানে সামরিক অপারেশনের ব্যাপারে এতটা উৎসাহী ছিলেন না। একাত্তরের নভেম্বরে পাকিস্তানি প্রতিনিধি হিসেবে আসন্ন ভারতীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনের সমর্থন নিশ্চিত করতে ভুট্টো চীন সফরে গেলে তাঁর হাতে পাকবাহিনীর দ্বারা নিহত একুশজন পিকিং-পন্থী নেতার তালিকা ধরিয়ে দেয়া হয়।[২১] সেই একই সফরে সফরকারী পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের সম্মানে দেয়া এক

ভোজসভায় ভুট্টোর সাথে পিকিং-এ পাকিস্তানি দূতাবাসে কর্মরত জনৈক বাঙালি কূটনীতিকের বাক্‌বিতণ্ডা বেধে যায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বীরত্বের প্রশংসা করতে করতে ভুট্টো এক পর্যায়ে বলে ফেলেন 'ভারত পূর্ব-পাকিস্তান আক্রমণ করলে গঙ্গার সমস্ত পানি লাল হয়ে যাবে', 'আর রাগ সামলাতে না পেরে বাঙালি ভদ্রলোক ভুট্টোর উদ্দেশ্যে জোরে জোরে বলে ওঠেন— 'আগে সিন্ধুর পানি লাল করুন গে, (সিন্ধু নদী পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান নদী) তাহলে বেশি ভালো হয়,' রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় প্রকাশ্যভাবে এই 'ভাইদের মধ্যে ঝগড়ায় চীনারা খুবই ব্রিবত হন। চৌ-এন লাই ভুট্টোর দিকে ফিরে কড়াসুরে বলেন— 'পিকিং-এ বসে আপনি এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন না, ঢাকায় ফিরে যান ও সেখানে তা সমাধান করুন।'[২২] '৭৪-এর দিকে এটা প্রমাণিত হয় যে চৌ-এন লাইয়ের বিশেষ বার্তা প্রকাশ করার সময় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তার রদবদল করেছিল। ১৯৬৬ থেকে '৭২ পর্যন্ত রেডিও পিকিং-এ কর্মরত বাঙালি বিদেশী ভাষা বিশেষজ্ঞ জনাব আনোয়ার হোসেন যিনি '৭১-এ যুদ্ধের সময় ছিলেন পিকিং-এ বেসরকারিভাবে কর্মরত একমাত্র বাঙালি, এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেন—

> পাকিস্তানি পত্রিকাগুলোতে চৌ-এন লাইয়ের চিঠি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নি। এই চিঠির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটাই পাকিস্তানিরা বাদ দিয়ে দেয়। আমি যেহেতু রেডিও পিকিং-এ প্রচারের জন্য এটা মূল থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলাম কাজেই আমি তা জানি। চিঠির শেষ পরিচ্ছেদে চৌ-এন লাই লিখেছিলেন— 'পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছানুযায়ীই পূর্ব-পাকিস্তান প্রশ্নের সমাধান হওয়া উচিত।'[২৩]

আনোয়ার হোসেন দাবি করেন যে, চীনারা একান্ত আলোচনায় কারান্তরীণ শেখ মুজিবকে ছেড়ে দেয়ার জন্য ও ভারতের সাথে যুদ্ধ বাধার পরিস্থিতি সৃষ্টির আগেই আলোচনার টেবিলে ফিরে যেতে পাকিস্তানকে অনুরোধ করেছিলেন। চীনে থাকতে আনোয়ার হোসেন নিয়মিতভাবে বিভিন্ন কমিউন ও ফ্যাক্টরীতে যেয়ে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের নিন্দা জানিয়ে আসতেন। চীনা কর্মকর্তা ও বন্ধুরা তাঁকে জানায় যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা ইয়াহিয়া খানের সামরিক পদক্ষেপের নিন্দা করেন। কিন্তু আনোয়ার হোসেন বহুবার তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার অনুরোধ জানিয়ে বিফল মনোরথ হন। এরা সরকারিভাবে অন্য একটা দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হাত দিতে অস্বীকৃতি জানান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালীন সময়টা চীনের জন্য ছিল অভ্যন্তরীণ গোলমালের সময়। বৈদেশিক নীতিতে কোন শিবিরের দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হবে তা নিয়ে পার্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। সেপ্টেম্বরে লিন পিয়াও-এর চক্র চরমে পৌঁছে ও পরিণামে তার মৃত্যু ঘটে। লিন পিয়াও-এর চক্রান্তের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা যায় দক্ষিণ এশিয়ার প্রতি চীনা দৃষ্টিভঙ্গিতে। এছাড়াও পশ্চিমা প্রেসে একাত্তরে তাইওয়ানের ভবিষ্যৎ নিয়েও যথেষ্ট হৈ চৈ হচ্ছিল। (লিন পিয়াও-বর্তমান সংশোধিত উচ্চারণ অনুযায়ী লিন

বিয়াও চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন। নবম কংগ্রেসের সভায় তাঁকে মাও-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল। তাঁর সাথে পার্টি নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নে মতানৈক্য দেখা দেয়, তাঁর নামে ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করার অভিযোগও রয়েছে। চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির বক্তব্য অনুযায়ী ষড়যন্ত্র কার্যকর করার আগেই তা ফাঁস হয়ে যায় ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিমানে করে দেশ ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করেন। বিমানটি দুর্ঘটনায় পতিত হয় ও লিন বিয়াও মারা যান বলে জানা যায়—অনুবাদক)। জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লবি তাইওয়ানের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে প্রচারণা শুরু করে। চীন এ সময় বর্হিবিশ্বকে জানিয়ে দেয় যে তাইওয়ান হচ্ছে চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ আর এ ব্যাপারে বাইরের কারো হস্তক্ষেপ নিতান্তই অবাঞ্ছিত। এই অবস্থায় এমনকি লেনিনের অবস্থান থেকে যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রকাশ্য সমর্থন দেয়া হত তাহলে তা হত চীনাদের জন্য নীতিগত প্রশ্নে বড়ো সমস্যার কারণ।

দক্ষিণ আফ্রিকাসহ অন্যান্য দেশের মতো এক্ষেত্রে চীনা নেতৃত্বের প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী ভূমিকা। আন্তর্জাতিক শক্তির ভারসাম্যের বিচার করতে গিয়ে চীনাদের মনে হয়েছিল সোভিয়েতরা পৃথিবী ব্যাপী তাদের আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে একটা বৃহৎ শক্তির ওঠা-নামার এই অবস্থানে আসল ভয় ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিয়ে। চীনাদের সরকারি বক্তব্যগুলো থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পূর্ব-পাকিস্তান সংকটকে এরা পাকিস্তানি সমাজকাঠামোর অভ্যন্তরীণ বিরোধের প্রেক্ষিতে চিন্তা না করে একে মূলত বৃহৎ শক্তিগুলোর শক্তির ভারসাম্যের প্রেক্ষিতে দেখছিল।

বাংলাদেশ সঙ্কটে ভারত হস্তক্ষেপ করলে, পাকিস্তানের ভাঙ্গনে 'ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ' ও সোভিয়েতের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে রেডিও পিকিং নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। পাকবাহিনীর প্রতিরোধের শেষ ব্যূহ ধ্বংস করে ভারতীয়রা যখন ঢাকার পথে এগিয়ে চলছে, জাতিসংঘে একজন চীনা কূটনীতিক তখন আমাকে বলেন—'যেখানে বিশ বছরেও লাখ লাখ ভারতীয় বর্ণপ্রথা, দারিদ্র্য আর মহাজনী প্রথা থেকে উদ্ধার পায় নি, সেখানে ভারতীয়রা কীভাবে বাঙালিদের মুক্ত করার দাবি করে?'[২৪]

কথিত আছে চৌ-এন লাই এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে যেয়ে বলেন যে, ভারত এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে খাল কেটে কুমীর আনবার পথ করছে। যুদ্ধোত্তর কালে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক যখন শীতলতম পর্যায়ে তখন চীনা প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছিল। যাইহোক, অনেক বাঙালি জাতীয়বাদীর জন্য চীনা অবস্থান ছিল বরাবর চরম হতাশাব্যঞ্জক।

এ যুদ্ধে ভারতীয় হস্তক্ষেপের বিরোধী শুধু চীন-ই ছিল না। তৎকালীন নক্সালপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল বিখ্যাত বামপন্থী সাপ্তাহিক ফ্রন্টিয়ার একদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থন করে আবার অন্যদিকে ভারতীয় হস্তক্ষেপের তীব্র সমালোচনাও করে। আওয়ামী লীগের কোলকাতা অবস্থানকারী নেতৃবৃন্দ যারা সম্ভবতম কম সময়ে এই সংকটের সমাধান চাইছিলেন তাঁরা ছাড়া তাহেরের মতো আরো অনেক

বাঙালি ছিলেন ভারতীয় হস্তক্ষেপের বিরোধী। এরা মনে করতেন যে বিদেশী সামরিক শক্তির সহায়তায় যে স্বাধীনতা আসবে তা হবে আপেস রক্ষার স্বাধীনতা। এতে তাদের আকাঙ্ক্ষিত বিপ্লব অসমাপ্ত থেকে যেতে পারে।

আওয়ামী লীগ ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ভয় ছিল যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব আস্তে আস্তে চলে যেতে পারে স্বাধীনতা যুদ্ধের আদর্শের প্রতি গভীরভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ ও জাতীয় প্রশ্নে আপসহীন বিপ্লবীদের হাতে। গেরিলা যুদ্ধ ধরনের আন্দোলন টিকে থাকলে এই শক্তিগুলো সন্দেহাতীতভাবেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতেন। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যুদ্ধে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এই সুযোগটাকে গোঁড়াতেই বিনাশ করতে চেয়েছিল। বাঙালি সামরিক নেতৃত্ব সেই সময়ে হিসেব কষে দেখিয়েছিলেন যে, ভারতীয় হস্তক্ষেপ না হলেও তিন বছরের মধ্যেই তারা পাকিস্তানিদের যুদ্ধে হারিয়ে দিতে পারবেন। তাহের আর জিয়াউদ্দিনের মতো বামপন্থী সামরিক ব্যক্তিরা যে কৌশলগত পদ্ধতির কথা বলেছিলেন তা গ্রহণ করলে 'গণবাহিনী'র অঙ্কুর হিসেবে যুদ্ধশেষে বাংলাদেশ পেত লাখ ক্ষেতমজুরের এক শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী।

বাঙালিরা যখন একদিকে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে চলেছে, অন্যদিকে তখন ভারত আরেকটা লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড়ো প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার একটা সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল ভারতের জন্য। পাকবাহিনীর ওপর চরম অপমানজনক পরাজয়ের গ্লানি চাপিয়ে দেয়ার এই সুযোগ ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সহজেই হারাতে প্রস্তুত ছিলেন না।

একাত্তরে স্বাধীনতার প্রশ্নে বাংলাদেশের পিকিংপন্থী দলগুলোর অনৈক্য আর বিভ্রান্তি তাদেরকে গুরুতহীন করে তোলে ও লোকচক্ষুর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু থেকে ঠেলে দেয়। অনেকে বাংলাদেশের প্রতি চীনা দৃষ্টিভঙ্গি অগ্রাহ্য করে নিজস্ব সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যুদ্ধে সমর্থন দান করেন। রাজশাহীতে ওহিদুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা কম্যুনিস্ট পার্টির স্থানীয় শাখা প্রায় এক হাজার গেরিলা জড়ো করে ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে যুদ্ধে যোগ দেয়। এরাই পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর হাত থেকে আত্রাই মুক্ত করতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে মতিন—আলাউদ্দিনের নেতৃত্বে দলের পাবনা শাখাও একইভাবে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। এরা প্রায় একশ' পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা হত্যা করে ও জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে জাতীয় বুজোয়াসহ সব জাতীয়তাবাদী শক্তির একতার আহ্বান জানায়। কিন্তু এপ্রিলে চীনা অবস্থান প্রকাশিত হবার পর এরাই আবার সম্পূর্ণ উল্টো অবস্থান নেয়।[২৫]

বাংলাদেশের বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য একাত্তর ছিল স্বাধীন চিন্তাধারার এক অগ্নি-পরীক্ষা। মার্কসীয় আদর্শগত পরিধির বাইরের দলগুলোও এই সংকটের সম্মুখীন হয়। পিকিংপন্থীদের বাইরেও বামপন্থীদের মধ্যে দ্বিতীয় আরেক ধারা ছিল মস্কোপন্থী দলগুলো বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি (মণি) ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) আওয়ামী লীগের প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সাহায্য যোগায়, কিন্তু সার্বিক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অবদান নিতান্তই গুরুত্বহীন। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির মতো মস্কোপন্থীরা তত্ত্ব

খাড়া করে যে, সাংবিধানিক পথে সমাজতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ উত্তরণ সম্ভব। এরা সকল বামপন্থী ব্যক্তি ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে মিত্রতার আহ্বান জানায়। সত্তরের নির্বাচনে তারা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগারো দফা দাবির সমর্থন করে। তবে সাধারণ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের স্বতন্ত্র অবস্থানের আদর্শবাদী আকর্ষণ ছিল নিম্ন গুরুত্বের পর্যায়ে। একজন পর্যবেক্ষকের মতে, 'না আওয়ামী লীগ তাদের কথায় কান দিয়েছে, না দিয়েছে পিকিংপন্থী বামদলগুলো।[২৬]

জাসদ—বিন্দু থেকে বৃত্ত

বাংলাদেশের উদারনৈতিক রাজনীতি অঙ্গনে পিকিংপন্থী আর মস্কোপন্থী ধারার পাশাপাশি তৃতীয় এক মার্কসীয় ধারার অস্তিত্ব ছিল। '৭২-এর আগে এদের সম্বন্ধে লোকে খুব কমই জানতো। মাত্র সম্প্রতি এর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানা গেছে। এঁরা দাবি করেন যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে থেকেই একটি আত্মসচেতন কেন্দ্র হিসেবে এরা এক দশক ধরে প্রগাঢ়ভাবে কাজ করেছেন। ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বরের ধারণা এবং যে সমস্ত ঘটনার কারণে তাহেরের ফাঁসি হয়েছে—সবই এই রাজনৈতিক ধারার ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। '৭২-এ এরা প্রথম বারের মতো নিজেদেরকে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামে প্রকাশিত করে।

সাম্প্রতিক পার্টি দলিল ও এদের নেতৃবৃন্দের কথাবার্তা অনুযায়ী ১৯৬২ সালে একদল সচেতন যুবক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'নিউক্লিয়াস' গঠন করে। সেখান থেকেই জাসদের ইতিহাসের শুরু। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে এদের ভূমিকা ছিল অন্যান্য বিপ্লবী দল থেকে আলাদা ধরনের। অন্যদের মতো এরাও একথা বিশ্বাস করতো যে, অনুন্নত পূর্ব বাংলার দারিদ্র্য ও পশ্চাদমুখিনতার একমাত্র সমাধান সমাজতন্ত্র। তা সত্ত্বেও তাঁরা যুক্তি দেখান যে, একটি সমাজতান্ত্রিক পার্টি প্রতিষ্ঠার উপাদান এবং শর্ত হিসেবে পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অত্যাবশ্যকীয়। এরা কয়েকজন ব্যক্তিকে ঘিরে একটা 'নিউক্লিয়াস' গঠন করে। এইসব ব্যক্তিত্বের মধ্যে একজন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল আলম খান। এই গ্রুপের মূল থিসিস ছিল এই যে, ইতিহাসের সেই ক্ষণে জাতিগত প্রশ্নই বাঙালি সমাজের প্রধান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের প্রক্রিয়া এক জাতিগত নিপীড়নের রূপ নিয়েছিল। আর সেই সাথে পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক পক্ষপাতিত্ব একটা গণ আন্দোলনের পেছনে প্রধান চালিকা শক্তি সৃষ্টি করেছিল।

অন্যান্য মার্কসবাদীদের বক্তব্য ছিল, যে কোন রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেশের দু অংশের মধ্যে বিরাজমান ভিন্ন জাতীয় অধিকারের প্রশ্নকে প্রশ্রয় দিলে জনগণ শ্রেণীসংগ্রাম থেকে সরে গিয়ে বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়বে। এঁরা সারা পাকিস্তান জুড়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। এই কৌশলের সাথে মৌলিকভাবে দ্বিমত পোষণ করেন পূর্বে উল্লিখিত তৃতীয় ধারার নেতৃবৃন্দ। তাঁরা পাকিস্তানের দু শাখায় একসাথে একতা ও সমন্বয় ভিত্তিক দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাবকে অবান্তর ও উদ্ভট বলে মনে

করেন। এঁদের মত ছিল, যেহেতু, পাকিস্তানের দু শাখার মধ্যে রয়েছে হাজার মাইলের দূরত্ব, বহুজাতিক সংমিশ্রণ ও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো, কাজেই এই ধরনের একক সত্তার আন্দোলন অসম্ভব।

এঁরা যুক্তি দেখান যে, একনায়কবাদী সামরিক শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি পূর্ব বাংলায় তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হলে লক্ষ লক্ষ লোক জনরাজনীতি ও গণঅসন্তোষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করবে। পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক সামরিক শোষকশ্রেণীর ইতিহাস থেকে বোঝা যায় এ ধরনের একটা আন্দোলন দমন করতে এরা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আশ্রয় নেবে—আর এভাবেই গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের দাবিতে পূর্ব বাংলার লোকেরা শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। জাসদ নিউক্লিয়াস মনে করতেন সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে এই পর্যায়ে বিপ্লবী সংগ্রামে পরিণত করা সম্ভব।

জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে একাত্ম করতে না পারার পেছনেই মূলত দক্ষিণ এশিয়ার কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতা লুকিয়ে রয়েছে। ১৯৪২-এ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ইংরেজের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে নামে। এ সময় একদিকে যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দিয়ে হাজার হাজার জাতীয়তাবাদী বীর জেলখানায় গিয়েছে, অন্যদিকে ঠিক তখনি কম্যুনিস্টরা স্ট্যালিনের বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে একাত্ম হয়ে ইংরেজের সাথে জোট বেঁধেছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যদিও ফ্যাসিবাদের বিরোধী ছিল তবুও ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে সুস্পষ্ট ঘোষণা না পাওয়া পর্যন্ত তারা ব্রিটিশের সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানায়। স্বাধীনতার পর ব্রিটিশের দালালির বদনাম ঘুচাতে কম্যুনিস্টদের অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছিল।

প্রথম দিকে পূর্ববাংলা কম্যুনিস্ট পার্টি, কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয়কারী কমিটি, পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন ও মাইথিগোষ্ঠী প্রভৃতি ছোট দল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিভক্তির ব্যাপারে জাসদ নিউক্লিয়াসের সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে একমত ছিল। এসব দলের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেই বিভক্তি ছিল, যেমন পূর্ব বাংলা একটি আধা-সামন্তবাদী সমাজ কি-না, নাকি এদেশ অনগ্রসর পুঁজিবাদী সমাজের অন্তর্গত; কিন্তু এদের প্রধানতম মতবিরোধ ছিল দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণের প্রশ্নে। পূর্ব বাংলা কম্যুনিস্ট পার্টি একটি শ্রমিক পার্টির নেতৃত্বে পূর্ব বাংলাকে আলাদা করার সমর্থক ছিল, অন্যদিকে জাসদ নিউক্লিয়াসের কৌশল ছিল ভিন্ন। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে এরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দেয় ও দলের সাথে নিজেদের আত্মস্থ করে। এরা বরাবারই ছিল দলের ভেতর একটি সুস্পষ্ট, সচেতন ও স্বাধীন 'নিউক্লিয়াস'। কিন্তু অন্যদের কাছে এরা ছিল আওয়ামী লীগের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, লড়াকু ও সবচেয়ে বিপ্লবী যুব কর্মী। আওয়ামী লীগ ছিল জাতীয়তাবাদী দল আর শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলেন, তাই এরা আওয়ামী লীগে যোগ দেয়। কিন্তু প্রথম থেকেই এদের মানসিকতা ছিল

সেই—'একের ভেতর দু দল' আর তাই সময় যখন আসল তখন নতুন দলকে গড়ে তুলতে তারা দেরি করে নি।

শক্তিশালী পূর্ব পাকিস্তন ছাত্র লীগের ওপর শীঘ্রই এই গ্রুপ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। পিকিংপন্থী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাথে এরা আয়ুবশাহীর একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে '৬৬ ও '৬৯-এর বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন। অভূতপূর্ব ছাত্রজনতার বিরোধের মুখে ঊনসত্তরে আয়ুব খানের দশ বছরব্যাপী একনায়কত্বের অবসান ঘটে। আয়ুবের পর ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকার ক্ষমতায় আসে, এরা এক ইউনিট বিলোপ ছাড়াও দেশব্যাপী জাতীয় নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেয়।

সত্তরের ডিসেম্বরে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের অনেক বামপন্থী দলই নির্বাচনী তৎপরতায় অংশ গ্রহণে রাজি ছিল না। আওয়ামী লীগের মধ্যে জাসদ-নিউক্লিয়াস নির্বাচনে যাবার পক্ষে ছিল। স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কা.হ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলবার জন্য গ্রামে গ্রামে এরা নিজস্ব কর্মী ও ছাত্র সমর্থকদের পাঠিয়ে দেয়। হাজারো শিক্ষিত শহুরে যুবকদের গ্রামে পাঠাবার এই ছিল অপূর্ব সুযোগ। একই সাথে দু'টো কাজ হলো—সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র আর জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ শহুরে তরুণরা গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে; অন্যদিকে মূর্খ-দরিদ্র-দুর্বল বাঙালি ঐসব বইপড়া যুবকদের কাছ থেকে শ্রেণী সংগ্রাম ও রাজনীতির ব্যাপারে নতুন কথা জানতে পায়।

নির্বাচনের অনেক আগেই বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। ভোটের ছয় মাস আগে সত্তরের বারোই আগস্টে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির এক বর্ধিত সভায় স্বপন কুমার চৌধুরী (ইনি আলম খানের লোক বলে পরিচিত ছিলেন)স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের এক প্রস্তাব পেশ করেন। তিন মাস আগেই ছয়ই জুন এরা স্বাধীনতার এক ঘোষণাপত্র ও নতুন জাতীয় পতাকার নকশা তৈরি করেছিলেন ; ঘন সবুজের পটভূমিতে লাল টকটকে সূর্য।[২৮] আজ এটা এদেশের জাতীয় পতাকা। প্রত্যাশিত অবস্থার সৃষ্টি হলে এরা স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলেন।

ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সর্বাত্মক বিজয় হয়। কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের ফলকে মেনে নিতে অস্বীকার করে ও নির্ধারিত সময়ে জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসাতে অস্বীকার করে, ফলে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। একাত্তরের পহেলা মার্চে সরকার সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাতিল ঘোষণা করেন ; আওয়ামী লীগের অন্তর্ভুক্ত জাসদ-নিউক্লিয়াস তাৎক্ষণিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার ডাক দেয়। এই নতুন অবস্থায় শেখ মুজিব ছিলেন অনিশ্চিত ও দোদুল্যমান। তিনি বর্তমান স্বায়ত্ত শাসনের অবস্থানেই থেকে যাবেন না পূর্ণভাবে স্বাধীনতার দাবিতে এগিয়ে যাবেন তা ঠিক করতে পারছিলেন না। শেখ মুজিবের উপস্থিতিতে দোসরা মার্চ ছাত্রলীগের নেতা আ. স. ম. আবদুর রব (পরে জাসদের সাধারণ সম্পাদক হন) পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পরদনি পল্টন ময়দানের এক বিরাট জনসভায় শাহ্‌জাহান সিরাজ, যিনি পরে জাসদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হন—

স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণাপত্র পড়ে শোনান। সাত তারিখে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (এখন আর পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ নয়) নেতারা শেখ মুজিবকে তাদের চূড়ান্ত অবস্থান জানিয়ে দেন হয় তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন না হলে তারা শেখকে ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে এগিয়ে যাবেন। এই সময় শেখ মুজিব প্রকাশ্যভাবে এজেন্সি-ফ্রান্স-প্রেস-এর একজন প্রতিনিধিকে বলেন—

> পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার কি এটা জানে না যে শুধু আমি এবং কেবল আমিই পূর্ব পাকিস্তানকে কম্যুনিজমের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি? তারা যদি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় আমি ক্ষমতা হারাবো আর আমার জায়গা দখল করবে নক্সালপন্থীরা। আমি যদি খুব বেশি ছাড় দেই তাহলে আমার কর্তৃত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। আমি এক কঠিন অবস্থানে রয়েছি।[২৯]

একাত্তরের এক সক্রিয় কর্মী হারুনুর রশীদ এই লেখককে জানান— 'যেহেতু আন্দোলনের সুতা ছিল আমাদের হাতে মুজিবের সাহস ছিল না আমাদের বিরুদ্ধে যাবার।' হারুনুর রশীদ পরে জাসদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন।[৩০] সাতই মার্চ দশ লক্ষ লোকের সামনে রমনা রেসকোর্সে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান— অনুবাদক) এক জনসভায় মুজিব ঘোষণা করলেন— 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। পঁচিশে মার্চ এসে গেল, মৃত্যুর অন্ধকারে বাঙালি জাতীয়তাবাদ খুঁজে পেল তার জন্মের বীজ' স্বাধীনতা সংগ্রাম হল শুরু...।

সামরিক বিতর্ক : গণযুদ্ধ বনাম প্রথাগত যুদ্ধ

এখন সময় হয়েছে তাহেরের জীবনের দিকে ফিরে তাকাবার, এই ব্যক্তির জীবন বোঝার জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বোঝা একান্ত প্রয়োজন। একে অন্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বাঙালিদের ওপর যখন পাকিস্তানি হানাদারদের বর্বর হামলা নেমে আসে তাহের তখন পশ্চিম পাকিস্তানে। তিনি স্পেশাল সার্ভিসেস গ্রুপ নামে পরিচিত বিশিষ্ট কমান্ডো ইউনিটে একজন অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পঁচিশে মার্চের কালরাত্রিতে তাহের কোয়েটায় পাকিস্তান স্কুল অব ইনফ্যান্ট্রি অ্যান্ড ট্যাক্‌টিকস-এ অগ্রবর্তী এক কোর্সে অংশ নিচ্ছিলেন। চারদিন পর দেশের পূর্বাঞ্চলে সংঘটিত বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে অপ্রিয় বক্তব্য প্রকাশের জন্য তাহেরকে গ্রেফতার করা হয়। স্কুল-প্রধান ছিলেন তাহেরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তার ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে তাহেরকে পরে মুক্তি দেয়া হয় ও খাঁরিয়া সেনানিবাসে অবস্থিত তার ইউনিটের প্রধান সদরে তাকে ফিরে যেতে আদেশ দেয়া হয়। সে ইউনিট থেকে ইতিমধ্যে বাঙালি অফিসার ও জওয়ানদের বাদ দিয়ে বাকিদের পূর্বাঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল।

গৃহযুদ্ধের ফলে পশিচম পাকিস্তানে আটকে পড়া অনেক বাঙালি অফিসার তাদের জীবনের সবচেয়ে বড়ো সমস্যার সম্মুখীন হন। কি করা যায়? জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে অনেক দূরে পশ্চিম পাকিস্তানে নিরাপদে সপরিবারে অবস্থান—নাকি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে যেয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান; যেখানে আজ তাদের সামরিক প্রতিভার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। যুদ্ধের ফলে প্রায় বিশ হাজার বাঙালি সিপাহী আর এক হাজার অফিসার পশ্চিমে আটকা পড়ে যান। এই আটকে পড়া লোকগুলো শুধু পাকিস্তানে আটকা পড়েন নি, সেইসাথে জাতীয় প্রশ্নের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সংকটেও তারা আটকা পড়ে যান। বাঙালি না পাকিস্তানি—এদের সবাইকে নিজ জাতীয়তা বেছে নেয়ার মতো একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল।

এধরনের কোনো অবস্থায় সচরাচর যা হয় এখানেও তাই হলো। আসন্ন বিপদের কথা চিন্তা করে অনেকেই ভয়ে কুঁকড়ে যান, বাকিরা নিজেদের সমস্ত অস্তিত্ব বাজী রাখেন যুদ্ধে যোগদানের জন্য। গোপন ট্রাইবুন্যালের যে বিচারে তাহেরকে ছিয়াত্তরের জুলাইতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল, সেখানে জবানবন্দীতে তাহের এই সময়ের ছবি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন (তাহেরের সম্পূর্ণ জবানবন্দী বাংলাদেশ সরকার গোপন অবস্থায় রেখেছেন। বেসরকারি বিভিন্ন লোকের সূত্রে প্রাপ্ত পূর্ণ বিবরণ গ্রন্থের শেষে প্রদত্ত হল)।

ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান কর্নেল ইউসুফ হায়দার যিনি পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানেই ছিলেন এবং ১৯৭৪-এ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তাঁর সামনে তাহের বলেন—

> পঁচিশে মার্চের সেই কালরাত্রির কথা আমার মনে পড়ছে। পাকিস্তানি সেনারা আমাদের জনসাধারণের বিরুদ্ধে বর্বর ও কাপুরুষোচিত হামলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। চাপিয়ে দেয়া সেই যুদ্ধে জয়ী হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না। হেরে গেলে আমাদের ওপর চেপে বসত শতাব্দীর দাসত্ব।... সেইসব দিন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের জন্য নিজেকে যাচাই করার সময়। সেদিন আমি দেশের ডাকে সাড়া দিতে দ্বিধা করি নি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জেনারেল হেড কোয়ার্টার থেকে যখন পূর্বাঞ্চলে বার্তা পাঠানো হলো — 'সবকিছু পুড়িয়ে যাও, যাকে সামনে পাও তাকেই মেরে ফেল ; পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে পড়া কারুরই জানতে বাকি ছিল না। দেশে কি ঘটতে যাচ্ছে।...
>
> পঁচিশে মার্চ আমি কোয়েটায় ছিলাম। সেখানে স্কুল অব ইনফ্যান্ট্রি অ্যান্ড ট্যাক্‌টিকস্‌-এ আমি এক উচ্চতর কারিগরি প্রশিক্ষণে অংশ নিচ্ছিলাম। ছাব্বিশে মার্চ সন্ধ্যায় রেডিওতে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সেই ঘোষণা শুনে আমি বুঝতে পারি যে আমার দেশবাসীর ওপর কি দুর্যোগ নেমে এসেছে। সারা রাত ধরে আমি কোয়েটার নির্জন রাস্তায় হেঁটে বেড়ালাম।...
>
> সেই সময় কি করা উচিত তা জানতে চেয়ে অনেক কনিষ্ঠ অফিসার আমার সাথে যোগাযোগ করে। তাদের আমি স্পষ্টভাবে বলে দেই তাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে এখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে যেয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেয়া। এরা আমাকে আরো জানায়, তারা কোয়েটায় অবস্থানরত অন্য আরো উচ্চপদস্থ বাঙালি অফিসারদের কাছে গেলে তারা এদের উপদেশ দেয়া তো দূরের কথা সৌজন্য করে আপ্যায়ন কিংবা কথাও পর্যন্ত বলে নি। পাছে আবার পাকিস্তানি প্রভুরা তাদের আনুগত্য নিয়ে সন্দেহ করে। এসব উচ্চপদস্থ অফিসারদের অনেকেই আজ এদেশে সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত, এরাই আজ আমাকে অপদস্থ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।[৩১]

পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের জন্য করণীয় ছিল একটাই—পালানো। কাশ্মীরের পাহাড় অঞ্চল দিয়ে পালানোর এক ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর তাহের পালানোর জন্য দ্বিতীয় বারের মতো পরিকল্পনা করেন, এবারের পরিকল্পনায় তার সাথে জড়িত ছিলেন রাওয়ালপিণ্ডি জেনারেল হেডকোয়ার্টারসে কর্মরত এক তরুণ বাঙালি অফিসার মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন। পাকিস্তানের শিয়ালকোট এলাকা দিয়ে আরো দু'জন বাঙালিসহ গভীর রাতে চরম সাহসিকতার সাথে এরা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে পৌঁছান। পাকিস্তান থেকে এ দু ব্যক্তির পলায়ন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও

যুদ্ধপরবর্তী-দেশগঠনকালে বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। যুদ্ধের পর তাহের আর জিয়াউদ্দিন মিলে দেশের পদাতিক বাহিনীর শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ অংশের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এরা দু'জন মিলে উপমহাদেশের জন্য সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক সামরিক সংগঠন সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছানোর পর তাহের আর জিয়াউদ্দিন দু'জনকেই সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। যুদ্ধ তখন চলছে। পঁচিশে মার্চের পরপরই বেসামরিক লোকেরা মিলে অনিয়মিত গেরিলা ইউনিট গঠন করে ও জায়গায় জায়গায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে, এর ফলও পাওয়া যায়—পাকিস্তানিরা তাদের সীমান্তবর্তী ঘাঁটিগুলোতে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

পাকিস্তানিদের ত্বরিৎ ও প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পাকিস্তানে কর্মরত বাঙালি সেনাদের মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টর প্রায় এক হাজার সৈন্য ও রাজধানীতে অবস্থানরত আধাসামরিক পুলিশ বাহিনীর প্রায় পাঁচ হাজার সদস্য মারা যায়। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মোটামুটি ছয় হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র তিন হাজার সদস্য ভারতে গিয়ে মিলিত হতে সক্ষম হয়।

হালকা অস্ত্রে সজ্জিত সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর চৌদ্দ হাজার সদস্যের মধ্যে মাত্র আট হাজার জন বেঁচে যায়।[৩২] মূলত পুলিশ আর গোয়েন্দা বিভাগের হাতেগোনা কয়েকজন দালাল বাদে প্রাণে বেঁচে যাওয়া আর বাকি সবাই পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অন্যদিকে ঢাকার বাইরের সেনানিবাসগুলোতে বাঙালি ইউনিটের সেনাদের হাতে প্রতিক্রিয়া প্রকাশের জন্য যথেষ্ট সময় ছিল। তরুণ বাঙালি অফিসারদের নেতৃত্বে বাঙালি সেনারা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও তাদের প্রাক্তন সহযোগীদের অনেককেই হত্যা করে। এদের নেতৃত্বে ছিলেন চট্টগ্রামে জিয়াউর রহমান, কুমিল্লায় খালেদ মোশাররফ, কুষ্টিয়ায় ওসমান আর ময়মনসিংহে শফিউল্লাহ্। মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে তার বাহিনী কয়েকদিনের জন্য শহরে তাদের আধিপত্য বজায় রাখে। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়া বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে প্রায় এক লাখ পাকিস্তানি সেনা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে; কয়েকদিনের মধ্যেই তারা সব গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করে। বেসামরিক লোকজন অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। শিগগিরই নিয়মিত সামরিক ইউনিটগুলো পুনঃসংগঠিত হবার জন্য কিছুদিনের মধ্যেই ভারতে পাড়ি জমায়।

এদিকে যখন হত্যাযজ্ঞের রাত্রে একের পর এক হত্যাকাণ্ড হচ্ছে, শেখ মুজিবুর রহমান তখন গান্ধীজীর অনুকরণে অহিংস প্রতিরোধের পথ গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগ নেতারা যখন সবাই জীবন বাঁচাতে পালিয়ে যাচ্ছেন শেখ মুজিব তখন তাঁর বাসায় বসে রইলেন। পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। দলের বড়ো নেতাদের সবাই ভারতে পৌঁছাতে সক্ষম হলেন ; সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাদর অভ্যর্থনা। কোলকাতাকে ঘাঁটি করে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠনের অনুমতি তখনই পাওয়া গেল।

জুলাইয়ের দিকে তাহের তখন টাঙ্গাইল আর ময়মনসিংহ মিলিয়ে বিস্তৃত এগারো নং সেক্টরের নেতৃত্ব নিলেন, নেতৃত্বের উচ্চতম স্তরে তখন ইতিমধ্যেই যুদ্ধ পরিচালনায় কোন্ কৌশল গ্রহণ করা হবে তা নিয়ে প্রচণ্ড তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতসহ আওয়ামী লীগের নির্বাসিত সরকার এটা ভালোভাবেই জানতেন যে একটা দীর্ঘস্থায়ী জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম বিপ্লবী যুদ্ধে পরিণত হতে পারে।

সামরিক বিতর্ক মূলত আবর্তিত হচ্ছিল পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে নেয়া তিন রকমের সামরিক কৌশলের প্রশ্নে ; এদের প্রত্যেকটাই ভিন্ন ভিন্ন সামরিক কৌশলগত ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে। কখনো পাশাপাশি চলেছে তিন ধরনের কৌশল, কখনো স্বাধীনভাবে, কিন্তু এদের প্রত্যেকটাই স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ণ আধিপত্য পাবার জন্য পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধরত আলাদা রাজনৈতিক ধারার প্রতিনিধি।

প্রথমটা যাকে 'সরকারি' প্রতিরোধ বলা যায় তা মূলত উপনিবেশ-উত্তর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আদলে গড়ে উঠেছিল। এতে প্রাণে বেঁচে যাওয়া বাঙালি সামরিক শক্তির ওপর মূলত জোর দেয়া হয়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাহায্য-সহযোগিতা আর বাঙালি সামরিক অফিসারদের নেতৃত্বে সৈন্যদেরকে আসাম ও ত্রিপুরার সীমান্ত এলাকায় দু'টো বিগ্রেডে সংগঠিত করা হয়। এদের সাংগঠনিক ও নেতৃত্ব কাঠামো সম্পূর্ণভাবে ছিল প্রচলিত কাঠামোধীন। এই দু ব্রিগেডের সামরিক কৌশল ও মনমানসিকতা উপমহাদেশের উপনিবেশ-পরবর্তী সেনাবাহিনীগুলো থেকে আলাদা কিছু ছিল না। অনেক কিছুতেই এরা ব্রিটিশদের থেকেও ছিল বেশি ব্রিটিশ। অফিসারদের তাঁবু ছিল কার্পেটে মোড়া, সন্ধ্যা বেলায় বসতো হুইস্কির আসর আর ব্যাটম্যানরা তাদের 'সাহেবের' হুকুমের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতো।

সেনাবাহিনীর সার্বিক অধিনায়কত্বে ছিলেন জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। ত্রিপুরায় অবিস্থিত ব্রিগেডের নেতৃত্ব ছিল খালেদ মোশাররফের হাতে। 'কে'-ফোর্স নামে অভিহিত এই বাহিনীর সদর দপ্তর ছিল আগরতলায়। আসামে অবস্থিত 'জেড'-ফার্সের অধিনায়ক ছিলেন জিয়াউর রহমান। ভারতে উপস্থিত বাঙালি সেনাদের মধ্যে সেরা লোকজনকে এ দু বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বাংলাদেশ হাইকমান্ড ভারত থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। যদিও দিনে দিনে দু ব্রিগেডই অনেক বড়ো হয়ে ওঠে, তবুও এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না যে পাকিস্তানি বাহিনীর লাখখানেক নিয়মিত অনিয়মিত সৈন্যকে পরাজিত করার মতো লোকবল বা অস্ত্রবল কিছুই এদের নেই। বোঝাই যায় যে প্রচলিত যুদ্ধভিত্তিক এই রণকৌশল মেনে নিতে গেলে শেষে বাঙালিদেরকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করতে হবে, আর এখানে এসে ওসমানী, আওয়ামী লীগ আর ভারতীয় সেনাধ্যক্ষরা সবাই একমত হলেন— রাজনৈতিক অবস্থান থেকে এই যুদ্ধের এক দ্রুত পরিসমাপ্তি দরকার। এরা সবাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলাদেশে একটা আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন।

একাত্তরের এপ্রিলের মধ্যেই ভারতীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেন যে, তাদের নিজ স্বার্থেই বাংলাদেশকে পূর্ণভাবে সমর্থন দেয়া অতি জরুরি। ভারত এর আগে দু'বার পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, এখন শতাব্দীর সুযোগ তাদের দোরগোড়ায়। এতে পাকিস্তান ভেঙ্গে ছোট হয়ে যাবে ; এই অঞ্চলে প্রশ্নাতীতভাবেই ভারত পরিণত হবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে। বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতীয় কংগ্রেস পার্টির ইচ্ছা ছিল ঢাকায় ধর্মনিরপেক্ষ ও নিজেদের আন্তর্জাতিক নীতির সমান্তরাল এক সরকারকে ক্ষমতায় বসানো। বাংলাদেশের জন্য প্রচলিত যুদ্ধরীতি রণকৌশল গ্রহণ করার অর্থ ছিল ঘাঁটি, প্রশিক্ষণ আর অস্ত্রের জন্য পুরোপুরি ভারতের ওপর নির্ভরশীল হওয়া।

বাংলাদেশ সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে এক বিকল্প রণনীতির প্রস্তাব করা হয়। এই রণনীতির মূলে ছিলেন একদল অভিজ্ঞ কমাণ্ডো অফিসার যারা জেনারেল ওসমানী আর ভারতীয়দের প্রস্তাবিত রণকৌশল প্রত্যাখ্যান করেন। এই ভিন্ন মতাবলম্বীদের দৃষ্টিভঙ্গি তাহের আর জিয়াউদ্দিনের সামরিক আদর্শে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। বাংলাদেশের মাটিতে যুদ্ধরত সেক্টর কমান্ডার হিসেবে এরা সব সেক্টরের প্রধান ঘাঁটি ভারতের মাটিতে স্থাপন করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এরা জোর দিয়ে বলেন অস্থায়ী সরকারের রাজধানীসহ সব সেক্টরের ঘাঁটি দেশের মাটিতেই থাকা উচিত। এরা সামরিক শক্তিকে দু'টো বিগ্রেডে কেন্দ্রীভূত করার ব্যাপারেও বিরোধী ছিলেন। এরা সাধারণ মানুষকে নিয়ে গেরিলা বাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণের আদেশ দিয়ে ঐ সব অভিজ্ঞ সামরিক ব্যক্তিত্বকে জেলা, মহকুমায় ছড়িয়ে দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তাহের হিসেব কষে দেখান যে এক বছরের মধ্যেই এভাবে এক লাখ লোকের কৃষক-বাহিনী গঠন করা সম্ভব। তিনি আরও যুক্তি দেখান যে এই বাহিনী যদি উৎপাদনমুখী বাহিনী হয় তাহলে দেশের নিজস্ব সম্পদ থেকেই প্রায় বিশ ডিভিশন সৈন্যের সব ধরনের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। বিদেশি সরবরাহের ওপর নির্ভর না করে শত্রুপক্ষের অস্ত্র-শস্ত্র দখল করার ওপরই বেশি জোর দেয়া হয়। শুধু ব্যাপক জনসমর্থন আর বাঙালি জনসাধারণের পূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমেই কেবল বিপুল সংখ্যাধিক্যের অধিকারী আর উৎকৃষ্টতর অস্ত্রসজ্জিত এই পাকিস্তানি বাহিনীকে যুদ্ধে হারানো সম্ভব বলে তারা মন্তব্য করেন। এদের দৃষ্টিতে ভারতীয় নয় বরঞ্চ বাঙালিদের হাতেই পাকিস্তানিদের পরাজয় ঘটাতে হলে এ ধরনের গণযুদ্ধ ছিল তার একমাত্র সমাধান। এরা ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপের বিশেষভাবে বিরোধী ছিলেন।

এছাড়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিল আরেক ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা। দেশের বিভিন্ন জায়গায় বেসামরিক লোকেরা নিজ উদ্যোগে কোন কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ বা আনুষ্ঠানিক কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এদের মধ্যে পাবনাতে অবস্থিত আবদুল মতিনের পূর্ববাংলা কম্যুনিস্ট পার্টির লোকজন ও টাঙ্গাইলে কাদের সিদ্দিকীর নাম উল্লেখযোগ্য। আর এ প্রতিরোধ গড়ে ওঠেছিল পূর্ব পরিকল্পিত কোন সাংগঠনিক ব্যবস্থা ছাড়াই, আর এ সবের নেতৃত্বে ছিলেন তরুণ দেশপ্রেমিকরা। তাহের তাঁর জবানবন্দীতে এদের মূল্যায়ন করেন— 'স্বাধীনতা যুদ্ধে যুদ্ধরত শক্তিগুলোর

স্বাভাবিক উত্তরণ' হিসেবে। তাহের আর জিয়াউদ্দিনের মতো অফিসাররা অনিয়মিত বাহিনী হিসেবে মুক্তিবাহিনী যাতে ভালভাবে গড়ে ওঠে এ নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি কমান্ড কাঠামোর মধ্যে সংগ্রামরত ছিলেন। তাঁদের আশা ছিল প্রশিক্ষিত সৈন্যদেরকে নতুন নতুন গেরিলা ইউনিটের সঙ্গে মিশিয়ে দেশের অভ্যন্তরে এমন এক সেনাবাহিনী গড়ে তোলা যা একদিন সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর ভিত্তি হবে।

যুদ্ধের সময় তাহের চিলমারী আর কামালপুরে দু'টো গুরুত্বপূর্ণ সংঘর্ষের নেতৃত্ব দেন। সামরিক যুদ্ধের ইতিহাসে এই দুই সংঘর্ষ চরম সাহসিকতা আর দক্ষ নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত হিসেবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। উত্তরবঙ্গের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সামরিক নিয়ন্ত্রণ ছিন্ন করতে চিলমারী যুদ্ধের ভূমিকা ছিল অপিরিসীম। চিলমারীকে আক্রমণের কেন্দ্র করার পেছনে অনেক কারণ ছিল। ব্রহ্মপুত্র নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত চিলমারী একটা উল্লেখযোগ্য নদী-বন্দর। দক্ষিণাঞ্চলের সাথে চিলমারীর পূর্ণ সড়ক ও রেল যোগাযোগ রয়েছে। চিলমারীকে অভ্যন্তরীণ নৌঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে পাকিস্তানি সেনারা সহজেই নদীর মূল প্রবাহ ধরে নদীতীরের গ্রাম আর শহরে একের পর এক আঘাত হেনে চলছিল। এছাড়াও চিলমারী এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের ওপর স্থানীয় মুসলিম লীগ চেয়ারম্যান আবু কাসেমের নেতৃত্বে একদল উগ্র ইসলামপন্থী দালাল সন্ত্রাস চালিয়ে আসছিল। কিন্তু তাছাড়াও তাহেরের সৈন্যদের কাছে চিলমারীর আসল গুরুত্ব ছিল দেশের ভেতরে একটা মুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য, যেখানে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার তাদের প্রধান রাজনৈতিক ঘাঁটি স্থাপন করতে পারবেন। কাছাকাছি রৌমারী মহকুমাকে সবচেয়ে ভাল জায়গা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল। কিন্তু আগস্টে চিলমারীতে অবস্থিত পাক বাহিনীর গানবোটগুলো মহকুমার মুক্তাঞ্চলে আঘাত হানা শুরু করলে চিলমারীস্থ পাক-ঘাঁটি ধ্বংস করা খুবই দরকারি হয়ে ওঠে।

চিলমারী সংঘর্ষের এক মাস আগে সেক্টর কমান্ডারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাহের এই সভায় তার রণকৌশল ব্যাখ্যা করেন, তিনি নিয়মিত ব্যাটেলিয়ন গঠনের বিরোধিতা করেন এবং সব সামরিক ঘাঁটি ভারতের মাটি থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সরিয়ে আনার পক্ষে যুক্তি দেখান। এ সভায় জিয়াউদ্দিন, আর আশ্চর্যজনকভাবে জেড ফোর্সের অধিনায়ক জিয়াউর রহমান তাহেরকে সমর্থন দেন। যুদ্ধের মধ্যে গড়ে ওঠা তাহের আর জিয়ার এই বন্ধুত্ব কয়েক বছর পর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্ম দেয়। এই সভা অনুষ্ঠানের সময় পর্যন্ত তাহের আর জিয়া এগারো নং সেক্টরে এক সাথে কাজ করে আসছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় জিয়া ভারতের ওপর নির্ভরতা নূন্যতম পর্যায়ে কমিয়ে আনা ও প্রধান ঘাঁটিগুলো বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাহেরের প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু বাকিরা—কর্নেল ওসমানী, মেজর খালেদ মোশররাফ, মেজর শফিউল্লাহ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাহের আর জিয়ার মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কের কারণেই পঁচাত্তরের সাতই নভেম্বর বারো দফা দাবির প্রতি জিয়ার বিশ্বাসঘাতকতা মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য সিপাহীদের কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল। প্রগতিবাদিগণ জিয়াকে একজন সৎ ও অঙ্গীকারবদ্ধ জাতীয়তাবাদী মনে করতেন। অন্য সবাই যেখানে যুদ্ধের সময় সুযোগের

সদ্ব্যবহার করেন, জিয়া সেখানে দুর্নীতি থেকে দূরে সরে ছিলেন। এরা আশা করতেন যে, উপযুক্ত সময়ে জিয়াকে নিপীড়িত জনতার আদর্শে আকৃষ্ট করা হয়তো সম্ভব হবে। এরা কোনদিন চিন্তাও করেন নি যে এই জিয়াই সেনাবাহিনীতে ডানপন্থী শক্তির পুনরুত্থানের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হবেন। ১৯৭২-এর হত্যাযজ্ঞের আগে চিয়াং কাই-শেকের সাথে মৈত্রীতে বিশ্বাস করে চীনা কম্যুনিস্টরা যে ভুল করে ছিল জিয়াকে বুঝতে বাঙালি বামপন্থীদের ব্যর্থতা কেবল তার সাথেই তুলনীয় (এখানে লেখক চিয়াং কাই-শেকের সাথে কম্যুনিস্টদের মৈত্রী স্থাপনের যৌক্তিকতার প্রশ্ন তুলেছেন। জাপানের সামরিক শক্তির দ্বারা চীন আক্রান্ত হলে ঐতিহাসিক চাপ-বিরোধী যুদ্ধে মাও সব জাতীয়তাবাদী শক্তির একতার কথা তুলেছিলেন। বিস্তর মতপার্থক্য থাকলেও মাও তখন যথেষ্ট ছাড় দিয়ে চিয়াং কাই-শেকের জাতীয়তাবাদী দল 'কুওমিনটাং'-এর সাথে মৈত্রী করেন। চিয়াং কাই-শেক অবশ্য চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন ও এর জন্য কম্যুনিস্ট পার্টিকে চড়া দাম দিতে হয়েছিল। বহু সুযোগ্য যোদ্ধা তারা হারিয়েছিলেন। এই মৈত্রী স্থাপন নিয়ে অনেকে অনেক কথা বললেও মাও তাদের কথায় কান দেন নি। মাওয়ের মত হচ্ছে শেষ বিচারে যত ক্ষয়ক্ষতিই হয়ে থাকুক না কেন এই মৈত্রী স্থাপন ছিল যুক্তিযুক্ত—অনুবাদক)।

কমান্ডারদের সভায় তাহেরের বাহিনীর সাথে এগারো নং সেক্টরে যৌথভাবে যুদ্ধরত জিয়ার বাহিনীকে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ভারতের মেঘালয়ে প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করে জেড-ফোর্সকে সিলেটে স্থানান্তর করা হয়। এগারো নং সেক্টরে হঠাৎ করে শক্তি কমিয়ে আনার পরও তাহের চিলমারী আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যান। মাঝ সেপ্টেম্বরে জিয়ার সৈন্যদের যখন সরিয়ে নেয়া হচ্ছে তখনই আক্রমণের পরিকল্পনা শুরু হয়। অক্টোবরের প্রথম দিকে সদ্য প্রশিক্ষিতদের ওপর মূলত নির্ভর করেই চিলমারী আক্রমণকারী দল তাদের অবস্থান নিতে এগিয়ে যায়। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে বড় দেশি নৌকোর সাহায্যে এগারো তারিখে রাতের গভীরে বারো শো গেরিলা যোদ্ধা ব্রহ্মপুত্র পার হয়। আক্রমণের মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী একই সাথে গুড়গাছা, রাজভিটা, থানাঘাট আর চিলমারিস্থ কংক্রিট বাংকার শোভিত পাকিস্তানি বাহিনীর মূল সৈন্য ঘাঁটি সুরক্ষিত ওয়াপদা কমপ্লেক্সে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা ছিল। কয়েকটা ইউনিটকে চিলমারীর দক্ষিণে পাঠানো হয় সড়ক আর রেল-সেতু ধ্বংস করে দেয়ার জন্য। আক্রমণ শুরু হল। এই প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হয়। গেরিলা বাহিনী চব্বিশ ঘণ্টার জন্য শহর দখল করে। এই সময় তারা বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করে আর অনেককে বন্দী করে। পাকিস্তানি বাহিনীর খাদ্য গুদামগুলো সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেয়া হয়। রাজাকারদের কমান্ডার দুজন দালালকে ধরা হয়।

চিলমারীর সাফল্যের পর তাহেরের বাহিনী একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত কেন্দ্র কামালপুরের ওপর লক্ষ্য স্থির করে। তাহেরের মূল পরিকল্পনা ছিল কামালপুর, জামালপুর আর টাঙ্গাইলের ওপর ক্রমানুযায়ী আক্রমণের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়া যাতে করে এগারো নং সেক্টর তার চূড়ান্ত আঘাত ঢাকার ওপর হানতে পারে। চব্বিশে অক্টোবর

কামালপুরের অবরোধ শুরু হয়। এবারে রণকৌশল ছিল অন্য ধরনের—পাক বাহিনীর ঘাঁটিকে ঘেরাও করে মাঝে মাঝে ছোটখাট আক্রমণের মাধ্যমে দুর্বল করে ফেলা আর তাদের বাইরের সরবরাহ ও সাহায্য সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা।

এগারোতম সেক্টরে যুদ্ধরত জনৈক সাংবাদিকের সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত কামালপুর যুদ্ধের ওপর এক প্রতিবেদনে গেরিলা যুদ্ধ সম্বন্ধে তাহেরের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে—

> তাহের আমাদের কাছে শুধু একজন রাজনৈতিক দর্শন-যোদ্ধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। সেই সাথে ছিলেন একজন গেরিলা বিশেষজ্ঞ। গেরিলা যুদ্ধের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর গভীর ও বিস্তৃত ধারণা ছিল। মুক্তিবাহিনীর সভাতে তিনি সবসময়ে আমাদের এসব গেরিলা যোদ্ধাদের ইতিহাস শোনাতেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি আমাদেরকে ডেকে বললেন—'আপনারা দেশের মুক্তিযোদ্ধা, কাজেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্বন্ধে আপনাদের অবশ্যই ভাল ধারণা থাকা দরকার। ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে যুদ্ধের সাফল্যের পেছনে অস্ত্রই শেষ কথা নয়। যুদ্ধে, বিশেষ করে গেরিলা যুদ্ধের চালিকা শক্তি হচ্ছে সাহস ও সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা। আজ থেকে এই 'এ্যাটাক' শব্দটা একদম ভুলে যান। গেরিলা যোদ্ধার অভিধানে রেইড, এ্যামবুশ, আর ঘেরাও ছাড়া অন্য কোন শব্দের স্থান নেই। শত্রু আক্রমণ করলে পিছিয়ে যান আর শত্রু পিছিয়ে গেলে এগিয়ে যান। শত্রুপক্ষ যদি কখনো আপনাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙ্গে ফেলে তাহলে ছড়িয়ে পড়ুন ও তাকে ঘিরে থাকুন। আর শত্রু যদি আপনাকে ঘেরাও করে তাহলে তার দুর্বলতম স্থান খুঁজে বের করুন। তারপর তা ভেঙ্গে ফেলে আবারো শত্রুকে ঘেরাও করুন।' যুদ্ধের মাঠ বক্তৃতা দেয়ার সময় নয়। কিন্তু এই কথাগুলোর মধ্যেই তাহের গেরিলা যুদ্ধের পুরো ইতিহাস ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন তাঁর কণ্ঠে আবেগ ছিল না, তাঁর বক্তব্য ছিল যুক্তিযুক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধ। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেষ্টা করতো।[৩৩]

প্রায় তিন সপ্তাহের অবরোধ আর ছোটখাট সংঘর্ষের ফলে পাক বাহিনীর মনোবল যখন ভগ্নপ্রায়, তখনি নভেম্বরের তের তারিখে তাহের কামালপুরের ওপর শেষবার পূর্ণ আক্রমণ চালাবার আদেশ দিলেন। পরদিন আক্রমণে নেতৃত্ব দেয়াকালীন তাহেরের বাম পা উড়ে যায়। তাকে তখনি ঘাঁটির ফিল্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে কামালপুরে বাঙালি বীরযোদ্ধারা বারবার আক্রমণ চালিয়ে চলেছে, অবশেষে কামালপুরের পতন হলো। কামালপুর বাঙালিদের হাতে এল। তাহেরের বেঁচে ওঠা সম্পর্কে প্রথমে বেশ সন্দেহ থাকলেও পুনা সামরিক হাসপাতালে কয়েকবার অস্ত্রোপাচারের পর তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভিন্নমতাবলম্বী গ্রুপের বিরোধিতা সত্ত্বেও তেসরা ডিসেম্বর ভারতীয় সেনারা পূর্ণ শক্তি নিয়ে যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করল, দু'দেশের তথাকথিত 'যৌথ সামরিক সদর দপ্তর' যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রচলিত নিয়মে শেষবারের মতো মুখোমুখি হবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে জেনারেল ওসমানী আর তাঁর নেতৃত্বাধীন বাহিনীর পক্ষে তখন পুতলের মতো ভারতীয় হাই কমাণ্ডের নির্দেশ মানা ছাড়া করার আর কিছুই নেই। দেড় লাখেরও বেশি ভারতীয় সৈন্য ঢাকার দিকে রওয়ানা দেয়। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ভগ্ন মনোবলগ্রস্ত পাকিস্তানি বাহিনী ষোলই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করল।

সেদিন এগারোতম সেক্টরের সৈন্যরাই পাকবাহিনীর ঢাকা কমান্ড হেডকোয়াটারে সবার আগে পৌঁছায়। এগারোতম সেক্টরের শেষ আক্রমণের প্রতীক-উপহার হিসেবে তাহেরের বড়ো ভাই আবু ইউসুফ খান পাকিস্তানি সেনাদলের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার ইন-চীফ জেনারেল নিয়াজীর গাড়ির পতাকাটা খুলে নেন।

স্বাধীনতা

দৃশ্যত যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ মোটেই জনসমর্থনহীন ছিল না। পাকিস্তানি সেনাদের নির্দয় সন্ত্রাস থেকে মুক্তি পেয়ে সাধারণ মানুষ সত্যিকার অর্থেই খুশী হয়েছিল। ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে পৌঁছানোর পর পরই বাঙালিরা ভারতীয় সেনাদের বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানায়। পাকিস্তানি সেনাদের পরাজয় হয়েছে আর সেটাই ছিল বাঙালি-ভারতীয় উভয়ের জন্যই এক বিরাট পাওয়া—যদিও সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। আর এই যুদ্ধের মাধ্যমে ধর্মীয় উন্মাদনার চাইতেও বড়ো যে শক্তি উপমহাদেশকে বিভক্ত করে রেখেছিল তা কেটে গেছে বলেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল।

কিন্তু এরই মধ্যে যখন স্বাধীন বাংলাদেশের অসংখ্য চায়ের দোকান থেকে শুরু করে ঘরে ঘরে ড্রইংরুম পর্যন্ত শেখ মুজিব আর ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতি পাশাপাশি শোভা পাচ্ছে, তখন ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়ে যে বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হবে, তার সূত্রপাত ঘটতে লেগেছে। পাকিস্তানি বাহিনীর বিভিন্ন সরবরাহগুদাম দখল করার সাথে সাথেই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র গোলাবারুদ সরিয়ে ফেলতে ভারতীয় অধিনায়কেরা আদেশ দেন। প্রায় চার ডিভিশন সৈন্যের দখলকৃত অস্ত্র-শস্ত্র বাক্সবন্দী করে সীমান্ত দিয়ে ভারতে পাঠানো হয়। বাংলাদেশি অধিনায়কদের প্রতিবাদ উপেক্ষা করা হয়। অবশ্য নিচের দিকে ব্যাপারটা এত সহজ ছিল না। খুলনা জেলায় নবম সেক্টর কমান্ডার এক বাঙালি মেজর এম. এ. জলিলের সাথে তো ভারতীয়দের একেবারে সরাসরি সংঘর্ষই লেগে যায়। দখল করা অস্ত্রশস্ত্র ভারতে সরিয়ে নেয়ার বিরুদ্ধে জলিল প্রতিবাদ করেন। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের চাপে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার জলিলকে অবাধ্যতার অভিযোগে গ্রেফতার করে সামরিক আদালতে বিচারের নির্দেশ দেন। এক বছর পর বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে জেল থেকে জলিল মুক্তি পান ও জাসদের সভাপতি হন।

এই অস্ত্র পাচারকে কেন্দ্র করে যশোরসহ অন্যান্য জেলাতেও ভারতীয় সৈন্যের সঙ্গে মুক্তি বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। বাঙালিদের দাবি ছিল দখল করা এসব সম্পদের একমাত্র মালিক বাংলাদেশ—তা ভারতীয় সেনাদের যুদ্ধে জেতা লুণ্ঠন সামগ্রী নয়।

চট্টগ্রাম নৌঘাঁটি থেকে ভারতীয় সেনারা স্থানান্তরযোগ্য প্রত্যেকটা জিনিস হাতিয়ে নেয়—টাইপরাইটার আর সিলিংফ্যান থেকে শুরু করে অফিসার্স মেসের বাসন-কোসন পর্যন্ত ; শুধু অ্যাডমিরালের ডেস্কটাই তারা রেখে গিয়েছিল। কিছু সংখ্যক ভারতীয় অফিসারকে শেষ পর্যন্ত লুটপাটের দায়ে সামরিক আদালতে নেয়া হলেও সত্যি ঘটনা হচ্ছে এই যে দখল করা সমস্ত অস্ত্র সরিয়ে ফেলার আদেশটা উঁচু মহল থেকেই এসেছিল,

ভারতীয়রা সতর্কতার সাথে এই নীতি নির্ধারণ করেছিল। পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া উন্নত অস্ত্রগুলো বামপন্থী গেরিলাদের হাতে পড়ুক কিংবা এই অস্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের পূর্ব সীমানায় এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনী গড়ে উঠুক ভারত তা চায় নি। শুধু পাকিস্তানের পূর্ব প্রান্তকে নিষ্ক্রিয় করার জন্যই যে ভারত এ যুদ্ধে লড়েছিল বাঙালিদের নিকট তা পরিষ্কার হয়ে যায়। তারা শুধু ভারতের ব্যবহৃত পুরনো অস্ত্র পেতে পারে, তাও কেবল অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্বার্থে।

বাংলাদেশের প্রতি প্রথম অপমান এসেছিল আরও অনেক আগে। তাহেরের সামরিক সহযোগীরা জানান যে ব্যক্তিগত আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তাহের প্রায়ই এর উল্লেখ করতেন। পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ের প্রতীকী মুহূর্ত ছিল সেই সময়টায় যখন জেনারেল নিয়াজী এক নাটকীয় অনুষ্ঠানে আত্মসমর্পণের ঘোষণায় স্বাক্ষর দেন। কিন্তু নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেন ভারতীয় কমান্ডার জেনারেল অরোরা সিং-এর কাছে। সেখানে কোন বাঙালি অফিসারের উপস্থিতি ছিল না। তাহের প্রায়ই বলতেন যে বাঙালি জাতিকে এই গৌরবজনক মুহূর্ত থেকে বঞ্চিত করে ওসমানী, জিয়াসহ অন্যান্য অফিসারেরা সমস্ত বাঙালি জাতির মাথা অবনত করিয়েছেন। যুদ্ধ শেষের এক মাস আগে তাহের কামালপুরের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন ; ষোলই ডিসেম্বর ঢাকায় আগত সেনাদের মধ্যে তাঁর অধীন এগারো নং সেক্টরের সৈন্যরা ছিল অন্যতম। পরে তাহের দাবি করতেন যে কামালপুরের যুদ্ধে এক পা না হারিয়ে ষোলই ডিসেম্বর তিনি ঢাকায় উপস্থিত থাকলে নিয়াজীকে ভারতীয়ের বদলে একজন বাঙালির কাছেই আত্মসমর্পণ করতে হতো।

আহত পায়ের ওপর কয়েকটা অস্ত্রোপাচারেরর পর ১৯৭২-এর এপ্রিলে তাহের বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তাঁকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল নিয়োগ করা হয়। তাহের এই সময়ে শফিউল্লাহ্, আর মীর শওকত আলীর মতো অনেক উঁচু, পদমর্যাদার অফিসারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে অবৈধ সম্পত্তির মালিক হবার অভিযোগ এনে তদন্ত শুরু করেন। সেনাবাহিনীর বাইরেও এসময় আওয়ামী লীগের ঊর্ধ্বতন নেতারা পালিয়ে যাওয়া পশ্চিম পাকিস্তানিদের আর অভিযুক্ত দালালদের 'পরিত্যক্ত সম্পত্তি' সঞ্চয় করছিলেন। সেনাবাহিনীর কিছু অংশের ভেতরও এই লুট করার প্রবণতা ঢুকে গিয়েছিল ; তাহের তার নেতৃত্বাধীন সেনাদের মধ্যে এই প্রবণতা বন্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। পরে ট্রাইবুন্যালে তিনি বলেন— 'আমার পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে কোন অফিসারের অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পত্তি অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে।'

কয়েক মাসের মধ্যেই তাহের কুমিল্লায় ৪৪তম বিগ্রেডের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাহেরের বন্ধু জিয়াউদ্দিন—যার সাথে তিনি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছিলেন—দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা ব্রিগেডের দায়িত্ব পান। তাহের আর জিয়াউদ্দিন দু'জনেই তাঁদের নিজ নিজ ব্রিগেডে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। তাহের তাঁর অধীনস্থ সব অফিসারকে যুদ্ধের সময় অথবা পরে অবৈধভাবে সংগৃহীত যে কোন সম্পত্তি সমর্পণ করার আদেশ দেন। ঢাকা ব্রিগেডের সিগন্যাল বাহিনীর অফিসার আর সিপাহীদের সামনে জিয়াউদ্দিন এক নাটকীয় বহ্ন্যুৎ সব পালন করেন। একদিকে টেলিভিশন সেট, রেফ্রিজারেটর, রেডিও আগুনে পুড়ে যাচ্ছে আর সামনে পুরো ব্রিগেড

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। তাহের ট্রাইবুন্যালে জবানবন্দী দিতে গিয়ে বলেন— 'আমার হাতে এমন কিছু অফিসার ছিল যাদের ছিল পূর্ণ নীতিবোধ। এটাকেই আমি নেতৃত্বের স্বরূপ মনে করতাম। আমি সবসময়ই মানুষের ভালো দিকটা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছি, কোন মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নেয়াকে আমি ঘৃণা করতাম ও এড়িয়ে চলতাম।'

স্বাধীনতা উত্তরকালে যুদ্ধকৌশল নিয়ে আগের মতবিরোধগুলো আবার নতুন রূপে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। পুরনো ধ্যান-ধারণা আর নীতিতে সাম্রাজ্যবাদী ছাঁচে একটা প্রচলিত সেনাবাহিনী গড়ে তুলবার চেষ্টা শুরু করা হলে নেতৃত্বের পর্যায়ে তাহের আর জিয়াউদ্দিন এরকম কোন উপায়কে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা দাবি করেন যে বাংলাদেশের মতো একটা গরিব আর পশ্চাদপদ দেশে সেনাবাহিনীর জন্য প্রচলিত রীতি গ্রহণ করলে মাত্র দু'টো উপায় খোলা থাকে। সব সময় যা হয়ে আসছে এক্ষেত্রেও যদি তাই হয় অর্থাৎ সেনাবাহিনী যদি শুধু দেশের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে তাহলে একটা গরিব দেশের জন্য সেনা বাহিনী শুধু একটা বিরাট অর্থনৈতিক বোঝা হয়েই থাকবে আর বিনিয়োগ ও প্রসারিত উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত সম্পদ শোষণ করবে। কিংবা এধরনের এক সেনাবাহিনী বিদেশি সামরিক সাহায্যপুষ্ট হয়ে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অংশ হয়ে পড়বে, জাতীয় স্বাধীনতার আপসকারী শক্তিতে পরিণত হবে।

বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক নিরাপত্তা চুক্তির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দীর্ঘ বিশ বছরের সংস্পর্শে থাকার পর পাক-বাহিনী এক বিরাট আকার নিয়েছিল। আটান্ন সালে আমেরিকান সাহায্যজাতপাকিস্তানের এই খোদার খাসী নবীন এক রাষ্ট্রের সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্ছেদ করে দেশে সামরিক একনায়কত্বের জোয়াল চাপিয়ে দেয়। প্রতিবছর এই সেনাবাহিনী দেশের রাজস্বের প্রায় ষাট ভাগ উদরস্থ করতো। অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত শোষণ করার মাধ্যমে আমেরিকানদের হেঁয়ালি মার্কা সামরিক জোটের একটা খণ্ডে পরিণত হয়ে এদের প্রবৃদ্ধির খরচ মিটতো। সেন্টো ও সিয়াটোতে পাকিস্তানি আনুগত্যের বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক সাহায্যের আদলে কোটি কোটি ডলার সাহায্য দিতে প্রস্তুত ছিল।

বাংলাদেশে সেই একই ধরনের পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হতে পারে তাহের আর জিয়াউদ্দিন সেই চেষ্টাই করতে চেয়েছিলেন। এরা এক আত্মনির্ভরশীল নীতির প্রস্তাব করেন ' সেনারা শুধু বন্দুকই বহন করবে না, শ্রমিক-কৃষকের মতো কাজও করবে। প্রত্যেক ব্রিগেড নিজেদের খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করবে আর কাছের গ্রামগুলোতে উৎপাদনশীল কাজ করবে। ১৯৭২-এর গ্রীষ্মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ব্রিগেড কমান্ডারদের এক বৈঠকে বিভিন্ন ইউনিট তাদের ব্রিগেড প্রতীক নির্ধারণের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তাব পেশ করে। এই বৈঠকে তাহেরকে কুমিল্লা বিগ্রেডের প্রতীক কি হবে জিজ্ঞেস করাতে তিনি একটা লাঙ্গলের নকশা টেবিলের সামনে এগিয়ে দেন। এর পর থেকেই কুমিল্লা ব্রিগেডের সদস্যদেরকে 'লাঙ্গল সৈনিক' বলে ডাকা হতো। কুমিল্লায় এই সেনারা অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য নিবিড় চাষাবাদে নেমে পড়ে। হাজার হাজার আনারসের আবাদ শুরু হয়। প্রত্যেক দিন অফিসার থেকে শুরু করে সবাইকে নিজ হাতে কাজ করতে হতো।

পতিত জমি খোঁজার জন্য গ্রামে গ্রামে বিশেষ কর্মী বাহিনী পাঠানো হতো। এসব জমি চাষে গ্রামবাসীদেরকে সৈন্যরা সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। সেনাবাহিনীর প্রকৌশলীরা এমনকি কৃষি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক পরিকল্পনা করেন। তাহের এদেরকে বলেন,— 'উৎপাদনশীল বাহিনী'। তিন বছর পর সাতই নভেম্বরে বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী সেনাদের ভাষায় 'জনগণের সেনাবাহিনী', নিপীড়িত জনতার বাহিনী'র শ্লোগানে চাপা পড়ে যায় এই অভিধা।

তাহের আর জিয়াউদ্দিনের শুরু করা এই নতুন ধরনের সেনা সংগঠন বেশিদিন টিকল না। বাহাত্তরে গরমের শেষের দিকে জিয়াউদ্দিন দেশের রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনা সম্বন্ধে পূর্ণভাবে মোহমুক্ত হন। বিরোধী পক্ষের সাপ্তাহিক হলিডে-তে স্বনামে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি তার মতামত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন—

> এদেশের মানুষের জন্য স্বাধীনতা এক মস্ত যন্ত্রণায় পরিণত হয়েছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখুন কত উদ্দেশ্যবিহীন, নির্জীব, প্রাণহীন ব্যক্তিত্ব জীবনের প্রবাহে বেয়ে চলেছে। সাধারণত একটা স্বাধীনতা যুদ্ধের পর নতুন উৎসাহ-উদ্দীনার জোয়ারে দেশ একেবারে শূন্য অবস্থা থেকে নিজেকে গড়ে তোলে। বাংলাদেশে হয়েছে পুরো উল্টোটা। পুরো বাংলাদেশ আজ ভিক্ষে করে ঘুরছে নয় দুঃখের গান গেয়ে চলেছে অথবা না বুঝে চিৎকার করে চলেছে। দারিদ্র্যের জোয়ারে এরা নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। এই জাতি এক অতল গভীরে ডুবে যাওয়ার সম্মুখীন।

জিয়াউদ্দিন আরও দাবি করেন যে ভারতের সাথে এক 'গোপন চুক্তি' সম্পাদন করে জাতীয় সংগ্রামের সাথে 'বিশ্বাসঘাতকতা' করা হয়েছে। তিনি এই চুক্তির শর্তগুলো পূর্ণ প্রকাশের দাবি জানান। শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য করে তিনি তার প্রবন্ধ শেষ করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে পাকিস্তনি কারাগারে মুজিবের নয় মাস কাটাবার কথা উল্লেখ করে জিয়াউদ্দিন লেখেন— 'আমরা তাঁকে ছাড়াই যুদ্ধ করে জয় ছিনিয়ে এনেছি, দরকার হলে আবারো আমরা যুদ্ধ করব।[৩৪]

ঢাকা বিগ্রেডের একজন কমান্ডারের পক্ষে ব্যাপারটা মোটেও সামরিক আনুগত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন নয়। মুজিব বাইরে থাকাকালীন এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ফিরে আসার পর জিয়াউদ্দিনকে ডেকে জানানো হয় যে একটি আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনার বিনিময়ে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হবে না। জিয়াউদ্দিন ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করেন। '৭২-এর শেষের দিকে তাঁকে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়। সেই সাথে তাহেরসহ অন্যান্য যারা জিয়াউদ্দিনকে সমর্থন দিয়েছিলেন তাদেরকেও সক্রিয় কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

'৭২-'৭৩-এ সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোর ভেতর বিপ্লবী লোকজন যারা বিদেশি সাহায্যের বিরোধিতা করেন ও একটি কৃচ্ছ্রতামূলক ও স্বাবলম্বী কর্মসূচির পক্ষে ছিলেন তাদেরকে অপসারণ করা হয়। জিয়াউদ্দিনের বরখাস্তের কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর সতীর্থরা নিজেদেরকে এক অসুবিধাজনক অবস্থানে খুঁজে পেলেন। এই

সময়ের সংকট পরিষ্কার হয়ে ওঠে 'দ্য বিজনেস রিভিউ' সাপ্তাহিকে লেখা বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের ড. আনিসুর রহমানের এক প্রবন্ধে—

> স্বাধীনতার পর পরই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা দিয়েছিলেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শের প্রতি বিদ্বেষী কোন শক্তির কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য তারা গ্রহণ করবেন না— বিনিময়ে যে কোন মূল্য দিতেও তাঁরা প্রস্তুত। এটা ছিল এক দারুণ সাহসী সিদ্ধান্ত, এটা মানা হলে এদেশে বিদেশি সাহায্যের সবচেয়ে বড়ো সূত্র মার্কিনী সাহায্য সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেত.... এতে জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হত... এরকম একটা প্রভূত সম্মানজনক সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে মানা হলে জাতি হিসেবে বাংলাদেশের সম্মান অনেক বেড়ে যেত.... এছাড়াও বিদেশি সাহায্যের প্রতি এই রকম বৈপ্লবিক মনোভাব নেবে যে সরকার তাকে অভ্যন্তরীণভাবে একই ধরনের সাহসী বণ্টন পরিকল্পনা নিতে হত যাতে স্বাধীনতা উত্তর কালের দুর্দশাগুলো সবাই মিলে ভাগাভাগি করে সহ্য করা যায়। এ ধরনের এক বণ্টন ব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়া খাঁটি দেশপ্রেমিকসহ নাগরিক সমিতি ও শৃঙ্খলা রক্ষা সমিতির দায়িত্ব হত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় এতে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন আসতো আর সেই সাথে আসতো সমস্ত দেশের সামাজিক পরিবর্তন। কিন্তু এর সবই কল্পনার কথা। সরকারের অন্তর্গত প্রগতিশীল অংশ নীতি নির্ধারণে বড়ো ভূমিকা নিতে প্রথমদিকে কিছুটা সফল হন। এর প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে বেতন সীমা এক হাজার টাকায় নির্ধারণ। উচ্চবিত্তরা এতে দারুণভাবে বিচলিত হন। ডানপন্থীরা খুব তাড়াতাড়িই নিজেদের সংগঠিত করেন আর প্রতিবিপ্লব-ও ঘটে যায় তাড়াতাড়ি ও নিশ্চিতভাবে। ডানপক্ষের প্রবল চাপে কিছুদিনের মধ্যেই সাহায্য নীতি বদলানো হয়। এখন থেকে পুরোনো কথা ভুলে যেয়ে বন্ধুর হাত নিয়ে এগিয়ে আসলে যে কোন দেশের জন্যই বাংলাদেশের থাকবে অবারিত দ্বার। বেতনের সীমাও বাড়িয়ে দু হাজার টাকা করা হয় আবার সেই সাথে একটা গাড়িও যোগ করা হয় যা সম্পূর্ণ সাধারণের টাকায় রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। কৃচ্ছ্রতা আর সাম্যবাদ অন্যান্য ঘোষণাগুলোও তাড়াতাড়ি করে ফাঁকাবুলিতে পরিণত হয়। এর মধ্যে দেশটা চরম পরমুখাপেক্ষী হয়ে উঠল, বিশেষ করে যে দেশটা আলাদা একটা জাতি হিসেবে বাংলাদেশের ধ্বংস কামনা করেছিল তার ওপর হয়ে উঠল পূর্ণ নির্ভরশীল।....[৩৫]

এই বিবরণী থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আওয়ামী লীগের পতন স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যেই শুরু হয়েছিল। পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পার্টি যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নৈতিকতার জোয়ার সৃষ্টি করেছিল, দুর্নীতির জোয়ারে তা বঙ্গোপসাগরে ভেসে গেল। এই দুর্নীতি মূলত সৃষ্টি হয় স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই বিদেশি সাহায্যদাতা গোষ্ঠী থেকে পাওয়া দুই বিলিয়ন ডলার রিলিফ সামগ্রী, সাহায্য

চুক্তি আর আন্তর্জাতিক ব্যবসা থেকে। এ ধরনের ঘুষ আর দুর্নীতি যদিও এদেশে নতুন কিছু নয় তবুও এতে লক্ষ করবার মতো নতুন একটা ব্যাপ্তি রয়েছে—এতে জড়িত রয়েছে আশ্চর্য রকমের বড়ো টাকার অংক। আড়াই বছরের মধ্যেই এই দেশ যে পরিমাণ সাহায্য পায় পূর্ব পাকিস্তানের তেইশ বছরেও তা এদেশে আসে নি। স্বাধীনতা উত্তর-কালে কালো টাকা আর অবৈধ ব্যবসার গল্প ছিল নতুন লোকগাঁথার সবচেয়ে অন্ধকার দিক।

স্বাধীনতার আগে পূর্ব বাংলা ছিল পাকিস্তানের সব চাইতে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত—একটি প্রত্যন্ত প্রদেশ। ব্যাংকক, রেঙ্গুন বা কোলকাতা হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার যাত্রীরা সবসময় ঢাকাকে টপকে যেতেন। ঢাকায় খুব কম আন্তর্জাতিক ফ্লাইট-ই ছিল। আর পয়ষট্টির পর কোলকাতা হয়ে কোন ফ্লাইটই ছিল না। গৃহযুদ্ধ আর স্বাধীনতার ফলে বাংলাদেশ পৃথিবীর এক কোণার এক পশ্চাপদ যাত্রী থেকে হঠাৎ করে একটা ক্রমবর্ধমান সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পরিণত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় আর সেনাবাহিনী থেকে অপসারিত চরমপন্থী সমালোচকরা বার বার দাবি করতে থাকেন যে প্রধানত বিদেশি সাহায্যই দেশের রাজনীতিকে অপরাধ ক্ষেত্রে পরিণত করেছে আর গেরিলা যুদ্ধের কাল থেকে গড়ে ওঠা আদর্শকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। পরিকল্পনা কমিশন ত্যাগ করার প্রাক্কালে আনিসুর রহমান লেখেন—

> এই হবে ছিল ভয়। বাংলাদেশ যে বিপ্লবের ফলে স্বাধীনতা লাভ করে তা ছিল এক জাতীয় বুর্জোয়া বিপ্লব। আদর্শিক লক্ষ্য চরিতার্থ করার জন্য স্ব-আরোপিত কৃচ্ছ্রতা সাধনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শ্রেণী চরিত্র এই নেতৃত্বের মধ্যে ছিল অনুপস্থিত।[৩৬]

নতুন শাসকশ্রেণীর সদস্যরা যে আদিম ধরনের সঞ্চয়ী ব্যবসায় নেমে ছিলেন তার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে—ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফা। মোস্তফা রিলিফ সামগ্রী নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার কালোবাজারী ব্যবসা শুরু করেন যা ছিল পার্টির খরচ মেটাবার প্রধান অর্থনৈতিক মাধ্যম। এক পর্যায়ে ইউনাইটেড নেশন্স রিলিফ অপারেশনস্ ইন বাংলাদেশ (ইউ.এন. আর. ও. বি.)-এর পরিচালক মন্তব্য করেন, পরিস্থিতি এখন এতটা খারাপ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে শিশু খাদ্যের মধ্যে প্রতি সাত টিনে এক টিন আর প্রতি তেরটা কম্বলের মধ্যে একটা কম্বল আসল গরিবের হাতে পৌছে। ব্রিটিশ শ্রমিক দলীয় এম.পি. জন স্টোনহাউজ যিনি অবৈধ ব্যবসার দায়ে শেষে জেল খাটতে বাধ্য হন, তিনি ছাড়াও এই দুর্দশার রাজত্বে অনেক বিদেশি ভাগ্য-সৈনিক এসে জোটে। জাতিসংঘ পরিবহন বিভাগ একসময় এদেশের জন্য লাখ লাখ ডলার মূল্যের রিলিফ সামগ্রী আমদানি ও পরিবহনের কাজে নিয়োজিত ছিল। এই বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত জনৈক ইউরোপীয় কর্মকর্তা নিজেই এত টাকা জমান যে বাংলাদেশে বাঁচানো টাকা দিয়ে তিনি সার্দিনিয়ায় একটা গোটা হোটেল কিনে ফেলেন বলে খোঁজ পাওয়া গিয়েছে।[৩৭] ১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক ঋণদান সংস্থা বিশ্বব্যাংক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সেচ প্রকল্পে

জেনে শুনে চল্লিশ লক্ষ ডলার ঘুষ দিয়েছে—একথা প্রকাশ পেলে ব্যাংক এক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে।[৩৮]

অবস্থার এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৭০ সাল থেকে আওয়ামী লীগের প্রতি অনুগত তার উজ্জ্বলতম সমর্থকরা পরিণত হয় তার সবচাইতে সক্রিয় বিরোধী দলে। চুয়াত্তরের শেষের দিকে সরকার প্রকাশ্যে স্বীকার করেন যে তিন হাজারেরও বেশি আওয়ামী লীগ কর্মকর্তা দলীয় অভ্যন্তরীণ কলহ বা গুপ্ত সংগঠনের কার্যকলাপে মারা গিয়েছে। দেশের বিভিন্ন অংশে এই সময়ে প্রকাশ্যঅভ্যুত্থানের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। সশস্ত্র গ্রুপগুলোর মধ্যে সিরাজ সিকদারের পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি ছিল সবচেয়ে সক্রিয়। স্বাধীনতার আগে এই তরুণ কম্যুনিস্টদের তত্ত্ব ছিল এই যে পাকিস্তানে আসল অসঙ্গতি হচ্ছে পশ্চিমের শাসকগোষ্ঠী আর পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত মানুষের মধ্যে। এরা বলত যে পূর্ব পাকিস্তানের বিপ্লবকে জাতীয় স্বাধীনতার বিপ্লবের আদলে সংগঠিত হতে হবে ; এটা অস্বীকার করে অন্যান্য পিকিংপন্থী কম্যুনিস্টরা পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক অসংগতকে অস্বীকার করছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নেয়ার পর সর্বহারা পার্টি তাদের গেরিলা উপদলগুলো পুনঃসংগঠিত করে। স্বাধীনতার পরে এরা মুজিব সরকারকে তাদের প্রধান শত্রু বলে চিহ্নিত করে আর আস্তে আস্তে দেশের বিভিন্ন জায়গায় 'আক্রমণাত্মক অভিযান' চালাতে শুরু করে।

'৭৪-এর বসন্তে সর্বহারা পার্টি আর সাধারণভাবে মাকর্সীয় গুপ্ত সংগঠনগুলো একজন ব্যতিক্রমী সদস্য সংগ্রহ করে। সে বছর মে মাসে ঢাকার প্রধান সেনানিবাস সহ শহরের অন্যান্য অনেক জায়গায় প্রচারিত প্রচারপত্রে দাবি করা হয় যে ঢাকা ব্রিগেডের প্রাক্তন কমান্ডার লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিন সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি লাভের পর তার উচ্চবিত্ত শিক্ষাব্যবস্থা যে সমাজ থেকে জিয়াকে সরিয়ে রেখেছিল, সেই নিম্নবিত্ত সমাজকে তিনি একটু একটু করে জানতে থাকেন। যুদ্ধের আগে তিনি বাংলার থেকে উর্দু আর ইংরেজি ভাষায়ই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। এবারে তিনি নতুন দিগন্তে দৃষ্টি দিলেন। প্রায় ছয় মাস ধরে রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করে তিনি গ্রামাঞ্চলে যান ও নিজেকে শ্রেণীচ্যুত করার ইচ্ছায় তার পুরনো অভ্যাসগুলো বদলানোর চেষ্টা করেন। প্রায়ই ঢাকা এলে জিয়াউদ্দিন ঢাকার বাইরে নারায়ণগঞ্জে তাহেরের পরিবারের সাথে থাকতেন। সেনাবাহিনীর বাইরে পাওয়া নতুন বন্ধুদের কাছ থেকে বই ধার করে তিনি মার্কসীয় ধারণা আত্মস্থ করার চেষ্টা করতে থাকেন। '৭৪-এর ফেব্রুয়ারিতে জিয়াউদ্দিনের নিকটতম বন্ধুরা হঠাৎ করেই তার সংস্পর্শ হারিয়ে ফেলেন তিনি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। মাসের শেষে বন্ধুরা ঢাকা ব্রিগেডের এই প্রাক্তন কমান্ডারের কাছ থেকে এক লাইনের একটা চিঠি পান, এতে লেখা ছিল — 'আমি বৃত্ত অতিক্রম করেছি।' মে পর্যন্ত আর কিছুই জানা যায় নি, এই সময়ে প্রচারপত্রটি প্রচারিত হয়।

একই সময় পাশাপাশি আওয়ামী লীগের মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল। প্রায় এক দশক ধরে দলের ভেতর যে দু'টো ধারা পাশাপাশি চলে আসছিল বাহাত্তরে তা

অবশেষে ভেঙ্গে পড়তে থাকে। দশ বছর আগে '৬২-তে একদল তরুণ যুবক এই দলে যোগদানে করে। এদের সচেতন লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগের মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন শ্রেণীকে একত্র করে এদেশে সমাজতন্ত্রকে এগিয়ে নেয়া। এরা ভালভাবেই জানত ও বিশ্বাস করত একদিন তাদেরকে এই দল থেকে বের হয়ে স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। '৭২-এর ১০ই জানুয়ারি মুজিব পাকিস্তানি জেল থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশে ফিরে এলেন আর এ দিনই এরা নিজস্ব মুখপত্র গণকণ্ঠ প্রকাশ করে। পরবর্তী দু বছরের মধ্যে এর সম্পাদক গ্রেফতার আর অফিস তছনছ হবার আগে এই পত্রিকার দৈনিক প্রচার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রধানতম বাংলা দৈনিক ইত্তেফাক-এর ঠিক পরেই।

বিপুল জনসম্বর্ধনার মধ্যে মুজিব ঢাকায় ফিরে এলেন। ঢাকায় এলে ছাত্র লীগের যে নেতারা একবছর আগে মুজিবকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে চাপ দিয়েছিলেন তাঁরা সাথে সাথেই মুজিবের সাথে দেখা করেন। এঁরা জাতীয়করণ, সমবায় ভিত্তিক কৃষি সংস্কার আর স্বাধীনতা-উত্তর পুনর্গঠনের ব্যাপারে নিজস্ব প্রস্তাব মুজিবকে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। এঁরা সমাজতন্ত্রের উত্তরণের জন্য আওয়ামী লীগকে একটা সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ জানালেন, এ ছাড়াও এঁরা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সব দলকে নিয়ে একটা জাতীয় একতাভিত্তিক সরকার গঠনের প্রস্তাব করেন। মুজিব সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বরং মুজিব তার সদ্যপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি আর অভ্যন্তরীণ জনপ্রিয়তায় বলীয়ান হয়ে নিজস্ব আদর্শবাদ প্রস্তাব করলেন— 'মুজিববাদের চার স্তম্ভ জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র আর গণতন্ত্র।' সত্তরের জঙ্গী ছাত্র সমর্থকদের কাছে মুজিবের এই নতুন নীতি ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের আদর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়ার সামিল ; বিদেশি সাহায্যে ভর্তি শূন্য কলসি। সময় হলো তাদের সরে আসার।

'৭২-এর এপ্রিলে মুজিবের প্রত্যাবর্তনের চার মাস পর তার জনপ্রিয়তা যখন তুঙ্গে এই বামপন্থী গ্রুপ ছাত্রলীগকে ভেঙ্গে দু'ভাগ করল। পরের মাসে এরা জাতীয় কৃষক লীগকে বিভক্ত করল। জুন মাসে শ্রমিক লীগকে ভেঙ্গে দিয়ে এরা নিজেদের সমান্তরাল সংগঠন তৈরি করল। একুশে অক্টোবর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের একটি আহ্বায়ক কমিঠি গঠন করা হয়। (আসলে হবে একত্রিশে অক্টোবর—অনুবাদক) এরা নিজেদের 'সমাজতান্ত্রিক গণসংগঠন' বলে অভিহিত করে। এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বিধানকৃষ্ণ সেন, শাহ্‌জাহান সিরাজ, নূর আলম জিকু, আবদুর রব, সুলতান উদ্দিন আহ্‌মেদ আর মেজর এম. এ. জলিল। ডিসেম্বরে জাসদের আহ্বায়ককমিটি বিস্তৃত হয়ে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটিতে পরিণত হয়। এই কমিটির অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু গোপন সদস্যের একজন ছিলেন কর্নেল তাহের। তিয়াত্তরের মে মাসে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটিকে আরো বাড়িয়ে জাসদের জাতীয় কমিটিতে পরিণত করা হয়।

চুয়াত্তরের জুনে জাতীয় কমিটির একটি বর্ধিত সভার পর একটা ক্ষুদ্র সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। ঐদিন বাষট্টি থেকে পরিচিত 'বাংলাদেশ বিপ্লবী কেন্দ্র' নামে পরিচিত বামপন্থী গ্রুপ নিজেদেরকে বিলুপ্ত করে জাসদের সমন্বয় কমিটির সাথে একীভূত হয়। '৭৪-এর জুনে জাতীয় একটা বিপ্লবী পার্টির জন্য খসড়া গঠনতন্ত্র ও খসড়া থিসিস প্রস্তাব

করা হয়। এই খসড়া প্রস্তাবকারিদের মধ্যে ছিলেন সিরাজুল আলম খান, হাসানুল হক ইনু ও হারুনুর রশীদ। তখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোন দল গঠন করা হয় নি। জাতীয় কমিটির মতামত ছিল এই যে তাঁরা একটি বিপ্লবী দল গঠনের প্রক্রিয়ায় রয়েছেন। একটা জাতীয় কমিটি বসার আগে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন দল গঠন করা সম্ভব নয়। জাতীয় কমিটি মনে করল বাংলাদেশের আন্দোলনের পর্যায়ে এখনো সে অবস্থা সৃষ্টি হয় নি। অবশ্য তাদের বিশ্বাস যে তা হতে দেরি নেই। কর্মীদের আদেশ দেয়া হল জেলা পর্যায় থেকে শুরু করে নিচের স্তরগুলোতে কেন্দ্র গঠন করতে যাতে করে খসড়া থিসিস সম্বন্ধে আলোচনা হয় ও মার্কসীয়-লেনিনীয় মূলনীতির বিস্তার আরো বড়ো পরিধিতে ঘটে। '৭৪-এর এপ্রিলে জাসদ সমর্থিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে জাতীয় কমিটি দলের তত্ত্বীয় পত্রিকা 'সাম্যবাদ' প্রকাশনা শুরু করে। বছরের শেষ দিকে লড়াই-এর সংস্করণ শুরু হয়। জুলাইতে জাসদ আনুষ্ঠানিকভাবে সশস্ত্র শাখা 'বিপ্লবী গণবাহিনী' গঠন করে—যার অধিনায়ক ছিলেন কর্নেল আবু তাহের। যদিও তাঁর নাম গোপন রাখা হয়।

একদিকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশৃঙ্খলার চরম থেকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে, সাথে সাথে দেশের স্থিতিশীলতাও দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছে। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের পর ১৯৭৩-'৭৪ সালটা ছিল আন্তর্জাতিক পণ্য বাজারের জন্য এক চরম সংকটের কাল। বিশ্ববাজারে তেল আর খাদ্যশস্যের দাম আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে। এই দু'য়ে মিলে এমন এক চরম সংকটের সৃষ্টি করে যার ফলে '৪৩-এর পর আবার এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয় বাংলাদেশ। অবশ্য এই দুর্ভিক্ষের মনুষ্যসৃষ্ট পরিধির জন্য দায়ী ছিল আসন্নপরিস্থিতির প্রতি আওয়ামী লীগ প্রশাসনের লোভী, অদক্ষ ও অদূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি। তিনটা রিপোর্ট থেকে জাতীয় প্রশাসনিক পর্যায়ে বিরাজমান অবস্থা ও গ্রামাঞ্চলে এর প্রভাব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে

"**আগস্ট, ১৯৭৪** : প্রায় শতকরা চল্লিশ ভাগ মুদ্রাস্ফীতির ফলে জনগণের মূল আয় অনেক কমে গেছে, মানুষের জীবনে নেমে এসেছে ব্যাপক দুঃখকষ্ট। এদের অনেকেই একেবারে প্রান্তসীমানায় জীবনধারণ করতো—অনেক আগেই সেই সীমানার নিচে তারা হারিয়ে গেছে। মে মাসে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে কারখানার শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানসূচক সরকারি হিসেবে দাঁড়ায় ৩২৫.৪৫ (১৯৬৯—৭০ = ১০০ ধরে)। এঁদের বস্ত্রমূল্যের মানসূচক ৫১৪। চট্টগ্রামসহ অন্যান্য শহরে অবস্থা আরো অনেক খারাপ।

মুদ্রাস্ফীতিকেই যদি দাম বাড়ার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তাহলে তো যুক্তি হিসেবে চোরাচালানী-মজুতদারদেরকে শুধু নয়, বরং সেই সাথে অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে জড়িত কর্তাব্যক্তিদেরও ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করানো উচিত।

এদেশে মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণ যে '৭০-এর উৎপাদন পর্যায়ে ফিরে আসার আগেই দেশে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে মুদ্রা সরবরাহ তা বুঝতে মিল্টন ফ্রিডম্যানের সাহায্যের দরকার হয় না। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যানে উল্লিখিত হয়েছে '৭১-এর ডিসেম্বরে দেশে মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৩৮৮ কোটি টাকা। '৭৪-এর

জুনের শেষে পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবানুযায়ী তার পরিমাণ ৮৪০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আড়াই বছরে শতকরা ১১৬ ভাগ বৃদ্ধি! ১৯৬৯—'৭০-এর হিসাবে এই পরিমাণ প্রায় ২০০%।

সরকারের অপরিকল্পিত অর্থনৈতিক নীতির কারণেই বিপুল পরিমাণ বাজেট ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম দেড় বছরে ক্রমবর্ধমান মুদ্রা সরবরাহের পাশাপাশি বিপুল-পরিমাণে রিলিফ সামগ্রী আসে, তাতে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির প্রচণ্ড চাপ রুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু রিলিফকে অবশ্যই উৎপাদনের প্রকৃত যোগ বলা যায় না, আর উৎপাদন কখনোই মুদ্রা সরবরাহের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠতে পারে নি, তাই রিলিফ সামগ্রীর পরিমাণ কমে আসার সাথে সাথেই মুদ্রাস্ফীতির পাগলা-ঘোড়া ছুটতে লাগল...

দেশের ৬৫,০০০ গ্রামের (বর্তমানে ৮৭,৫১৭টি গ্রাম) ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য আর বেকারত্ব স্বাধীনতার পর খারাপ থেকে খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্যে সাড়ে চার কোটি লোক আজ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। প্রতিদিন দু হাজার ক্যালোরি গ্রহণ করার সামর্থ্য এদের নেই। এরা মূলত ভূমিহীন কৃষক আর ছোট বর্গাচাষী। সত্তরে ছয় কোটি ষাট লক্ষ গ্রামীণ বাসিন্দাদের মধ্যে প্রায় দুই কোটি ষাট লক্ষ বা ৪০ ভাগ লোক ছিল ভূমিহীন। পূর্ব পাকিস্তানের দিনগুলোতে এদের আয় কিছুটা বাড়লেও প্রকৃত আয় এখন আগের থেকে অনেক কম। '৬৬ সালের আয়কে সূচক ধরে হিসাব করলে দেখা যায় '৪৯ সালে এদের বাৎসরিক আয় ছিল ৬৯৭ টাকা, '৬১-তে ৭৩৩ টাকা, '৬৪-তে ৮৫২ টাকা আর '৬৯-এ এসে ৮৩৪ টাকা। '৭৩-এ এসে তা দাঁড়ায় ৫৮০ টাকায়। সোজা কথায় ঊনপঞ্চাশের তুলনায় তিয়াত্তরের একজন ক্ষেতমজুর শতকরা সতের ভাগ কম আয় করছিল। (এ স্টেট অব সিজ, **ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ**, ৩০ শে আগস্ট, ১৯৭৪)।

অক্টোবর ১৯৭৪ : অক্টোবরের প্রথম তিন দিনে ঢাকা শহরে সরকারিভাবে উনিশটি মৃত্যুর ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে, আসল সংখ্যা এর চেয়ে অনেক অনেক বেশি বলে সবার বিশ্বাস। গ্রামাঞ্চলের দুর্দশার খবর প্রতিনিয়ত জেলাসমূহ থেকে আসছে। ফরিদপুরে কর্মরত চিকিৎসকরা খবর দিয়েছেন যে গ্রামবাসীরা টিকা নিতে অস্বীকার করছে—অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর চেয়ে অসুখে তাড়াতাড়ি মৃত্যুই তাদের কাম্য। সৈয়দপুরে বিহারী ক্যাম্প থেকে বেশ কয়েকটা আত্মহত্যার খবর পাওয়া গিয়েছে, এক বছরের বেশি সময় ধরে অনাহার ছিল এদের নিত্যসঙ্গী...।

কয়েক সপ্তাহ ধরেই একটা ব্যাপক দুর্ভিক্ষের প্রাথমিক সব কয়টি লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। অসংখ্য নিঃস্ব কৃষক শহরে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনাহারে অনেকেরই মৃত্যু হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় লঙ্গরখানা খোলা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ খাদ্যশস্যের মূল্যের সম্বন্ধে কোন কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হলে অবস্থা আরো খারাপের দিকে মোড় নেবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মাসের পর মাস ধরে খাদ্য ব্যবসায়ীদের অবিশ্বাস্য দুর্নীতি ও অপরিমিত লাভের ফলে গত ছয় মাসে চালের অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধিই হচ্ছে দরিদ্র জনগণের অনাহারের মূল কারণ? বাজারে খাদ্যশস্য ভর্তি—তবে তা শুধু চড়া দামে বিকোবার জন্য।

দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বাড়বার সাথে সাথে বেসরকারি মজুত থেকে ক্রমবর্ধমান হারে খাদ্যশস্য বাজারে আসবে—কিন্তু দামও বাড়বে ক্রমাগত। '৪৩-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় বেশ কিছু বিখ্যাত পরিবার খাদ্যশস্যের ব্যবসা করে ভাগ্য গড়েছিল। ঢাকায় সবাই বিশ্বাস করেন যে এবারেও বেশ কিছু ভাগ্যবান তৈরি হচ্ছে। ঢাকাস্থ জাতিসংঘের জনৈক কর্মকর্তা ব্যবসায়ীদের লাভজনক মানসিকতার উল্লেখ করে বলেছেন— 'সামনে যা আসছে তা এক মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ ছাড়া আর কিছুই নয়।'

তিন বছর আগে প্রাক-স্বাধীনতা আমলে যেখানে চালের দাম ছিল মণপ্রতি চল্লিশ টাকা সেখানে এ-বছর সেপ্টেম্বরের ৩য় সপ্তাহে চার'শ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এই পরিমাণ বৃদ্ধির মানে হচ্ছে একটা আমেরিকান পরিবার তিন বছর আগে যেই রুটির টুকরো চল্লিশ সেন্ট দিয়ে কিনেছিল এখন তা চার ডলারে কিনতে হচ্ছে। (প্রাগুক্ত, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭৪)

নভেম্বর ১৯৭৪ : উত্তরাঞ্চলের এক জেলা রংপুর। মনে হয় এদের জন্য পুরো বছরটাই ছিল একটা দুর্ভিক্ষরূপী ধ্বংসযজ্ঞের জন্য অসহায় ভীতিকর প্রতীক্ষা মাত্র। সাগরের ঢেউয়ের মতোই অব্যর্থ ফণা তুলে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের ঘটনাগুলো যেন আবারো সমান ভয়াবহতা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। তবে যারা এতদিন ছিলেন বাংলাদেশের অর্থনীতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার নীরব পর্যবেক্ষক, তাদের জন্য শেষের এই ভয়াবহ পতন আশ্চর্যজনক নয়।

উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর মধ্যে রংপুর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জামালপুর, ফরিদপুর, নোয়াখালী আর খুলনায় দুর্ভিক্ষের পূর্ব লক্ষণগুলো দেখা গেলেও রংপুর সত্যিই আজ বাংলাদেশের মৃত্যুকূপ।

চব্বিশে অক্টোবর ছিল রংপুর রাজস্ববিভাগের জন্য এক চরম বিশৃঙ্খলার দিন। সেদিনের অবস্থা বিশ আর ত্রিশের দশকে ইউরোপ-আমেরিকায় ব্যাংক-দৌড়াদৌড়ি অবস্থার সাথে তুলনীয়। এ সময় হাজার হাজার লোক জমির মালিকানা বদলির জন্য রাজস্ব স্ট্যাম্প কেনার আশায় ভিড় করেছিল রাজস্ব বিভাগের অফিসে। অক্টোবরের প্রথম দিকেই ছোট জমির মালিকেরা কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছিল, তারা সব শেষে মরিয়া হয়ে চাল কেনার জন্য জমি বেচা শুরু করে।

রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তাদের মতে স্মরণকালের মধ্যে জেলায় এত বিপুল পরিমাণ জমি হস্তান্তর হয় নি, তাদের হিসাবে প্রায় এক লাখ একর জমি গত তিনমাসে অর্ধেক দামে বিক্রি হয়েছে। গরিব কৃষকদের ক্ষতি দু'দিকেই হচ্ছে; একদিকে জমির দাম কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে চালের দাম বেড়েই চলেছে। রংপুরে যে চালের মণ আজকে চারশ টাকা, মাত্র ছয় মাস আগেও তা দু'শ টাকায় বিক্রি হচ্ছিল। জেলা প্রশাসনের হিসাবে গত তিন মাসে পনের থেকে পঁচিশ হাজার লোক রংপুরে মৃত্যু বরণ করেছে। একজন চিকিৎসকের মতে এদের মৃত্যুর কারণ এমনকি অপুষ্টিও নয়—সার্বিক অনাহার।

কর্মকর্তাদের গোপন স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পঞ্চাশ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটেছে। বিরোধী দল জাসদের স্থানীয় শাখার দাবি অনুযায়ী এক লাখ লোকের মৃত্যু হয়েছে। আসল পরিমাণ যতই হোক না কেন সবাই এটা স্বীকার করছেন যে শীত আসার সাথে সাথে ত্রাণকার্যে বড়ো কোন পরিবর্তন না এলে আরো বহুগুণ মানুষ মারা যাবে।

রংপুরের সরকারি কর্মকর্তারা সবাই ব্যক্তিগতভাবে একমত যে প্রতি গ্রামে প্রতি সপ্তাহে একটি মৃত্যু বরণের ঘটনা এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার; তার মানে রংপুরের চার

হাজার গ্রামের মধ্যে দু'হাজার গ্রামেও যদি দুর্ভিক্ষের ছোঁয়া লেগে থাকে (অবশ্যই দুর্ভিক্ষের আওতাধীন গ্রামের সংখ্যা আরো অনেক বেশি), তবুও প্রতি সপ্তাহে এই জেলায় দুই হাজার মৃত্যু ঘটছে। যদিও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থা রংপুরের মতো খারাপ নয়, তবু একটা জেলাকে দিয়ে পুরো দেশের পরিস্থিতি বিচার করলে প্রকৃত অবস্থা অনুমান করতে অতি বড়ো কল্পনাবিলাসীর পক্ষেও অসুবিধা হবার কথা নয়। (এ ডেথ ট্র্যাপ কল্ড রংপুর, **ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ, ১৫ই নভেম্বর ১৯৭৪)"**।

দুর্ভিক্ষের বছর ছিল মুজিবের পতনের মূল। একাত্তরের যেই মুজিব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব হিসেবে লাখো মানুষের সামনে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন, চুয়াত্তরে এসে সেই মুজিব পারতপক্ষে মুক্ত জনসভায় যেতেন না। গোলমাল বেধে ওঠা ছিল খুবই স্বাভাবিক। '৭৩-এর শেষের দিকে বিরোধী দলীয় জাসদের বিক্ষোভ মিছিলে পল্টন ময়দানে এক লাখ লোকের জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হতো। '৭৪-এর প্রথম দু'মাসে জাসদ সারাদেশব্যাপী বিক্ষোভ হরতালে সাফল্যজনকভাবে নেতৃত্ব দেয়। সতেরই মার্চ পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভার পর জাসদ নেতৃত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসার দিকে এক ভূখা মিছিল নিয়ে যায়। কিন্তু মিছিল মন্ত্রীর বাসায় পৌছাতে না পৌছাতেই ভারতীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা হাজির হয়। মুহূর্তের মধ্যে তারা গুলি ছোঁড়ে। মিছিলের পরিসমাপ্তি ঘটে 'মিন্টো রোড হত্যাকাণ্ডে'র মধ্য দিয়ে।[৩৯]

সরকারি ঘোষণায় আটজনের মৃত্যু দেখানো হলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডাক্তাররা ত্রিশ জনেরও বেশি লোকের মৃত্যুর কথা বলেন। এই ঘটনার সূত্র ধরে অনেক জাসদ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। জাসদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় তছনছ করা হয় আর গণকণ্ঠের অফিস পুড়িয়ে দিয়ে পত্রিকার সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়। জাসদ প্রকাশ্য কাজকর্ম বাদ দিয়ে গোপনীয়ভাবে কাজ করতে বাধ্য হয়।

কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই দেশের সবচেয়ে সক্রিয় দু'টো বিপ্লবী দল নিজেদের মধ্যে পেয়ে যায় প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সামরিক ব্যক্তিত্ব। পার্টির প্রচার পত্র থেকে জিয়াউদ্দিনের সর্বহারা পার্টিতে যোগদান করার ব্যাপারটা ব্যাপকভাবে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে জাসদে তাহেরের অন্তর্ভুক্তি ছিল পার্টির গোপনীয় ব্যাপার—অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউই তা জানতেন না। এই সময় তাহের প্রকাশ্যে ঢাকায় ঘোরাফেরা করতেন ও তাঁর সহযোগী সামরিক বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। তাহের আর জিয়াউদ্দিন তখনো পরস্পরের বন্ধু। জিয়াউদ্দিন ইতিমধ্যে ফেরারি ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেও তাহেরের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল অটুট। জিয়াউদ্দিন সর্বহারা পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হন এই দেখে যে এই দল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের আদর্শের প্রতি বিশ্বাস ঘাতক শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে জঙ্গী অবস্থান নিয়েছে। তাহের সবসময় চাইতেন এসব গোপন বিপ্লবী সংগঠনগুলোর মধ্যে ঐক্য আসুক, কিন্তু সিকদারের আন্দোলনে, তাঁর মতে ব্যাপক জনসমর্থন এবং পরিস্থিতির উপযুক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণের অভাব ছিল। সর্বহারা পার্টিতে অন্য কোন কিছুর চাইতে বন্দুকের নলই যেন ক্ষমতার উৎস। জাসদের মধ্যে তাহের খুঁজে পান একটা দলকে যারা বিপ্লবী

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় জনসমর্থন ও রাজনৈতিক অনুক্রম দু-ই গড়ে তুলছিল। বিপ্লবী গণবাহিনীর নেতা তাহের সবসময় নিজেকে জাতীয় কমিটির রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীন বলে মনে করতেন।

'৭৪-এ সর্বহারা পার্টির মতো বিপ্লবী দলগুলো স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে সামরিক অভিযান বাড়িয়ে তোলে। দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকায় বিদ্রোহীদের মাধ্যমে সরকারি খাদ্য গুদাম লুট করে গরিবদের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণের খবরও পাওয়া যাচ্ছিল। '৭৪-এর ডিসেম্বরে মুজিব সংবিধান স্থগিত করে (তথ্যটি সঠিক নয়—অনুবাদক) দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন ও নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন। গুপ্ত সংগঠনগুলোর ওপর সরকারি দমননীতি বেড়ে যায়। ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে সিরাজ সিকদার চট্টগ্রামে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। কিছুদিন পরে ১৯৭৫ সনের ২রা জানুয়ারি, পেছনের দিকে গুলি খেয়ে তিনি মারা যান। সরকারি প্রেস নোটে দাবি করা হয় যে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে তাকে গুলি করা হয়। কিন্তু সিরাজ সিকদারকে পুলিশী হেফাজতে থাকাকালীন হত্যা করা হয়েছে তাতে কারো কোন সন্দেহ ছিল না। এভাবেই দেশে এক বিস্ফোরনুখ পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছিল। আগামী ছয় মাসের মধ্যেই শেখমুজিব মারা যাবেন।

জিয়ার ২৩শে নভেম্বরের প্রতি-অভ্যুত্থান ও তাহেরের গ্রেফতার

বইয়ের শুরুতে ছিল একটি ফাঁসির দণ্ড কার্যকর করার কাহিনী। তারপর ছিল আবু তাহেরের লেখা জীবনের শেষ চিঠি। সে চিঠিতে তাহের ১নং বিশেষ সামরিক আদালতের গোপন অধিবেশনের প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিদের কাছে আপিল করেছিলেন—'এই গোপন বিচারের, মিথ্যা মামলার প্রতিবাদের জন্য.... সত্য প্রকাশ করাটা তাদের নৈতিক দায়িত্ব।' আজো এই দেশে সেই সত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। '৭৬-এ তাহের হত্যা আর পরবর্তী এক বছরের অজস্র মৃত্যুর ঘটনার নায়কদের অভিপ্রায় এই যে পুরো ব্যাপারটাই লোকে ভুলে যাক। তাহেরের বিচারের কাহিনী যে রহস্য ও অজ্ঞতার জালে ঢেকে দেয়া হয়েছে, সেই একই জালে জড়িয়ে পড়ুক সাতই নভেম্বরের অভ্যুত্থানের কাহিনী। বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে তা হতে না দেয়া।

অবশ্যই সবকিছু এখনো জানা যায় নি। আরো অনেক অনেক সূত্রের রহস্যজট খুলতে হবে। আর সেই কাজটা আমার বিশ্বাস বাংলাদেশি লেখকদের দ্বারাই হওয়া উচিত। বিশেষ সামরিক আদালত ও আনুষঙ্গিক ঘটনাবলি এখনো গোপনীয়তার জালে ঢাকা। আমার কাজ হচ্ছে শুধু সত্যকে ঘিরে থাকা রহস্যের দেয়ালে প্রথমে ফাটল ধরানো।

তাছাড়া বর্তমান লেখাই শেষ কথা নয়। এখানে আরো অনেক প্রসঙ্গের বিস্তারিত বিবরণ দরকার। পনেরই আগস্ট, তেসরা নভেম্বর, সাতই নভেম্বর—এরকম কয়েকটা দিনের ঘটনা এসেছে। তবে পূর্ণাঙ্গ ক্রমবিবরণ এখানে অনুপস্থিত। ১৯৭৪ সালটা ছিল বাংলাদেশের জন্য 'বিপ্লবী বাম'-এর বছর। জাসদ আর সর্বহারা পার্টি থেকে শুরু করে মাওলানা ভাসানী আর তোয়াহার সাম্যবাদী দল—সবাই একসাথে এক সুরে ক্ষয়িষ্ণু ও অসাধু মুজিব সরকারের ওপর ক্রমবর্ধমান জনঅসন্তোষ অত্যন্ত সার্থকভাবে তুলে ধরেছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে যদিও বামপন্থী দলগুলোই প্রকাশ্য আন্দোলন আর গোপন তৎপরতার ভেতর দিয়ে গণবিদ্রোহের এক নতুন পটভূমি প্রস্তুত করেছিল, সময় আসলে ডানপন্থীরা ধূর্ততার চরম দেখিয়ে সুযোগ ছিনিয়ে নিল। বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবী ১৫ আগস্টের সকালে জেগে উঠে জানলো মাত্র ছয়জন আর্মি মেজর আর তাদের অধীনস্থ সৈন্যদের অস্ত্রে পরিবারের প্রায় ৪০ জন সদস্যসহ শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হয়েছেন। বিনিময়ে দেশকে দেবার মতো তেমন কোন উপহার ছিলনা ছয় মেজরের হাতে। কেবল মুজিবের দল আওয়ামী লীগের অতি ডানপন্থী রাজনীতিক খোন্দকার মোশতাক আহ্‌মেদ আর পাকিস্তান আমলের পুরনো সেই নীতি—রাষ্ট্রের ভিত্তি

আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস, আমেরিকা হল যার সামরিক ও অর্থনৈতিক ভরসা। আয়ুব খানের মতোই এরাও সোভিয়েত সমর্থিত ভারতীয় আগ্রাসনবাদের প্রতি পিকিংয়ের গাত্রদাহ মনোভাবকেই দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করল। ইতিমধ্যে নেপথ্যের নায়কেরা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এই সাধারণ ধারণা ছড়িয়ে দিয়েছিল যে ছয় মেজর যা করেছে নিজেদের বুদ্ধিতেই করেছে, পর্দার আড়ালে কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই। তবে বইয়ের দ্বিতীয় পর্বেই দেখা যাবে, আরো অনেক কিছুর মতো আজ এই সুসংগঠিত অপছায়া প্রকাশের পথে।

পঁচাত্তরের রক্তক্ষয়ী ঘটনাগুলোর ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনার পর এখন আবার তাহেরের কথায় ফিরে আসা যেতে পারে, যা দিয়ে এই প্রবন্ধ শুরু হয়েছিল। ৭ই নভেম্বরের রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের পর জিয়া আর তাহেরের মাঝে যখন দেখা-সাক্ষাৎ হলো, তারা যেন ফিরে গিয়েছেন ১১তম সেক্টরের সেই দিনগুলোতে। দু বন্ধু পাশাপাশি যুদ্ধ করে চলেছেন বাংলাদেশকে মুক্ত-স্বাধীন করবেন বলে। আবেগ-বিহ্বল জিয়া তাহেরকে জড়িয়ে ধরে তার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে সুগভীর কৃতজ্ঞতা জানালেন। মাত্র চার দিন আগের ঘটনা—জিয়া গ্রেফতার হবার মুহূর্তে মরিয়া হয়ে টেলিফোন করেছেন তাহেরকে, আশা—হয়তো তাহের খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের প্রতি বিরোধী মনোভাবসম্পন্নদের সংগঠিত করে জিয়াকে বাঁচাতে পারবেন। কথার মাঝখানে লাইন কেটে গেল। সেদিন জিয়া তার কথা শেষ করতে পারেন নি।

খালেদের অভ্যুত্থানের পর পরই সামরিক বাহিনীর স্তরে স্তরে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এন. সি. ও. আর জে. সি. ও.-রা মিলে তাহেরের নারায়ণগঞ্জস্থ বাসভবেন মিলিত হয়। এদের ইচ্ছা ছিল তাহের এই সংকটে নেতৃত্ব নিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। এদের অনেকেই ছিলেন 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'র সদস্য। (জাসদ প্রায় দীর্ঘ এক বছর ধরে সাংগঠনিক কাজকর্মের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে গোপনে এই বাহিনী গড়ে তোলে)। বহুদিন ধরেই এঁরা মুজিবের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান গড়ে তোলার পরিকল্পনায় ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ছিলেন ক্যু-এর বিপক্ষে। সশস্ত্র পদক্ষেপ নেয়ার আগে তাদের পরিকল্পনা ছিল শহরের জনগণের এবং কৃষকদের মধ্যে সৃষ্ট আন্দোলনকে আরও ধূমায়িত করা। কিন্তু আগস্ট আর নভেম্বর-এর অভ্যুত্থান সৃষ্টি করেছে এক সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতির। তাই জাসদ সিদ্ধান্ত নিল আরেকটি গণঅভ্যুত্থানকে সমর্থন দিতে তাদের বিচারে যার ছিল পূর্ণ গণসমর্থন পাবার সম্পূর্ণ অনুকূল পরিবেশ। উপরন্তু সফল হলে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের স্থবিরতা ভেঙ্গে নতুন করে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনাও ছিল পুরোদমে। তাহেরের নেতৃত্বে শুরু হলো সামরিক প্রক্রিয়াকরণ। বিদ্রোহের চাকা চলতে শুরু করলো।

জাসদের মুখপত্র **সাম্যবাদ** এই অভ্যুত্থান সংঘটনের যেসব যুক্তি দেখায় তা হচ্ছে এই যে—

> খালেদ মোশাররফ আর তার সহযোগীরা ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেশে ইন্দো-সোভিয়েত প্রভাব বলয়ের বিস্তার ঘটাবার কাজে ব্যাপৃত হয়।

আওয়ামী লীগ আর তার লেজুড় মনি-মোজাফফর চক্র প্রকাশ্যে বের হয়ে এসে শেখ মুজিবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে আত্মনিয়োগ করে। এরই মধ্যে দেশের সেনাবাহিনী—বিশেষ করে জোয়ানরা তাদের অফিসারদের মধ্যে ক্ষমতার লালসা আর নিজেদের উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করতে সাধারণ সিপাহীদেরকে পুতুলের মতো ব্যবহার করতে দেখে ভেতরে ভেতরে রোষায়িত হয়ে উঠছিল। পাঁচই নভেম্বরে প্রকাশিত ও ঢাকা সেনানিবাসে প্রচারিত বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার প্রচারপত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাদের মনোভাব। পরদিন রাত্রিতে বিপ্লবী গণবাহিনী আর বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যরা যৌথ সভায় চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন ব্যারাক থেকে বের হয়ে এসে খালেদ মোশাররফ চক্রের পতন ঘটাতে। এই দু বিপ্লবীবাহিনীর যৌথ অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফ চক্র সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে প্রথম জয় হলো তাদের। যে সব কারণে এই সংঘাতে জড়ানোটা জরুরি হয়ে পড়ে তা হচ্ছে—

প্রথমত, এর মাধ্যমে বুর্জোয়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সবচেয়ে সক্রিয়, সংগঠিত ও স্বেচ্ছাচারী সামরিক চক্রের ঐক্যে ফাটল ধরানো,

দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়া শক্তির সাংগঠনিক ক্ষমতা একেবারে পঙ্গু করে দেয়া,

তৃতীয়ত, জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সব রকমের সাম্রাজ্যবাদী, সংশোধনবাদী আধিপত্যবাদী শক্তিকে দুর্বল করে দেয়া,

চতুর্থত, নতুন আইনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির যতদূর সম্ভব পুনঃপ্রচলন করার মাধ্যমে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কবর রচনা করা,

পঞ্চমত, বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার সমান্তরালে সর্বহারা শক্তিগুলোর রাষ্ট্র ও রাজনীতির শক্তিভিত গড়ে তোলা,

সাতই নভেম্বর ও তৎপরবর্তী ঘটনা প্রবাহে আমাদের অংশগ্রহণ ও সাফল্যের পূর্ণ বিবরণ এবং এবিষয়ে আমাদের বিস্তৃত মূল্যায়ন ও সমালোচনা, **লড়াই** (পঞ্চম সংখ্যা) ও **জঙ্গী জনতার ঐক্য গড়ে তুলুন** নামে দুটো পুস্তিকায় দেখুন।[৪০]

জাসদের কার্যকলাপ নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়া হয়। তবে সাতই নভেম্বর তাঁরা নিজেরাই বিপ্লবী সরকার গঠন করতে চান নি। বরং তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আরও সৎ। মুজিবের আমলে যেসব রাজনৈতিক কর্মী জেলে ছিল এবং মোস্তাকের ক'মাস ক্ষমতা থাকাকালীন সময়েও যাঁরা ছাড়া পান নি, সে সব রাজবন্দীর মুক্তির বিষয়টা সর্বপ্রথমে জাসদ নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। বিপুল সংখ্যক রাজবন্দীর অধিকাংশই ছিল বিভিন্ন প্রগতিশীল দল হতে আসা। জাতীয় কমিটির সদস্যসহ জাসদের প্রায় দশ হাজার কর্মী ছিলেন জেলখানায়। ঐ দিন তারা প্রস্তাব দেন মুজিবের আমলে নিগৃহীত হয়েছে এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষে কাজ করেছে এমন সব রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে এবং পাক সেনাদের

সহযোগিতা করেছে—যেমন , মুসলিম লীগ এবং জামাত-ই ইসলামীর মত মৌলবাদী ধর্মীয় দলগুলোকে এতে প্রবেশের কিংবা রাজনীতিতে আসার অধিকার দিতে তারা প্রস্তুত ছিল না। এই সরকারের কাজ হবে নতুন করে নির্বাচন দেয়া, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়া আর অবাধ রাজনৈতিক সভাসমিতির অধিকার দেয়া। ১৯১৭ সালের কেরেনস্কি সরকারের মতো সৈনিক ও শ্রমিকের সোভিয়েত ব্যবস্থার অনুকরণে জাসদ সেনাবাহিনী আর শ্রমিকদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রকে অতিক্রম করে সেনা কমিটি গঠনের আহ্বান জানায় যা হবে নতুন ক্ষমতার উৎস। এর মাধ্যমে নতুন সংকট মোকাবিলার জন্য জাসদের পক্ষে সম্ভব হতো নিজেদের অবস্থানকে আরো সংহত ও সুদৃঢ় করা।

পার্টির ওপর জিয়ার খড়গ নেমে আসার পর সার্বিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে যেয়ে সবাই হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন—জাসদ কেন জিয়াউর রহমানকে সমর্থন দিতে গেল? মনে হয়, এর পেছনে তাহেরের প্রভাব ছিল। অন্যদের মতো তাহেরও বিশ্বাস করতেন যে জিয়া বিপ্লবী না হলেও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সাধারণ নির্বাচনের মতো তাৎক্ষণিক গণতান্ত্রিক পদক্ষেপের বিরোধিতা করবেন না। বহু বছর ধরেই তাহের আর জিয়া ব্যক্তিগত বন্ধু। স্বাধীনতার পরে সাধারণ সিপাহীদের মধ্যে একজন সৎ জাতীয়তাবাদী হিসেবে জিয়ার ভাবমূর্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে তাহের আর জিয়াউদ্দিনের ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে বেশি। সর্বহারা পার্টিতে যোগদান করে জিয়াউদ্দিন যখন সরে এলেন লোক চক্ষু থেকে, জিয়া তখন পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে জিয়াউদ্দিনের খোঁজ করবার ব্যাপারে জুনিয়র অফিসারদেরকে নিরুৎসাহিত করেন। বাহাত্তরে জিয়া উচ্চতম কমান্ডের সভায় কুমিল্লা সেনানিবাসে তাহেরের 'উৎপাদনমুখী সেনাবাহিনী' গড়ে তোলার প্রস্তাবের পক্ষে সায় দিয়েছিলেন। কাজেই সাতই নভেম্বরে জিয়াকে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ ছিল। বিদ্রোহের দিন সন্ধ্যায় জিয়া রেডিও বাংলাদেশে গিয়ে তাহেবের সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে জিয়া সিপাহীদের বারো দফা দাবি সমর্থন করে একটি দলিলে স্বাক্ষর করেন। পরদিনই তিনি কারাগার থেকে জাসদ নেতৃবন্দকে মুক্তির আদেশ দেন। জাসদ সভাপতি এম. এ. জলিল ও সাধারণ সম্পাদক আ. স. ম. আবদুর রব মুক্তি পান। বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে জনসভা করার অনুমতিও দেয়া হয় নয় তারিখে।

এখান থেকেই শুরু হয় গোলমালের। পুলিশ এসে বায়তুল মোকারমে জাসদের মিছিল ভেঙ্গে দেয়।[৪১] জাসদ-ছাত্রলীগের সভাপতি আ. ফ. ম. মাহবুবুল হক পুলিশের গুলিতে আহত হন। জিয়া প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত থাকলেও পরে সেনাবাহিনীর ভেতরে বামপন্থী শিবিরকে গোপন সমর্থনের ইঙ্গিত করেছিলেন। এবারে তিনি সম্পূর্ণ উল্টো পথ ধরলেন। তেসরা নভেম্বরে রাত্রিতে তিনি তাহেবের কাছে যে সাহায্য চেয়েছিলেন তা যে এভাবে আসতে পারে সেটা জিয়া কল্পনাও করেন নি। তার ইচ্ছা ছিল শুধু খালেদ মোশাররফ চক্রের পতন হোক, কিন্তু এখন যেদিকেই তাকান আশেপাশে ভর্তি অসংখ্য সেনা কমিটি যারা কথায় কথায় শ্রেণীহীন অফিসারহীন সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠার কথা বলে।

বিপ্লবী অভ্যুত্থানের বিরোধী-ডানপন্থী শিবিরের লোকেরা খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের অবস্থান সংহত করতে নেমে পড়েন। মুজিব হত্যার পেছনে পর্দার আড়ালে যার ভূমিকা

ছিল সবচেয়ে বেশি সেই মাহ্‌বুব আলম চাষী জিয়াকে নতুন পথে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। আমেরিকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জাতীয় পুলিশ বাহিনী, প্যারামিলিটারি পুলিশ ইউনিট আর এন. এস. আই. এর শক্তির ওপর ভিত্তি করে ডানপন্থীরা নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে তুললো। পরবর্তীকালে তৎকালীন ঘটনা বিশ্লেষণ করে জিয়ার ভূমিকা সম্বন্ধে জাসদ একটি দলিল প্রকাশ করে

> মেজর জেনারেল জিয়া একজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি যার মধ্যে প্রগতিশীল চেতনার অভাব রয়েছে, একথা জেনেও তাকে ক্ষমতা দেয়া হয় কারণ তখনকার অবস্থায় জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। দরকার ছিল এমন একজন ব্যক্তিত্বের যাকে সাধারণভাবে জনসাধারণ ও সেনাবাহিনী সমর্থন দেবে। জিয়ার মতো একজন বাহ্যত অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে তা অর্জন করা সম্ভব ছিল। এ ছাড়াও নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ায় তিনি মানসিকভাবে যে দুর্বল অবস্থার মধ্যে ছিলেন তাতে জনসাধারণের পক্ষে কাজ করানোর সুযোগ ছিল। সম্ভব হতো তাকে দিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষের কাজগুলো, যেমন রাজবন্দীদের মুক্তি, নির্বাচন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন, দেশকে ভারত-রাশিয়া-আমেরিকার প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত করা—এসব করিয়ে নেয়া। কিন্তু ক্ষমতাশালী অবস্থানে আসার পর খুব তাড়াতাড়িই জিয়া বুঝতে পারলেন যে তার ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত আশা-আকাঙ্ক্ষা আর উচ্চাভিলাষ এই প্রগতিবাদী শক্তির সঙ্গে থেকে পূরণ হবার নয়... দশ-এগার তারিখের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। প্রথমে তিনি যতোই সঠিক বক্তব্য দিয়ে থাকুন না কেন, জিয়া প্রথম থেকেই প্রতিক্রিয়াশীলদের শিবিরের দিকে ঝুঁকে পড়েন।[৪২]

এরপর জিয়া নতুন করে আরো রাজবন্দী ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি রাজনৈতিক জনসভার ওপরও নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখলেন; ১৫ই নভেম্বরের মধ্যেই জাসদ প্রকাশ্যভাবে জিয়ার কার্যকলাপের নিন্দা শুরু করে। জাসদ প্রকাশিত প্রচারপত্রে জিয়াকে এই বলে অভিযুক্ত করা হয়, যে জিয়া বিপ্লবী জওয়ানদের দ্বারা বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়েছেন, তিনি এখন আমেরিকা পন্থী এবং ডানপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের পরিচালিত প্রতি-বিপ্লবের পথে অগ্রসর হচ্ছেন।[৪৩]

এই ঘটনার সাথে তুলনীয় '৭৪-'৭৫-এর পর্তুগালের ঘটনা প্রবাহ। যদিও এপ্রিল অভ্যুত্থান-এর পেছনে মূল শক্তি ছিল ওটেলো কারভালহোর নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর বিপ্লবী সদস্যরা, এরা তাৎক্ষণিকভাবে জেনারেল স্পিনোলার নেতৃত্বে রক্ষণশীলদের সাথে জোট গঠন করেছিলেন। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম কাজ হচ্ছে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের পতন—এই মতের ভিত্তিতে দু গ্রুপের মধ্যে সমঝোতা হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এ ঐক্য ভেঙ্গে গেল; জেনারেল স্পিনোলা ডানপন্থী শক্তির পুনর্জাগরণের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হন। একজন পর্যবেক্ষকের মন্তব্য হচ্ছে—'স্পিনোলা

নীতিগতভাবে এম. এফ. এ. (আর্মড ফোর্সেস মুভমেন্ট)-এর কর্মসূচির সাথে ঐক্য প্রকাশ করলেও সেই কর্মসূচির বাস্তবায়নের পদক্ষেপ ছিল তার জন্য সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। এম. এফ. এ. শুধু দুর্নীতিপরায়ণ কয়েকজন ব্যক্তির পতনই চান নি, তাঁরা চেয়েছিলেন পুরো উপরিকাঠামোর পরিবর্তন।[৪৪] কিন্তু পর্তুগালে এম. এফ. এ. কর্তৃক এপ্রিল '৭৪-এর বিদ্রোহ আর স্পিনোলার এগারোই মার্চের ক্যু-দেতা'র মধ্যে ছিল লম্বা এগারো মাসের সময়। এর মধ্যে অবাধ রাজনীতির সুযোগে এম. এফ. এ. তাঁদের কর্মসূচির প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন আদায়ের যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন, আর তাই স্পিনোলার পাল্টা-অভ্যুত্থান শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশে পট পরিবর্তন ঘটে অনেক তাড়াতাড়ি। এগারো মাস অপেক্ষা না করে মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যেই বাংলাদেশের স্পিনোলা ডানপন্থী শিবিরে তার অবস্থান স্পষ্ট করে তোলেন।

বিপ্লবী গণবাহিনীকে সর্বহারা বিপ্লবের নতুন যুগের সূচনায় সাহায্যের জন্য সদ্য কারামুক্ত জাসদ নেতাদ্বয় এম. এ. জলিল ও আ. স. ম. রব ১৫ই নভেম্বর জরুরি ভিত্তিতে সৈনিক, শিল্পশ্রমিক, কৃষক আর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিপ্লবী কাউন্সিল গঠনের আহ্বান জানান। তাদের মতে এটা হচ্ছে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রাক-সোভিয়েত রূপরেখা। অন্যদিকে ঘটনার পট পরিবর্তন হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি। মাত্র এক সপ্তাহ পর তেইশে নভেম্বর জিয়া প্রতি-অভ্যুত্থান ঘটালেন। স্পিনোলা হয়েছিলেন ব্যর্থ, জিয়া সেখানে হলেন সফল নায়ক। সেনাবাহিনীকে বাদ দিয়ে পুলিশবাহিনীর ওপর মূলত ভিত্তি করেই জিয়া জাসদ নেতৃত্বের পুনঃআটকাদেশ জারি করলেন। তেইশে নভেম্বরের রাত্রিতে জলিল, রব আর ইনুকে হঠাৎ করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন আধাসামরিক বাহিনীর লোকেরা তাহেরকে গ্রেফতার করে।

তাহেরের গ্রেফতারের দু'দিন পর জাসদের চারজন সমর্থক যার দু'জন ছিলেন তাহেরের ছোটভাই—ভারতীয় হাই কমিশনার সমর সেনকে জিম্মি করবার প্রচেষ্টা চালায়। হাই-কমিশনে ঢোকার মুখে সমর সেনকে জড়িয়ে ধরা হয়। সামনে দাঁড়ানো হাই-কমিশনারের দেহরক্ষীদের প্রতি অপহরণকারীরা চিৎকার করে বলে—'গুলী করোনা, ইনি আমাদের জিম্মি।' কিন্তু দেহরক্ষীরা হালকা মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ে হাই-কমিশনারকে আহত করে, আর দু'জন অপহরণকারীকে সাথে সাথে হত্যা করে। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন তাহেরের ভাই। অপহরণকারী একটিও গুলি ছুঁড়ে নি। বেঁচে যাওয়া বাকি দু'জন অপহরণকারী পুলিশের নিকট বলেন যে তাঁরা শুধু তাহের, জলিল, রব, ইনু আর অন্যান্য জাসদ নেতৃবৃন্দের মুক্তির আশায়ই সমর সেনকে জিম্মি করতে চেয়েছিল। সম্পূর্ণ নিজেদের বুদ্ধিতেই তারা এই কাজ করে, পার্টি সিদ্ধান্ত কোনভাবে একে প্রভাবিত করে নি, তবে তারা বিশ্বাস করতো জিয়া সাতই নভেম্বরের বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আর সেটাই ছিল এই আক্রমণের মূল কারণ।

সারাদেশব্যাপী জাসদের ওপর ব্যাপক দমন শুরু হয়। জেলাগুলোতে পুলিশের টানাজালে আটকা পড়ে স্থানীয় ছাত্র ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা। ঢাকায় জারি হয় কড়া কারফিউ আর বিভিন্ন অঞ্চল ঘেরাও দিয়ে পুলিশ পার্টি সদস্যদের উদ্দেশ্যে বাড়ি বাড়ি তল্লাশী চালাতে থাকে। এসব গ্রেফতারের পর দেশের বিভিন্ন সেনাছাউনিতে বেশ বড়

রকমের গোলমালের খবর পাওয়া যায়। খোদ ঢাকায় দুটি বিক্ষুব্ধ ব্যাটালিয়নকে অস্ত্র ত্যাগ করাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়, অন্যদিকে বগুড়া, কুমিল্লা আর রংপুর থেকেও শত শত সৈনিকের ডিটেনশনের খবর পাওয়া যায়। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে চট্টগ্রামের নৌসেনা ছাউনীতে নতুন করে বিদ্রোহ দেখা দেয়, পরের বছর মার্চের দিকে আবারো চট্টগ্রাম বিগ্রেডের সেনাইউনিটগুলোর মধ্যে গোলমাল দানা বেঁধে উঠে। সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ এই পরিস্থিতিতে প্রবলভাবে রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন সেনাবাহিনীর বাইরে একটি নির্ভরযোগ্য অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনী গড়ার দিকে মনোযোগ দেন। জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকের এক সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী জানা যায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব সালাউদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধানে একটি পুলিশ কমব্যাট ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে; এই সালাউদ্দিন আহমেদ আয়ুব খানের আমলে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন—বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে তিনি পুরোপুরি পুনর্বাসিত হয়েছেন। কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সিস্টেমস্ (সি. বি. এস.)-এর ঢাকা সফরকারি দূরপ্রাচ্য প্রতিনিধি এই সময়ে পশ্চিম দুনিয়ায় একটা সংবাদ পাঠান

> নভেম্বরের বিদ্রোহের ফলে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের আনুগত্যের সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জিয়া বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীকে নতুন করে সাজানোর কাজে লেগেছেন। সৃষ্টি হয়েছে ১২,৫০০ জনের অভিজাত ও বিশেষ এক পুলিশ বাহিনী। উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিরা সারা দেশ থেকে এসে ঢাকায় জিয়ার সাথে মিলিত হবার পর সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পুলিশ বাহিনীকে নতুনরূপে সংগঠিত করে একটি কার্যকর বাহিনীতে পরিণত করার লক্ষ্যে এই বাহিনী গঠন করার প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়া হয়। যদিও পুলিশ বাহিনীর পুনসাংগঠনিকীকরণের ভেতরের খবরগুলো এখনো অজানা, ঢাকার লোকদের বিশ্বাস, যেহেতু সেনাবাহিনীর ওপর ভরসা ছিল না তাই পুলিশ বাহিনীর আনুগত্যকে পুরোপুরি নিশ্চিত করার জন্য জিয়া এই বাহিনীকে পুনর্গঠন করেন। একই কারণে নতুন বিশেষ অপারেশন ইউনিটসমূহ, যেগুলো সেনাবাহিনীর অধীন থাকার কথা—সেগুলোকে পুলিশের নিয়ন্ত্রণভুক্ত করা হয়েছে।
>
> ১২,৫০০ জনের এই নতুন বাহিনীকে পাঁচ ভাগ করে প্রতি ভাগে ২,৫০০ জনের সশস্ত্র ব্যাটালিয়ন তৈরি করা হয়েছে। সংখ্যায় এটা পূর্বের মন্দভাগ্য-রক্ষীবাহিনীর প্রায় সমান। সরকার বলেছেন এই স্পেশাল অপারেশনাল ইউনিটের কাজ হবে বিশেষ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া, বিশেষত 'যেখানে আধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার রয়েছে। তবে অনেকেরই আশংকা নতুন এই বাহিনী কাজে-কর্মে রক্ষীবাহিনীর নতুন সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নয়। 'বিশেষ অভিযান, ঝটিকা আক্রমণ, প্রভৃতি যেসব তৎপরতার জন্য সুনির্দিষ্ট দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ দরকার সেসব বিশেষ কাজে' এই বাহিনী নিয়োজিত হবে।

দেশের কোথাও এদের কোন ঘাঁটি না থাকলেও এরা সব সময়েই 'পূর্ণ সমর সজ্জায়' বাংলাদেশের যে কোন স্থানে অভিযান চালাতে প্রস্তুত থাকবে।

মনে হচ্ছে বামপন্থী জাসদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অভিযান চালাতে ঠিক এমন একটা, কিছুই সরকারের দরকার ছিল। ভারতীয় হাই-কমিশনারকে অপহরণের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর থেকেই সরকারের এই দমননীতি বিশাল আকার নেয়। ইতিমধ্যেই তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ঢাকায় পাওয়া প্রতিবেদনে বোঝা যায় যে নিয়মিতভাবেই বন্দুক যুদ্ধ, ধাওয়াবাজি, আর ধরপাকড় চলছে। ডিসেম্বরে ঢাকার সংবাদপত্রগুলোতে 'প্রচুর পরিমাণে অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র ও প্রায় এক হাজার 'দুষ্কৃতিকারী' (জাসদ কর্মীদের জন্য ব্যবহৃত সরকারি বিশেষণ) ধরা পড়ার খবর প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে রিলিফ কাজে নিয়োজিত পশ্চিমারা খবর দিচ্ছেন যে জাসদ কর্মীদের ধরিয়ে না দিলে তাদের গ্রেফতার করা হবে বলে পুলিশ গ্রাম প্রধানদেরকে হুমকি দিচ্ছে। এরা আরো বলেছেন যে সন্দেহভাজন জাসদ কর্মীদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে আটক করা হচ্ছে। তাদের প্রতি নিপীড়নও ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।[৪৫]

নভেম্বর অভ্যুত্থানের পর বামপন্থীদের মধ্যে পুরনো বিভক্তি আবারো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বিশেষ করে পিকিংপন্থী সংগঠন তোয়াহার পূর্ববাংলা সাম্যবাদী দল, যা '৭১-এ জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে বিতর্কিত ভূমিকা নিয়েছিল ও তৎকালীন জাসদ 'কেন্দ্রের' কৌশলগত ভূমিকার সাথে সংঘাতে অবতীর্ণ হয়েছিল, তারা প্রকাশ্যে জাসদের নিন্দা করতে থাকে। তোয়াহা অভ্যুত্থানের প্রথম পর্ব যা খালেদ মোশাররফকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার সমর্থন দেন তবে পরক্ষণেই তিনি জাসদকে গোপন ভারতীয় চর বলে অভিযুক্ত করেন। তোয়াহা অভিযোগ করেন জাসদ দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের চিন্তাধারাকে উসকে দিয়ে ভারতীয়দের মোকাবেলায় দেশের প্রথম প্রতিরক্ষা ব্যূহ দুর্বল করে দিচ্ছে। ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তোয়াহা প্রকাশ্যভাবে এ ধরনের আন্দোলনের নিন্দা করেন

প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন স্তরে শ্রেণী বৈষম্যের জুজু দেখিয়ে জাসদ জওয়ানদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিবাদের বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই ধূর্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে তারা প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে তৎপর যাতে করে বাংলাদেশের মাটিতে ভারতীয় সেনাদের সহজ বিজয়ের পথ খোলা হয়ে যায়।[৪৬]

জাসদ নেতারা অন্যান্য প্রগতিশীল দলগুলোর সাথে মতপার্থক্য দূর করার পক্ষপাতী ছিলেন। জাসদ মনে করতো বামপন্থী দলগুলোর অনেক শিবিরে বিভক্তি-ই এদেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির নীতিগত অবস্থানকে সমর্থন করলেও কোন আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট শক্তির লেজুরবৃত্তি করা থেকে জাসদ নিজেদের সাফল্যের সাথে নিবৃত্ত করে ছিল। চীন-পন্থী মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট দলগুলোর প্রবল আক্রমণ সত্ত্বেও জাসদ এদের সাথে মোটামুটি ভাল সম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করে যাচ্ছিল। তবে তারা মাঝে মাঝে 'যারা একটি বিশেষ

বিদেশি কম্যুনিস্ট পার্টির বক্তব্যকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে'—তাদের ভদ্রজনোচিত ভাষায় সমালোচনা করতো।[৪৭]

জাসদকে আবার গোপন তৎপরতায় চলে যেতে হলে তোয়াহার দল আয়ুব খানের আমলের মতো সামনে এগিয়ে এসে প্রকাশ্যভাবে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষকে সমর্থন দিল। তোয়াহার মতে তখনকার প্রধান করণীয় ছিল আসন্ন ভারতীয় আগ্রাসনের মুখে দেশে শ্রেণীসংগ্রাম করা নয় বরং জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। তোয়াহা মন্তব্য করলেন একবার জাতীয় সার্বভৌমত্ব সংকটের সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে অন্যগুলো আপনি ঠিক হয়ে যাবে। যেন যুক্তিবিদ্যা।[৪৮]

বাংলাদেশের বিপ্লবী রাজনীতির ওপর একজন বিশিষ্ট গবেষক তালুকদার মনিরুজ্জামান সাত-ই নভেম্বরের পরবর্তীকালে বামপন্থী শিবিরের মত বিরোধ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন

> অন্যান্য বামপন্থী দলগুলো এই বলে প্রচার চালাতে থাকে যে সেনাবাহিনীর মধ্যে মত বিরোধের জন্ম দিয়ে আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসারদের মেরে ফেলে গোপন ভারতীয় চর জাসদ দেশের প্রধান প্রতিরক্ষাব্যুহ ধ্বংস করে ফেলছে। প্রত্যুত্তরে জাসদ নেতৃবৃন্দ বলেন যে দেশের সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে একমাত্র তা দেশের শতকরা পঁচানববই জন নির্যাতিত জনতার বিপ্লবী ঐক্যের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে, এই দুর্বল সেনাবাহিনী কিছুই করতে পারবে না। জাসদ নেতৃবৃন্দ দাবি করেন একমাত্র তাঁদের দলই মেহনতী জনতার জাতীয়তাবাদী দল। তাঁরা অন্যান্য 'তথাকথিত' বিপ্লবী দলগুলোকে ১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর বিপ্লবের আগে রাশিয়ার যে সব 'ভুয়ো বিপ্লবী দল' লেনিনকে জার্মান চর বলে অভিযুক্ত করে ছিল তাদের সাথে তুলনা করেন।[৪৯]

তাহের ও অন্য জাসদ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের পরের মাসগুলোতে জিয়ার নতুন সামরিক সরকারের প্রতি অনুরক্ত লোকজন দাবি করতে থাকে যে অভ্যুত্থানের ব্যাপারে জাসদের ভূমিকা ছিল আসলে নিতান্তই গৌণ। ডানপন্থী অনেক দল যেমন সদ্য বৈধতার স্বীকৃতি পাওয়া মুসলিম লীগ, ডেমোক্রেটিক লীগ থেকে শুরু করে বামপন্থী শিবিরে তোয়াহার সাম্যবাদী দল পর্যন্ত বলতে থাকেন যে সাত-ই নভেম্বরের ঘটনার পেছনে তাহের কিংবা জাসদের ভূমিকাকে বিদেশি পত্রিকাগুলো অনেক বড় করে দেখিয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পরই বোঝা গেল আসল সত্যটা কি, যখন জুন মাসে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে একটি গোপন বিচার শুরু করলেন। সরকার পক্ষ থেকে তাহের ও আরো তেত্রিশ জনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং 'প্রতিরক্ষা বাহিনী, বি. ডি. আর. পুলিশ বাহিনী ও আনসারের সদস্য ও অফিসারদের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার ও অসন্তোষ সৃষ্টি' করার অভিযোগ আনা হলো।[৫০]

সাত-ই নভেম্বরের পরের প্রতিকূল ঘটনাবলিকে কিন্তু জাসদ স্থায়ী বলে ধরে নেয় নি। আর ভুল করে বিদ্রোহ করে বসার জন্যই যে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা-ও কিন্তু

জাসদ মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। জাসদের বক্তব্য ছিল যে কোন বিপ্লবই সংগ্রামের কঠিন পথ আর পরাজয় সামাল দেয়া ছাড়া সামনে এগুতে পারে না। নিজস্ব সাময়িকী সাম্যবাদ-এ তাঁরা-মন্তব্য করে—

> বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নেতৃত্বে বিপ্লবী সিপাহীরা যে দুর্গম পথ বেছে নিয়েছিল তা সবিশেষ উল্লেখের দাবিদার। সাত-ই নভেম্বর এরা ঐতিহাসিক বারো দফা দাবি পেশ করে; এর মধ্যে ছিল রাজবন্দীদের মুক্তি, গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সাধারণ সিপাহীদের প্রতি অফিসারদের প্রভু-ভৃত্য ধরনের আচরণের অবসান প্রভৃতি দাবি-দাওয়া। এরা বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থে ব্যবহৃত হতে অস্বীকৃতি জানায়। জিয়া সাময়িকভাবে এই দাবি-দাওয়া মেনে নিলেও গোপনে তিনি তার ব্যক্তিগত ও শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।
>
> প্রথমেই তিনি সেনানিবাস থেকে সেনানিবাসে বদলি করে আর নির্দয় শাস্তির মাধ্যমে বিপ্লবী সেনাদের ছত্রভঙ্গ করে তাদের মনোবল গুঁড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। বলা বাহুল্য, আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও জিয়া তার কাজে সফল হতে পারেন নি। তাই সেনাবাহিনীকে বাদ দিয়ে তিনি পুলিশ বাহিনীর ওপর বেশি ঝুঁকে পড়েন ও ঝপটপ 'দাঙ্গা বাহিনী', 'মহানগর পুলিশ' সৃষ্টি করতে থাকেন।
>
> সাতই-ই নভেম্বর ও তার পরবর্তী ঘটনাবলির চূড়ান্ত বিশ্লেষণ থেকে কি এই প্রতীয়মান হয় যে এর ফলে সর্বহারার আন্দোলনের শক্তি দুর্বল হয়েছে? শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির দিন কি আরো পিছিয়ে গেছে? এসব প্রশ্নের উত্তর একটাই—'না', কারণ—
>
> প্রথমত, যেহেতু সেনাবাহিনী এখন বিপ্লবী চেতনায় অভিষিক্ত, কাজেই ক্ষমতাসীন, শোষক শ্রেণীর স্বার্থের হাতিয়ার হিসেবে এদের আর কখনো ব্যবহার করা যাবে না।
>
> দ্বিতীয়ত, সর্বহারার রাজনৈতিক মতাদর্শ ও তাদের গ্রহণযোগ্য পথের সীমারেখা ক্রমবিকশিত হয়ে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।
>
> তৃতীয়ত, সর্বহারাদের পক্ষে ও বিপক্ষে দু'শিবিরের মেরুকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে।
>
> চতুর্থত, বুর্জোয়া শ্রেণীর সাংগঠনিক ক্ষমতা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
>
> পঞ্চমত, সাম্রাজ্যবাদী-সংশোধনবাদী-আধিপত্যবাদী শক্তি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে যে এদেশের বিপ্লবী জনগণ কখনোই তাদের স্বৈরাচার মেনে নেবে না।[৫১]

বিচারের পালা

চব্বিশে নভেম্বর। তাহেরকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ করা হলো। স্বাধীনতা যুদ্ধের দিনগুলো যেন তাঁর কাছে দূর স্বপ্নের দিন বলে মনে হচ্ছিল। সেই দিনগুলোতে জিয়া আর তাহের ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো। গ্রেফতার হবার দু সপ্তাহের মধ্যেই ছিল জিয়া তাহেরকে রাজশাহী জেলে স্থানান্তরিত করার আদেশ দেন। স্থল পথে যাতায়াত ঝুঁকিপূর্ণ হবে ভেবে ছয়-ই ডিসেম্বর হাতকড়া পরানো তাহেরকে হেলিকপ্টারে করে রাজশাহীতে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজশাহীতে কারান্তরীণ অবস্থায় নিঃসঙ্গ তাহেরের জীবন কেটে যায়। পরবর্তী ছয় মাস ধরে তিনি ভাগ্য জানার অপেক্ষায় রইলেন। ইতিমধ্যে তাহের বিপ্লবের যে অতি-মানবিক শক্তির উন্মোচন করেছিলেন জিয়া তা দমনের কাজে নিয়োজিত হয়েছেন।

বেঙ্গল ল্যান্সার-এর মতো আরো কয়েকটা ইউনিটকে ভেঙ্গে দেয়া হয়, অন্যদিকে মার্চে চট্টগ্রামে আর এপ্রিলে বগুড়া সেনানিবাসের সৈন্যদের মধ্যে গোলযোগ শক্ত হাতে দমন করা হয়। তাহেরের বিরুদ্ধে বেশ বড়ো রকমের একটা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সেনাবাহিনীর উচ্চতর অফিসার-স্তর থেকে দাবি আসতে থাকে। এই অফিসারদের সাধারণভাবে কড়া সামরিক রক্ষণশীলতার প্রতিভু বলা যায়। '৭৩-এ পাকিস্তান থেকে প্রায় এক হাজার অফিসারের প্রত্যাবর্তনের পর এদের মতাদর্শের পাল্লা বদলে যায়। যুদ্ধের ভাগ্য কোন দিকে মোড় নেবে তা' বুঝতে না পেরে এদের অনেকেই '৭১-এ নিষ্ক্রিয় বসেছিলেন। পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের মধ্যে যারা যুদ্ধে যোগদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন তাদের প্রায় সবাই যুদ্ধে যোগদানে সক্ষম হন। অন্যদিকে পেছনে পড়ে থাকা পুনর্বাসিতদের কাছে শৃঙ্খলা, নিয়ম, প্রথাসিদ্ধ নিয়ন্ত্রণ আর সান্ধ্যকালীন মধ্যপানই তাদের মূল সামরিক দর্শন থেকে যায়।

সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা ও পুনর্বাসিত সদস্যদের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা না গেলেও ভেতরে ভেতরে যে এ ধরনের একটা ব্যাপার রয়েছে তা ঠিক। যুদ্ধে অংশগ্রহণ অনেকেরই নীতিগত অবস্থান বদলে দেয়, অন্যদিকে স্বাধীনতার দু বছর পর পাকিস্তানের সেনাছাউনি থেকে যারা দেশে ফেরেন তাদের ধ্যানধারণা ও চিন্তা-ভাবনা সেই পাকিস্তানি আমলের অফিসারগিরির দিনগুলো থেকে খুব কমই পরিবর্তিত হয়েছিল। ফিরে আসার পর '৭৬ সালে এই পুনর্বাসিত চক্র তিন বছর ধরে গোপনে লালন করা তাদের ইসলামী রক্ষণশীলতা আর পুরোনো নীতিগত অবস্থান নগ্নভাবে প্রকাশ করেন। জিয়া যেহেতু তাহের আর জাসদের নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীর বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধা অংশ

থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, বাধ্য হয়ে নিজের গদি পাকাপোক্ত করার আশায় তাকে আরো বেশি করে এই রক্ষণশীল অংশের প্রতিই নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। এক সময় জিয়া প্রকাশ্যে এদের নিয়ে উপহাস করে বলেছিলেন, 'লেট-লতিফ' জাতীয়তাবাদী। আজ তিনিই তন্ময় হয়ে তাহেরকে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য এদের দাবি শুনতে থাকলেন।

অন্যদিকে এন. এস. আই. আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তাহেরের বিচারের জন্য চাপ আসতে থাকে। জিয়ার বামপন্থী বন্ধুর একটা বিচার হোক, তাহলেই বোঝা যাবে জিয়ার আনুগত্য আসলে কোন দিকে। এই সময়ে এ দু' সংস্থার নেতৃত্বে ছিলেন যথাক্রমে এ. এম. এস. সফদার ও সালাউদ্দিন আহমেদ। এরা দু'জনেই আয়ুব আমলের জ্যেষ্ঠতম গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা কর্মকর্তা। মুজিবের হত্যাকাণ্ডের ঠিক পরপরই এরা তাদের বর্তমান অবস্থানে আসেন। এই সব হঠাৎ করে পুনর্বাসিত পেশাজীবীদের অনেকেই '৭১ সালে পাকিস্তানিদের সাথে প্রত্যক্ষ সহযোগিতার দায়ে অভিযুক্ত। এই দলটাই বিচার অনুষ্ঠানের জন্য জিয়াকে বেশি চাপ দেয়। অবশেষে জিয়া বিচার করতে রাজি হলেন। ইসলাম পছন্দ ডানপন্থীদের কথাই শুনতে হলো। জিয়া বুঝতে পেরেছিলেন যে তার এই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া দরকার। সেনাবাহিনীতে জিয়ার প্রতি যে আনুগত্য ছিল তাকে ঠিকমতো তাহেরই রুখে দিতে পারতেন।

'৭৬-এর ২২ শে মে তাহেরকে আবারো হেলিকপ্টারে করে রাজশাহী থেকে ঢাকায় আনা হলো। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে তাহেরকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিঃসঙ্গ ও অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হয়। এমনকি সংবাদপত্রের লোকজনও জানতে পারলেন না কি হতে যাচ্ছে। ১৫ই জুন একটি সরকারি ঘোষণায় জানা যায় যে ১নং বিশেষ সামরিক আদালত গঠন করা হয়েছে। এর চেয়ারম্যান হচ্ছেন একজন কর্নেল। ইউসুফ হায়দার। ইনি একাত্তরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। একজন পুনর্বাসিত অফিসার। আবার রক্ষণশীলও বটে। কার বিচার হবে তার কোন উল্লেখই ছিল না। তবে যেই ব্রিটিশ আইনের উল্লেখ করা হয় তা বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার আওতায় পড়ে। ট্রাইবুন্যাল গঠিত হবার কয়েক দিনের মধ্যেই দ্য বাংলাদেশ টাইমস্ পেছনের পাতায় ছোট্ট করে একটা আইন বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে, এতে এগারো জন লোককে একুশে জুন-এর মধ্যে ট্রাইবুন্যাল-এর সামনে হাজির হতে আদেশ দেয়া হয়, অন্যথায় আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার পরিচালিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়। এই এগারো জনের মধ্যে প্রথম জন ছিলেন জাসদের অন্যতম নেতা সিরাজুল আলম খান। বাকি দশ জনের মধ্যে সাত জনই ছিলেন প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য।

ঢাকার প্রধান বাংলা দৈনিক ইত্তেফাক একটু সাহস করে অঘোষিত নিউজ—ব্ল্যাকআউটের বিরুদ্ধে যেয়ে 'ষড়যন্ত্র মামলার শুরু?' এই শিরোনামে শেষ পৃষ্ঠায় এক ইঞ্চির একটি সংবাদ প্রকাশ করে। ইত্তেফাক সম্পাদক আনোয়ার হোসেনকে সেনাসদনে জরুরি তলব করা হয়। তাকে সাবধান করে দেয়া হয় যে ভবিষ্যতে এই ধরনের কাজ করলে তাকে গ্রেফতার করা হবে। কি হতে যাচ্ছে তা যারা বোঝার এ খবর থেকে ঠিকই বুঝে নিয়েছিলেন।

বর্তমান লেখক মে মাসের শেষ দিকে ঢাকায় পৌছান বাংলাদেশের চলমান সংকট সম্বন্ধে রিপোর্ট করার জন্য। ইতিমধ্যে ভারত ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে গঙ্গার স্রোত ঘুরিয়ে দেয়ায় বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। বাংলাদেশে আসার কিছু দিন পরই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেনাবাহিনী আর জাসদের পরিচিত সূত্র থেকে জানতে পারি '৬৯-এ শেখ মুজিবের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পর দ্বিতীয় চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক মামলার শুরু হতে যাচ্ছে।

তাহের ছাড়া আরও তেত্রিশ জনকে বিচারের জন্য তলব করা হয়। এর মধ্যে সেনাবাহিনীর বাইশ জন সদস্য ছিল। বেসামরিক আসামীদের সবাই ছিলেন কারান্তরীণ জাসদ নেতৃবৃন্দ। এদের মধ্যে ছিলেন—জাসদ সভাপতি এম. এ. জলিল, সাধারণ সম্পাক আ. স. ম. আবদুর রব, কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু, শ্রমিক লীগের সভাপতি মোহাম্মদ শাহ্জাহান, ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মান্না, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আখলাকুর রহমান এবং ইংরেজি সাপ্তাহিক ওয়েভ-এর সম্পাদক কে. বি. এম. মাহমুদ।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের উঁচু হলদে দেয়ালের ভেতর একুশে জুন বিচার শুরু হয়। এদেশের ইতিহাসে এর আগে আর কখনো কোন মামলা এভাবে জেলের ভেতরে অনুষ্ঠিত হয় নি। দেশের ভেতরে এই বিচারের খবর সম্বন্ধে পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। আসামী পক্ষের উকিলদের সবাইকে বিচারের কার্যবিবরণী গোপন রাখার ব্যাপারে শপথ নিতে হয়। কারাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল অভূতপূর্ব; প্রতিটি প্রবেশ পথে বালুর বস্তার পেছনে আড়াল নিয়ে সদাপ্রস্তুত সেনা। মনে করা হয় কোর্টে যাবার পথে যদি গোলমাল বাধে সেই ভয়েই কর্তৃপক্ষ বিচারটা জেলের ভেতরেই করার সিদ্ধান্ত নেন।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের লোহার দরজাগুলো খুলে গেল। মামলার প্রথম দিনে মামলার পোশাকে সজ্জিত ত্রিশ জন ব্যারিস্টার ভেতরে ঢুকলেন। বন্ধ হয়ে গেল ভারী প্রবেশ দ্বার। সেদিন নিয়তি বড়ো নিষ্ঠুর পরিহাস করেছিল। এমন এক সময়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের অভিযোগ আনা হলো যখন অস্ত্রের মুখে এবং শুধু অস্ত্রের মুখে পরপর তিনবার সরকার পরিবর্তন হয়েছে। উপরন্তু খালেদ মোশারফের সহযোগী অফিসাররা যারা তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থানে জড়িত ছিলেন, যাদের সরকারিভাবে 'ভারতীয় চর' বলে অভিযোগ করা হয়েছিল তাদের অনেককেই ইতিমধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার সাফায়াত জামিল। অথচ যখন তারা চার দিনের জন্য ক্ষমতায় এসেছিলেন তখন খালেদ মোশাররফ ও তার প্রধান সহযোগী এই সাফায়াত জামির মিলে জিয়াকে গৃহবন্দী করেছিলেন। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে যারা তিন তারিখের জিয়া বিরোধী অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত ছিলেন তারাই ছাড়া পেলেন আর যারা সাত তারিখে সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জিয়াকে মুক্ত করেছিলেন তাদের-ই জীবন নিয়ে দাঁড়াতে হলো আসামীর কাঠগড়ায়।

একুশে জুন ট্রাইবুন্যালের প্রথম অধিবেশনের পর এক সপ্তাহের বিরতি দেয়া হয়। সরকার পক্ষের যে মামলা সাজাতে ছয় মাস সময় লেগেছিল সেই মামলায় আত্মপক্ষ

সমর্থন করতে বিবাদী উকিলদের সময় দেয়া হলো মাত্র এক সপ্তাহ। অন্তরীণ থাকাকালীন সময়ে অভিযুক্তরা আত্মীয় পরিজনদের সাথে দেখা করার ও আইনগত পরামর্শ পাবার সুযোগ প্রার্থনা করেন—যা সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হয়। ট্রাইবুন্যালের কাজ শুরু হবার পরপরই এই সংবাদদাতা হংকং-এ ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ, বি. বি. সি. ও দি গার্ডিয়ান (লন্ডন)-এ খবর পাঠান। সেন্সরশীপ-এর জন্য ঢাকা থেকে এই রিপোর্টগুলো সরাসরি পাঠানো সম্ভব হয় নি। ব্যাংককযাত্রী জনৈক ব্যক্তি তাঁর সাথে করে রিপোর্ট নিয়ে যান ও পরে থাইল্যান্ড থেকে তা' সরাসরি পাঠানো হয়। এভাবেই ঢাকাবাসীরা এই মামলার ব্যাপারে প্রথম সংবাদ পান বি. বি. সি.—বাংলা বিভাগের মাধ্যমে।

এই সংবাদদাতা চুয়াত্তর সালের গোটা এক বছর ধরেই বাংলাদেশ থেকে রিপোর্ট করে আসছেন। আঠাশে জুন আবারো মামলার হোল শুরু। সেদিন আমি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে। প্রধান প্রসেকিউটর এ. টি. এম. আফজাল আর ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান কর্নেল ইউসুফ হায়দার-সহ অন্যদের ছবি তুলছি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তারা আমাকে বাধা দিলেন। আমাকে বলা হোল এই বিচারানুষ্ঠানের কার্যবিবরণী রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার অন্তর্গত এবং আমি কোন কিছুরই ছবি তুলতে পারব না। আমি তখন বললাম এক বছরের বেশি সময় ধরে আমি বাংলাদেশে কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু এই ধরনের কোন নিয়মের কথা তো কখনো শুনি নি। আমি এরপর বেশ জোর দিয়েই বললাম যে তাদের যদি ইচ্ছা থাকে আমাকে এই মামলার ছবি তোলা ও এর রিপোর্ট করা থেকে নিবৃত্ত করবার তাহলে অবশ্যই তথ্য মন্ত্রণালয়ের লিখিত নির্দেশ দেখাতে হবে। অন্যথায় আমি আমার সাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করে যাব। আমি তখন আমাকে যে পুলিশ অফিসার প্রশ্ন করছিলেন তার ছবি তুলতে যাই। ভদ্রলোক হাত দিয়ে মুখ ঢেকে দৌড়ে সরে যান।

এরপর সেদিনের বিরতির জন্য আমি কারগারের গেটের সামনে দুঘণ্টা ধরে একা একা অপেক্ষা করতে থাকি। কেন এই বিচার এত গোপনীয়তার মধ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সে সম্বন্ধে সরকারি বক্তব্যের জন্য আমি ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যানের কাছ থেকে কিছু শোনার আশায় ছিলাম। কিন্তু সেদিন এগারোটার সময় আমাকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ করা হয়। আমি যে ছবিগুলো তুলেছিলাম তার ফিল্ম আমাকে ফিরিয়ে দিতে বলা হয়। আমাকে অন্তরীণকারী ফেলটেন্যান্ট ও পুলিশ কর্মকর্তাদের আমি সরাসরি জানিয়ে দেই যে স্বেচ্ছায় আমি ফিল্ম ফিরিয়ে দেব না। এরা তখনই জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা—এন. এস. আই. ও সামরিক আইন সদরে টেলিফোন করেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই ঘটনা মিটমাটের জন্য দশজন অফিসার এসে হাজির হয়।

শামিম আহ্‌মেদ নামে পরিচয়দানকারী এন. এস. আই. এর একজন কর্মকর্তা আমার কাছে জানতে চান কেন আমি তাহেরের এই মামলার ব্যাপারে এত উৎসাহী? আমি তখন বললাম যে গোপন রাজনৈতিক বিচার তা স্ট্যালিন, ফ্রাঙ্কো বা জিয়া যে-ই করুন না কেন আমাকে সমান উৎসাহী করে তোলে। আমি আরো বললাম মুজিবের

হত্যাকারী ছয়জন মেজরকে ধরে যদি আজ খালেদ মোশাররফ কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে বিচারে বসাতেন কিংবা খালেদ আজ জীবিত থাকলে জিয়া যদি তাঁকে বিচারে আনতেন তাহলেও আমি একইভাবে আমার কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসতাম। জিয়া তাহেরকে এমন এক বিচার অনুষ্ঠানে উপস্থিত করেছেন যেখানে ভীত উকিলদের গোপনীয়তার ব্যাপারে শপথ নিতে বাধ্য করা হচ্ছে, কাজেই সাংবাদিক হিসেবে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেই যাবো; আমি বুঝতে পারি না সাধারণ মানুষের এসব ঘটনা জানতে অসুবিধা কোথায়। এ সময় শামিম আমার কাছ থেকে ক্যামেরাটা কেড়ে নিয়ে একজন টেলেকম্যুনিকেশন অফিসারের হাতে দেয়। আমেরিকান অফিস অফ পাবলিক সেফটি প্রোগ্রামের অধীনে এই অফিসারটি কয়েক বছর আগেই নিউইয়র্কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে এসেছেন। এই যুবক তখন ক্যামেরা থেকে ফিল্ম খুলে ফেলে দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে সামরিক আইন সদর দপ্তর থেকে একটা টেলিফোন আসে। একজন আর্মি মেজর বললেন যে সরকারের পক্ষে একজন বিদেশি সংবাদাতাকে আটকে রাখাটা কিছুটা বিব্রতকর হতে পারে। সেদিন সন্ধ্যায় আমি এই বিচারানুষ্ঠান সম্বন্ধে তারের মাধ্যমে আরেকটি সংবাদ পাঠাই। তার অফিস আমার সংবাদটা গ্রহণ করেছিল ঠিকই কিন্তু সেটি আর পাঠানো হয় নি। পরদিন সন্ধ্যাবেলায় আমি বাসায় ফিরে এসে পাঁচজন স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসারকে অপেক্ষারত দেখতে পেলাম, তাঁরা জানালেন আমাকে আবারো গ্রেফতার করা হচ্ছে। তাদের কাছে নির্দেশ ছিল আমাকে যেন সরাসরি বিমানবন্দরে নিয়ে প্রথম ফ্লাইটে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তী ফ্লাইটটির গন্তব্যস্থল ছিল ভারত। ভারত থেকে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার আমলে আমাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।[৫২] তখন ভারতে কড়া সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়েছিল। বিদেশি সাংবাদিকরা কেউই তা মেনে চলতে উৎসাহী ছিলেন না। কাজেই আমিই একমাত্র সাংবাদিক নই যাকে ভারত থেকে বহিষ্কার করে সম্মানিত করা হয়েছিল। বহিষ্কৃতদের তালিকায় আমি ছিলাম শেষ ব্যক্তি মাত্র। আমি স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকদের বুঝাতে চেষ্টা করলাম যে ভারত থেকে ইতিমধ্যেই একবার বহিষ্কৃত হবার কারণে তারা আমাকে আর সেদেশে পাঠাতে পারেন না। শেষমেষ আমেরিকান দূতাবাসের হস্তক্ষেপের ফলে আমাকে ব্যাঙ্ককের জন্য পরবর্তী ফ্লাইট না পাওয়া পর্যন্ত তিনদিন গৃহবন্দী করে রাখা হয়। পহেলা জুলাইতে আমাকে থাইল্যান্ডে ডিপোর্ট করা হয়। তাহেরের বিচার অনুষ্ঠানের ওপর এটাই ছিল শেষ স্থানীয় ও বৈদেশিক সংবাদ সূত্র। এটিও বন্ধ হয়ে গেল। কর্তৃপক্ষ এবারে আঁটসাঁট গোপনীয়তার মধ্যে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন।

এরপরে আরো সতের দিন ধরে বিচার চলে। তাহের প্রথমদিকে এই ট্রাইবুন্যালকে 'বিচারের নামে প্রহসন করার সরকারি ফায়দা' বলে অভিষিক্ত করে বিচার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে অস্বীকৃতি জানান। তাহের আরো দাবি করেন যে তাঁর বিচার করতে হলে সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের মধ্য থেকে বিচারকদের প্যানেল গঠন করতে হবে। ইউসুফ হায়দার এর মতো লোকেরা যারা মুক্তিযুদ্ধে কোন অংশই নেয় নি তাদের

দিয়ে বিচার করা চলবে না। কিন্তু পরে ট্রাইবুন্যাল গঠিত হলে কোন মুক্তিযোদ্ধা অফিসার এতে যোগ দিলেন না। তাহেরের উকিলেরা অবশ্য শেষে তাঁকে ট্রাইবুন্যালের সামনে উপস্থিত হতে রাজি করান। প্রাথমিকভাবে তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন যে বিচার অনুষ্ঠান কোন রকম জোর-জবরদস্তি বা প্রভাব ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হবে। পরে তাঁরা যখন জানতে পারলেন যে ট্রাইবুন্যালের কাজ শুরু হওয়ার আগেই তাহেরের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল তখন আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই তাঁদের করার ছিল না। ১৭ই জুলাই ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান ইউসুফ হায়দার বিচারের রায় ঘোষণা করেন—তাহেরের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ দেয়া হলো।

পরদিন সরকারি নির্দেশবলে সংবাদপত্রগুলোতে বিচারের ওপর সরকারি বক্তব্যই শুধু প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজার্ভার-এর শিরোনাম ছিল—'তাহের টু ডাই।' মামলার ওপর বাংলাদেশি প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত ওটাই ছিল একমাত্র খবর। বিচার শেষে ওই খবর যেন ছিল নিয়তির বিধান।

প্রেসিডেন্ট সায়েমের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আপিল করা হলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। সায়েম সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। পাঁচ বছর আগে সায়েম গুরুশাস্তি ও সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বিবাদীর অধিকারের ওপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইনগত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন। পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল নামে জনৈক ব্যক্তির ওপর আরোপিত মৃত্যুদণ্ডাদেশ তিনি খারিজ করে দেন। আইনগত সিদ্ধান্তের উদাহরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এর যে তাৎপর্য তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিরান্ডা ডিসিশানের সাথে তুলনীয়। সায়েম এই যুক্তি দেখান যে 'একেবারে শেষমুহূর্তে বিবাদী পক্ষের উকিল নিয়োজিত হওয়ায় মামলায় সঙ্গতভাবে সমর্থিত হবার ব্যাপারে বিবাদীর অধিকার সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে।' সায়েম লিখেছিলেন—

> ফৌজদারি নিয়মের বিধি অনুযায়ী ফৌজদারি আদালতে আনীত একজন বিবাদীর পূর্ণ অধিকার রয়েছে একজন আইনজ্ঞের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থন করবার। ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার জন্য আইনজ্ঞের সাথে সাক্ষাৎ ও আইনজ্ঞকে তাঁর কেস সাজাবার জন্য উপযুক্ত সময় দেয়াও এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। গুরু অপরাধে অভিযুক্ত একজন অপরাধীর জন্য একেবারে শেষমুহূর্তে একজন উকিল নিয়োগ **লিগ্যাল রিমেমব্রেন্স ম্যানুয়াল (১৯৬০)**-এর দ্বাদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অধিকারকে শুধু লংঘনই করেনা, সেইসাথে এর মাধ্যমে দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত উদার সুবিধাসমূহের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থকরে দেয়া হয়। এর মাধ্যমে ফৌজদারি বিধির ৩৪০-তম সেকশনে বর্ণিত অধিকার থেকেও অভিযুক্তকে বঞ্চিত করা হয়।... কাজেই এরকম একটি বিচারানুষ্ঠান সঠিক আইনসিদ্ধ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয় নি বলে ধরতে হবে এবং সেক্ষেত্রে নতুন বিচারের প্রয়োজন।[৫৩]

তাহেরের বিরুদ্ধে মামলার শুনানি শুরু না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে কোন উকিলের পরামর্শ নিতে দেয়া হয় নি। অথচ সায়েম যিনি বিচারপতি থাকাকালীন সময়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন, পর্যাপ্তভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে আইনের নামে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না, তিনিই দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও তাহেরের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখলেন। তাহেরের মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার এক দিনের মধ্যেই সায়েম তার সিদ্ধান্ত নেন।

প্রধান অভিযোগকারী কর্মকর্তা এ. টি. এম. আফজালকে এই বিচারের পর ঢাকা হাইকোর্টে বিচারপতির পদ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। মামলার রায় নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত জনাব আফজাল তাঁর সহকর্মীদের কাছে দাবি করেন যে, মৃত্যুদণ্ডের রায় শুনে তিনি নিজেই সবচেয়ে বেশি অবাক হন। তিনি আরো দাবি করেন যে একজন প্রসেকিউটর হিসেবে তিনি কখনো মৃত্যুদণ্ড দাবি করেন নি। তাঁর মতে এরকম একটা সিদ্ধান্ত ছিল সম্পূর্ণ অবাস্তব। তাহেরকে যে অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় তার জন্য তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া সম্ভব ছিল না—দেশে সে ধরনের কোন আইন-ই ছিল না। তাহেরের ফাঁসির আদেশ কার্যকর করার দশ দিন পর আইন মন্ত্রণালয় এই আইনগত অসঙ্গতি দূর করে।[৫৪] একত্রিশে জুলাই আইন মন্ত্রণালয় সামরিক আইনের ২০তম সংশোধনী ধারা জারি করে, এর মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষাবাহিনীতে 'কোন ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার'-এর অপরাধের শাস্তি ঘোষণা করা হয় মৃত্যুদণ্ড।

লন্ডন থেকে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর প্রধান কার্যালয় থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কাছে জরুরি আপিল করা হয় তাহেরকে ক্ষমার জন্য—

> সামরিক আইনের আওতায় জেলের ভেতরে গোপনে অনুষ্ঠিত একটি বিচার জাতিসংঘ ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকারের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানের পর্যায়ে পড়ে না। সর্বোচ্চ আইনগত কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করার অধিকারসহ ফৌজদারি আদালতে আইনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করা যেতে পারে।

এই ছিল অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের পাঠানো তারবার্তার বিবরণ। এঁরা তাহের ও অন্য জাসদ নেতাদের জন্য নতুন করে বিচার অনুষ্ঠানের দাবি জানান। বিশে জুলাই সায়েমের কাছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর আপিল পৌঁছায়।

পরদিন একুশে জুলাই।

সময়—ভোর চারটা।

আবু তাহেরকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারগারের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো।

কিশোরগঞ্জ
১৮ই আগস্ট, ১৯৭৬

শ্রদ্ধেয় বড়ো ভাইজান,

আপনাকে যে কি লিখব তার কিছুই ঠিক করতে পারছি না। আমি ভাবতেও পারি না তাহের আর আমার সাথে নেই। আমার জীবন সঙ্গীকে ছাড়া বাঁচার কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না। মনে হচ্ছে বাচ্চারা খুব কষ্ট পাচ্ছে। এতো ছোট বাচ্চা, কিছুই বুঝতে পারে না। নীতু বলে—'বাবা, কেন তুমি মরলে, তুমি আমাদের সাথে থাকলে এখনো বেঁচে থাকতে।' ওরা বুঝতেও পারেনা ওরা কি হারালো। প্রতিদিন ওরা ফুল নিয়ে কবরে যায়। কবরের ওপর ফুল রেখে ওরা প্রার্থনা করে 'আমি যেন বাবার মতো হতে পারি।' যীশু বলে ওর বাবা চাঁদের দেশে ঘুমিয়ে আছে।

দুর্ভাগ্যবশত নীতু ওর বাবাকে সেই নভেম্বরে শেষ দেখে। কিশোরগঞ্জে থাকায় পরে আর দেখতে পায় নি। আমি খুবই ভাগ্যবতী। তাহের আমাকে যে পথ দেখিয়ে গেছে তা-ই আমার আসল অস্ত্র। বেঁচে থাকতে সে আমাকে বাঙালি নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সম্মান দিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে আমি সারা পৃথিবীর শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছি। আমার সব আশাই এত কম সময়ে সে পূর্ণ করে গেল! তাহেরের বন্ধু ও সহকর্মীরা যখন আমাকে সহানুভূতি জানায়, মনে হয় তাহের এখনো এদের মধ্যে বেঁচে রয়েছে, চিরদিন বেঁচে থাকবে। এরা আমার আপন জনের মতো। আমি সত্যিই গর্বিত, সে মৃত্যুকে পরাজিত করেছে। মৃত্যু তাঁকে কখনো মলিন করতে পারবে না। এখানে যা ঘটেছে তার সবই আমি বর্ণনা করব—

১৭ই জুলাই শনিবার তিনটার সময় তাহেরর মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করা হয়। আমাদের পক্ষের পঁচিশজন ব্যারিস্টারসহ আমরা সবাই নির্বাক হয়ে গেলাম। সারাদেশের লোক ক্ষেপে গিয়েছিল তার কারণ সরকার পক্ষ কিছুই প্রমাণ করতে পারে নি। এমনকি সরকারি সাক্ষীরাও ৭ই নভেম্বরের অভ্যুত্থানে তাহেরের অবদানের কথা স্বীকার করে। আতাউর রহমান, জুলমত আলীর মতো বিশিষ্ট ব্যারিস্টার, আলম আর অন্যরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা রাষ্ট্রপতির কাছে যেয়ে এই বেআইনি ট্রাইবুন্যালের বিরুদ্ধে চরম নিন্দা প্রকাশ করে। তাহের তখন ব্যারিস্টারদের বললো—'এই সেই সরকার যাকে আমি ক্ষমতায় বসিয়েছি, এদের কাছে আপনারা কিছুই চাইবেন না।' মৃত্যুদণ্ডের রায় শুনে তাহের অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিল। অন্যসব বন্দী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তাহের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো—'জীবন যদি এভাবে বিসর্জন না দেয়া যায়, সাধারণ মানুষের মুক্তি তাহলে আর কিভাবে আসবে?' আমরা তাহেরকে বাঁচানোর সব রকম চেষ্টাই করেছিলাম। তাহের অবশ্য আমাকে লিখেছিল—'তোমার মাথা নত কোরোনা, আমি মরণকে ভয় পাই না। তুমি যদি গর্ব অনুভব করতে পারো তাতেই যথেষ্ট।'

১৯ তারিখ বিকালে তাহের আমাদের সবার সাথে দেখা করে। সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও উৎফুল্ল ছিল। রায় দেয়ার পর সে যা লিখেছিল আমাদের তা পড়ে শোনায়। পরে আমাকে বলে—'তোমার শোক করা সাজে না, ক্ষুদিরামের পর দক্ষিণ এশিয়ায় আমিই

প্রথম ব্যক্তি যে এভাবে মরতে যাচ্ছি।' আর সবাই আমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেছে সেকথা তাহেরকে বললে সে বললো 'সে-কি জীবনের মায়া ফিরিয়ে আনার জন্য? আমার জীবনের দাম কি জিয়া অথবা সায়েমের জীবনের চেয়েও কম?'

সে আমাদের এত উদ্দীপনা দিয়েছিল যে আমরা সবাই হাসিমুখে বের হয়ে এসেছিলাম; তখনো কেউ জানতাম যে এটাই আমাদের শেষ দেখা। দেশের সমস্ত শিক্ষক, রাজনীতিবিদ এমনকি বিদেশিরা পর্যন্ত সরকারের কাছে অনুরোধ করে তাহেরের মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্য, কিন্তু তাহেরকে বাঁচতে দেয়ার মতো সাহস কর্তৃপক্ষের ছিল না। এরা তাই তাহেরকে সময়ের সীমানা ছাড়িয়ে অসীমের সন্ধান দিয়েছে, তাঁকে অমরত্বের সুধা দিয়েছে।

ইউসুফ, বেলাল, মনু—তাহেরের সব ভাই-ই তাঁর সাথে ছিল। বিশ তারিখ সন্ধ্যায় তাহেরকে জানিয়ে দেখা হয় যে পরদিন ভোর চারটায় তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। সে শান্তভাবে এই খবর গ্রহণ করে ও যাদের ওপর এই খবর দেয়ার দায়িত্ব পড়েছিল তাদের ধন্যবাদ জানায়। এরপর সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় রাত্রির খাবার খেয়ে নেয়। পরে একজন মৌলভী এসে কৃত অপরাধের জন্য তাহেরকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে অনুরোধ জানান। সে তখন বলে ওঠে—'আপনাদের সমাজের কালিমা আমাকে কখনো স্পর্শ করতে পারে নি। কখনো না। আমি সম্পূর্ণ শুদ্ধ। আপনি এখন যান, আমি এখন ঘুমোবো।' সে এরপর শান্তভাবে ঘুমোতে যায়। রাত তিনটার দিকে তাঁকে ডেকে ওঠানো হয়। কতক্ষণ সময় আছে জানার পর তাহের দাঁত মাজে, সেভ করে ও গোসল করে নেয়। উপস্থিত সবাই তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। 'আমার নিষ্পাপ শরীরে তোমাদের স্পর্শ লাগুক আমি তা' চাই না' এইবলে তাহের তাদের নিবৃত্ত করে।

গোসল করার পর তাহের তাঁর জন্য চা করতে ও আমাদের দিয়ে আসা আম কেটে দিতে বলে। নিজে নিজেই সে নকল পা, জুতো আর প্যান্ট পরে নেয়। হাত ঘড়ি পরে, একটা ভালা সার্ট গায় দিয়ে তাহের তার চুলগুলো ভালভাবে আঁচড়ে নেয়। এরপর সে আম আর চা খেয়ে নিয়ে সবার সাথে মিলে সিগারেট খেতে থাকে। একজন মৃত্যুদণ্ড-প্রাপ্ত লোকের এ রকম সাহস দেখে সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ে। তাহের তখন সবাইকে সান্ত্বনা জানায়—'আপনারা হাসুন, সবাই এত বিষণ্ন কেন? আমি দুর্দশাগ্রস্তদের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলাম। মৃত্যু আমাকে পরাজিত করতে পারবে না।' তাহেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁর কোন শেষ ইচ্ছা আছে কি-না, তাহের জবাবে চায়—আমার মৃত্যুর বিনিময়ে এ দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে শান্তি।'

এরপর তাহের জানতে চায়—'আর কোন সময় বাকি আছে কি-না?' অল্পকিছু সময় বাকি আছে জানার পর তাহের সবার সামনে একটা কবিতা আবৃত্তিকরতে চায়। তাহের এরপর তাঁর কর্তব্য ও অনুভূতি নিয়ে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে। এরপর তাহের জানায়—'আমি এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তোমরা এখন তোমাদের কর্তব্য পালন করতে পারো।' তাহের ফাঁসি-কাঠের দিকে এগিয়ে যায়। নিজেই ফাঁসির দড়ি তুলে নেয়। গলায় রশি পড়ে নেয়ার পর তাহের বলে ওঠে—'বিদায় দেশবাসী। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক।' তাহের তখন তাদের বোতাম টিপতে বলে। কিন্তু কেউই সামনে এগিয়ে এলো না। তাহের তখন এদের বিদ্রূপ করে বলে উঠে—'তোমাদের কি এই সাহসটুকু-ও নেই?' তখনি কেউ বোতাম টিপে দেয়—সব শেষ। তাঁর ভাইদের পরে মৃতদেহ দেখানো হয়।

সেদিন জেলখানার সাড়ে সাত হাজার বন্দীর কেউই দুপুরে ভাত খায় নি। আমাদেরকে দুপুর আড়াইটার সময় মৃতদেহ দেয়া হয়। কড়া নিরাপত্তা প্রহরার মধ্যে জেলের ভেতরে একটা গাড়ি নিয়ে গিয়ে তাতে মৃতদেহ তুলে দেয়া হয়। এরপর হেলিপ্যাড পর্যন্ত পাঁচটা ট্রাক-বাস ভর্তি নিরাপত্তা প্রহরীদের পাহারার মধ্যে মৃতদেহ একটা হেলিকপ্টারে তুলে দেয়া হয়। সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় পারিবারিক গোরস্তানে তাহেরকে কবর দেয়া হয়।

একটা বিশেষ ছাউনী তুলে সামরিক প্রহরীরা একুশ দিন পর্যন্ত তাঁর কবর পাহারা দিয়েছে; এরা এমনকি একজন মৃত লোককেও ভয় পায়। সে আমাদের মাঝ থেকে চলে গেলেও আমাদের জন্য রেখে গেছে এক মূল্যবান উত্তরাধিকার। মানুষের প্রতি তাঁর মহান কর্তব্য পালন করতে যেয়ে তাকে শেষে বিষ আর মধু—এ দুটোর সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল। নিজে বিষ গ্রহণ করে আমাদের জন্য সে রেখে গেছে মধুময় অমৃত। যেদিকে তাকাই চারদিকে শুধু অন্ধকার দেখি। কি করব তার কিছুই বুঝতে পারি না। মনে হয় সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছি। তবুও আমি জানি আমার এই দুর্দশা চিরকাল থাকবে না। এর শেষ আসবেই আসবে। তাহেরের আদর্শ সবার আদর্শে পরিণত হয়েছে; তা দেখতে পেলেই আমি শান্তি পাব। শুধু দুঃখ এই যে সেই সুখের দিনে তাহের সেখানে থাকবে না।

—স্নেহের লুৎফা

[এটা মিসেস লুৎফা তাহেবের লেখা মূল চিঠি নয়। ইংরেজি অনুবাদের পুনঃঅনূদিত পাঠ্য। অনিবার্য কারণে মূল চিঠি না পাওয়ায় অনূদিত পাঠ প্রকাশ করতে হলো। সে জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এই চিঠির প্রাপক হচ্ছেন মিসেস লুৎফা তাহেরের অগ্রজ ড. রফি আহমেদ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন পদার্থবিদ ও যুক্তরাজ্য প্রবাসী। —অনুবাদক]

ইতিহাস আমাকে মুক্তি দেবে,

সম্মানিত ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ, এখানে আজ এক অভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সামনে এমন এক শাসকশ্রেণী যারা একজন অভিযুক্তকে কোর্টের সামনে পর্যন্ত নিতে ভয় পায়। এই রক্তপিপাসু, সন্ত্রাসী শাসকগোষ্ঠী একজন প্রতিরোধহীন, নিরস্ত্র, নিঃসঙ্গ, অপবাদজর্জিত মানুষের বিবেকের বিশ্বাসের সামনে পরাজিত হবার ভয়ে সেঁটিয়ে গিয়েছে। এভাবেই আমাকে আর সবকিছু থেকে বঞ্চিত করার পর এরা আমাকে শেষে বঞ্চিত করলো সেই মামলায় সঠিক বিচার পাবার অধিকার থেকে যাতে আমিই প্রধান অভিযুক্ত।

মাত্র একজন অভিযুক্ত লোকের গলা শুনতে ভয় পায় যেই শাসকেরা না জানি কত সাংঘাতিক অপরাধ-ই না তারা করেছে। শাসকশ্রেণীর বদমায়েশি আর বিচারকদের দুর্বলতার ফলে সৃষ্ট অসংখ্য দুর্বোধ্য ও দুষ্ট চক্রান্তের পরিণতিতে আজ নিজেকে আমি বেসামরিক হাসপাতালের এই ছোট্ট কামরায় আবিষ্কার করলাম—এখানে আমাকে গোপনে বিচার করার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে, যাতে করে আমার কথাগুলো শ্বাসরুদ্ধ করে রাখা যায় আর লোকজন কেউই আমার কথা জানতে না পারে। এই যদি হবে তাহলে ঐ জমকালো বিচারভবনের কি দরকার ছিল যেখানে বিচার করাটা নিঃসন্দেহে সম্মানিত ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য হতো অনেক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপার। আমি আপনাদের সাবধান করে দিতে চাই, এভাবে চারদিকে বেয়নেট সজ্জিত প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় হাসপাতালের কক্ষ থেকে বিচার বাণী প্রয়োগ করা মোটেই নিরাপদ না। সাধারণ নাগরিক হয়তো মনে করবে আমাদের আইন-কানুন একেবারেই দুর্বল আর বন্দী...

একটা কথা আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, যদিও কার্য বিবরণী ধারা অনুযায়ী বিচার 'প্রকাশ্য ও স্পষ্ট' হওয়াটাই নিয়ম, কোর্টের এই সেশনে যোগ দানের অধিকার থেকে জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। এখানে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত বেসামরিক লোকজন হচ্ছেন শুধু দুজন অ্যাটর্নি আর ছয়জন রিপোর্টার, সেন্সরশীপের বদান্যতায় যাদের আবার একটা শব্দও প্রকাশের ক্ষমতা থাকবে না। আমার শ্রোতা হিসেবে এই চেম্বার আর করিডর ভর্তি আমি শুধু প্রায় একশ' জন সৈনিক আর অফিসার দেখতে পাচ্ছি। এদের ভদ্র ও ভাগগম্ভীর মনোযোগের জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। আমার আফসোস হয়, যদি গোটা সেনাবাহিনীটাই এভাবে আমার সামনে পেতাম। আমি জানি, নিশ্চিত জানি একদিন এই সেনাবাহিনী আজকের ক্ষমতালোভী বর্বর শাসক শ্রেণী কর্তৃক তাদের উর্দিতে ছড়িয়ে দেয়া লজ্জাকর রক্তের দাগগুলো মুছে ফেলার জন্য রাগে ফুঁসে উঠবে। সেদিন, আহ্ এইসব সরল সেনাদের ঘাড়ের ওপর অন্ধ ঔদ্ধত্য নিয়ে চেপে বসা এই লোকদের জন্য কি পতন-ই না অপেক্ষা করছে। অবশ্য, যদি ইতিমধ্যেই জনগণ এদের টেনে নামিয়ে না থাকে।

ফিডেল ক্যাস্ট্রো, ১৯৫৩

তথ্যসূচি

১. ১৮ই জুলাই, ১৯৭৬ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে লেখা তাঁর শেষ চিঠিতে তাহের অভিযোগ করেন—'পুরো বিচার চলাকালীন সময় কাদেরিয়া বাহিনীর কোন উল্লেখ করা হয় নি।' অবশ্য রায় দেবার পরদিনই এই মামলার ওপর বাংলাদেশ অবজারভার ও অন্যান্য বাংলাদেশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত একমাত্র খবরে বলা হয় যে, সরকার দাবি করেন কাদেরিয়া বাহিনীর সাথে তাহেরের গোপন ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। তাহের তাঁর জবানবন্দীতে এদের নিন্দা করেছেন, যারা পঁচাত্তর সালে—'ভারতে পালিয়ে যেয়ে সীমান্তে সশস্ত্র সংঘাতের অবতারণা করছে।... নির্জনে কারারুদ্ধ অবস্থায় উপর্যুপরি লাঞ্ছনার মুখেও এই হুমকির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আমার দেরি হয় নি।' তাহেরকে তাঁর বক্তব্যের এই অংশের পুরোটুকু পড়তে দেয়া হয় নি।

উল্লেখিত এই ব্যক্তি কাদের সিদ্দিকী একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে টাঙ্গাইল জেলায় গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন।... ঢাকা মুক্ত হবার পরপরই জনসমক্ষে তিনজন কথিত পাকিস্তানি দোসরকে নিজেই বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করার মাধ্যমে কাদের সিদ্দিকী বাঙালি ও বিদেশিদের রীতিমতো ঘাবড়ে দিয়েছিলেন। তিনি আবার এই প্রদর্শনীতে বিদেশি সংবাদসংস্থার লোকদের আমন্ত্রণ করেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ঘটনাটাই নিমন্ত্রিত অতিথিরা ক্যামেরায় তুলে রাখেন। স্বাধীনতার পর টাঙ্গাইল ফিরে তিনি আওয়ামী লীগের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর কাদের সিদ্দিকী তার সহযোগীদের নিয়ে খোন্দকার মোশতাকের নব গঠিত সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পরে এরা আস্তে আস্তে ভারতের ভেতরে ঢুকে যায় ও বি. এস.এফ.-এর সহযোগিতায় আসামের সীমান্তবর্তী এলাকায় ট্রেনিং ক্যাম্প চালু করে।

খালেদ মোশাররফের ৩রা নভেম্বরের প্রতি-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হবার পর কাদেরিয়া বাহিনী ভারতে তাদের ঘাঁটি থেকে নিয়মিতভাবে সীমান্ত লঙ্ঘন করে দেশের ভেতর হামলা চালাতে থাকে। ভারতের জাতীয় নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের পরাজয়ের পর নতুন জনতা সরকার এই সব ঘাঁটি বন্ধ করার আদেশ দেন বলে জানা যায়। এসময় ভারতীয় বহির্বিষয়ক মন্ত্রী লোকসভায় মন্তব্য করেন—ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের নিজের দেশে ফিরে যাবার জন্য কোনরকম জোর-জবরদস্তি করা হয় নি (তাই বলে)... সরকার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য এদেশের মাটি ব্যবহার করার অধিকার কাউকে দেবেন না, (সাপ্তাহিক স্টেটস্‌ম্যান ২রা জুলাই, ১৯৭৭)।

৩রা নভেম্বরে ভারতীয় সরকারের পূর্ব ইঙ্গিত বা ইচ্ছায়ই যে ব্রিগেডিয়ার মোশাররফ প্রতি-অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন তা সুনিশ্চিত করে বলবার মতো কোন জোর প্রমাণ কখনো পাওয়া যায় নি। খালেদ মোশাররফের ঘনিষ্ঠ সামরিক সূত্র এই লেখককে জানান যে এ ধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; সত্যিকারভাবেই ভারতের সাথে কোন যোগাযোগ

ছিল না। তারা দাবি করেন যে খালেদের এই সামরিক অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ছিল সেনাবাহিনীতে 'নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা পুনরুদ্ধার'। (প্রথম) অভ্যুত্থানের ফলে মুজিবের মৃত্যুর পর সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব কাঠামো অকার্যকরী হয়ে পড়েছিল এককথায় এরা একটা গতানুগতিক বুর্জোয়া সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব কাঠামো ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। তারা আরো দাবি করেন বেসামরিক নেতৃত্বের সাথে এই সিদ্ধান্তের কোন সম্পর্ক ছিল না।

আগস্ট মাসের শেষদিক থেকেই চীফ অফ জেনারেল স্টাফ খালেদ মোশাররফ আর্মি চীফ অফ স্টাফ জিয়াকে মুজিবের হত্যাকারী মেজরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য চাপ দিয়ে আসছিলেন। এই অফিসাররা মুজিবকে মারার পর ঊর্ধ্বতন অফিসারদের আদেশ অমান্য করে তাদের অধীনস্থ সিপাহীসহ ব্যারাকে ফিরে আসতে অস্বীকার করে আসছিলেন। পনেরই আগস্ট থেকে তেসরা নভেম্বর পর্যন্ত সময় মেজর রশীদ ও ফারুকের অধীনস্থ বেঙ্গল ল্যান্সার ও আরমার্ড কোর-এর সেনারা বঙ্গভবনের নিরাপদ ছায়ায় অবস্থান করছিলেন। এরা নিরস্ত্র হবার ভয়ে ব্যারাকে ফিরতে অস্বীকার করে। এছাড়াও, খোন্দকার মোশতাকও এদের ওপর তাঁর প্রতি পূর্ণভাবে অনুগত একমাত্র সামরিক ইউনিট হিসেবে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন।

খালেদের ঘনিষ্ঠ সূত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে জিয়া এই মেজরদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নিতে অস্বীকার করায় দুজনের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের সৃষ্টি হয়। জানা যায় অক্টোবরের শেষের দিকেও জিয়া খালেদকে বলেন যে উপযুক্ত সময় হয় নি। খালেদ উল্টো তর্ক করে বলেন যে সিনিয়র অফিসাররা জেনারেলদের মতো হাবভাবকারী এইসব মেজরদের কাছ থেকে আদেশ নিতে নিতে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়েছেন। মনে হয় আগস্টের পনের তারিখের রাত্রেও খালেদ একইভাবে জিয়াকে অনুরোধ করেছিলেন এদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। কিন্তু এধরনের কোন পদক্ষেপ অপরিপক্ক হবে বলে জিয়া খালেদকে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করেন। মনে হয়, অন্যদের মতো খালেদও আগস্টের আগে জিয়ার সাথে এই মেজরদের ও মোশতাক চক্রের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। খালেদকে মুজিবের অনুগত লোক মনে করে মেজরদের দল কিংবা মোশতাকের লোকেরা কখনো তার সাথে যোগাযোগ করে নি।

সামরিক বাহিনীর মধ্যেকার সূত্রের মাধ্যমে জানা যায়, খালেদ জিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতি-অভ্যুত্থানকে পুরোপুরি সেনাবাহিনীর নিজস্ব ব্যাপার হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। তিনি এমনকি স্থিতিশীলতার স্বার্থে খোন্দকার মোশতাককে রাষ্ট্রপতি রাখতেও রাজি ছিলেন। ১৯৭৬-এর জুন মাসে এই লেখকের সাথে এক সাক্ষাৎকারে মোশতাক স্বীকার করেন যে খালেদ তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকতে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি বুঝতে পেরে তিনি নিজেই রাজি হন নি। বন্ধুদের মতে অন্যান্য অফিসারদের চাপে নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা পুনরুদ্ধারের আশায়ই হঠাৎ করে তিনি এই পদক্ষেপ নেন যা জিয়া নিতে অস্বীকার করে আসছিলেন। অন্যান্য আনুসঙ্গিক ব্যাপারগুলো তিনি বেসামরিক নেতৃত্বের হাতেই ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

কিন্তু এই ব্রিগেডিয়ার যদি সত্যিসত্যিই বিশ্বাস করে থাকেন যে তিনি রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে আলাদা রাখতে পারবেন তাহলে বলতেই হয় খালেদ মোশাররফের

রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল বাস্তববুদ্ধিহীন, নিতান্তই সহজ সরল। বিশ্বস্ত কোন সামরিক শক্তি ছাড়া মোশতাকের পক্ষে তাঁর ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। এছাড়াও এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে মুজিবের হত্যাকারী সামরিক শক্তির অপসারণের পর মুজিবের অনুগত শক্তিই আবারো নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবে। খালেদ কি এমন একটা পুনরুদ্ধারকরণের পক্ষে ছিলেন? তিনি কি জেনেশুনে এদের পক্ষে কাজ করছিলেন? সে ব্যাপারে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। অভ্যুত্থানের পর দিন ৪ঠা নভেম্বর মুজিবপন্থীদের একটি মিছিলে খালেদের মা ও ভাই নেতৃত্ব দিলে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়েছিল যে মুজিবপন্থীরাই এটা ঘটিয়েছে। খালেদের পারিবারিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, এই ঘটনায় খালেদ তাঁর মা ও ভাই-এর ওপর প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন। ৫ই নভেম্বর ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মুজিবপন্থী মিছিলের নেতৃত্বে খালেদের মা ও ভাই-এর ছবি দেখে সাধারণ মানুষের মনে হয়েছিল যে সত্যিকারভাবেই বাকশালীদের ফিরিয়ে আনার ফন্দি এটা। এই ছবিই ছিল তাঁর পতনের অন্যতম প্রধান কারণ।

খালেদকে 'ভারতীয় চর' অভিধায় অভিষিক্ত করার পেছেন যে দুজন বাংলাদেশীর অবদান সবচেয়ে বেশি তারা হচ্ছেন দুজন সাংবাদিক—আতিকুল আলম ও এনায়েতউল্লাহ্ খান। এনায়েতউল্লাহ্ খান খালেদ মোশাররফের দুঃসম্পর্কের আত্মীয়। আতিকুল আলম রয়টার ও বি. বি. সি.-র ঢাকাস্থ সংবাদদাতা। নভেম্বরের চার ও পাঁচ তারিখে আতিকুল আলম ঢাকায় কূটনীতিক মহলে ঘুরে ঘুরে দাবি করেন যে তার কাছে কারান্তরীণ বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও মুজিব মন্ত্রিসভার প্রাক্তন সদস্য তাজউদ্দিন আহমদ-এর লেখা একটা চিঠি রয়েছে। ভারতীয় হাই-কমিশনার সমর সেনকে লেখা কথিত এই চিঠিতে অভ্যুত্থানের প্ল্যান ও প্রস্তুতির পূর্ণ বিবরণ লেখা ছিল। আতিকুল আলম জার্মান দূতাবাসের লোকজন ছাড়া আরও অনেককে চিঠিটি দেখান। তিনি জোর দিয়ে দাবি করেন যে, চিঠিটি তাজউদ্দিনের নিজ হাতে লেখা। এই চিঠি থেকে খালেদের অভ্যুত্থানের পেছনে ভারতীয়দের যে হাত রয়েছে তা একদম পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বিদেশি কূটনীতিকদের আতিকুল আলম বোঝান যে, এই অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ছিল ভারতপন্থী তাজউদ্দিন আহমেদকে জেল থেকে বের করে এনে ক্ষমতায় বসানো। আলমের দেখানো এই চিঠির ফলে কূটনীতিক মহলে রটে যায় যে খালেদের অভ্যুত্থানের পেছনে ভারতীয় গোয়েন্দাদের হাত রয়েছে। আতিকুল আলম পরে লন্ডনে ঘটনার তিন মাস ও পরে তিন বছর পর দেয়া দু'টো সাক্ষাৎকারে বলেন যে চিঠিটি তিনি তার মূল সূত্রের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন। চিঠিটার যে আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল এটা প্রমাণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার কাছে ওটার কোন নকল নেই। তবে তিনি দাবি করেন যে ওটা আসলেই ছিল খাঁটি। আলমের সহযোগী সাংবাদিক বন্ধুদের মতে এধরনের কোন চিঠির অস্তিত্বই ছিল না, পুরো ব্যাপারটাই একটা বাজে প্রচারণা মাত্র। তেসরা নভেম্বরের রাত্রিতে ঐ চিঠির কথিত লেখক বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদকে বেয়নেট খুঁচিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা করা হয়। জেলখানার ভেতরের ঘনিষ্ঠ সূত্র অনুযায়ী মোশতাকের পক্ষের বলে কথিত সামরিক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন।

২. সাতই নভেম্বরের ঘটনার পরদিন সাপ্তাহিক হলিডের তৎকালীন সম্পাদক এনায়েত উল্লাহ্ খান প্রথম পৃষ্ঠার সম্পাদকীয়তে 'সম্প্রসারণবাদ (ভারত) ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ

(সোভিয়েত ইউনিয়ন)-এর শক্তিদের' খালেদের অভ্যুত্থানকে সমর্থন করার অভিযোগ করেন—৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থানে বাইরের হস্তক্ষেপ ছিল খুবই স্পষ্ট। এরা শেখ মুজিবুর রহমানের হারানো প্রতিমূর্তি উদ্ধারের আশায় সেনাবাহিনীর কিছু দেশদ্রোহী অফিসারদের উচ্চাভিলাষকে কাজে লাগায়... স্বল্প সময়ের জন্য হলেও এরা পরিবর্তনের গতিকে আটকে দিয়ে একটা ধূম্রজাল সৃষ্টিতে সক্ষম হয় মুজিবের মৃত্যুর পর খোন্দকার মোশতাক ছদ্ম বামপন্থী সাপ্তাহিক হলিডের প্রাক্তন সম্পাদক এনায়েউল্লাহ্ খানকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন ইংরেজি দৈনিক বাংলাদেশ টাইমস্-এর সম্পাদক পদে নিয়োগ করেন খোন্দকার মোশতাকের পতনের পরও খান তার পদে বহাল থাকেন ও পরে জিয়াউর রহমানের সক্রিয় সমর্থকে পরিণত হন। সাতাত্তরে তিনি জিয়া সামরিক সরকারের মন্ত্রি-সভায় অন্তর্ভুক্ত হন। জিয়ার প্রথম রাজনৈতিক ফ্রন্ট 'জাগোদল'-এর তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক ছিলেন। এক বছরের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। জিয়া তাঁর এক সময়ের অন্যতম প্রধান প্রচারককে ত্যাগ করেন।

খালেদের সংগঠিত অভ্যুত্থানের পেছনে সত্যিকার উদ্দেশ্য যাই থাকুক, পূর্বতন কোন বহির্যোগাযোগ তার থাকুক আর না-ই থাকুক; দেশের শহুরে জনগণ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে এর ফলে বিস্ফোরিত প্রতিক্রিয়া ঘটে। খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের পেছনে ছিল গোপন ভারতীয় সহযোগিতা আর এর মূল উদ্দেশ্য ছিল এদেশে ভারতের অনুগত একটা সরকার প্রতিষ্ঠা করা—এই বিশ্বাসে সারাদেশের মানুষ প্রবলভাবে আলোড়িত হয়। এই তীক্ষ্ণ জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়াকেই জাসদ নেতৃবৃন্দ তাদের গণসংগঠনগুলোর সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে পূর্ণ গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করেন। খালেদের অভ্যুত্থানের ভেতরের সত্যি ঘটনাগুলো আজো প্রকাশিত হবার অপেক্ষায়।

৩. Kali Charan Ghosh—***Famines in Bengal 1770-1943*** (Indian Associated Publishing Co., Calcutta, 1944); Ian Stephens, ***Monsoon Morning*** (Ernest Benn, London. 1966); Amartya Sen, 'Starvation and Exchange Entitlements A General Approach and its Application to the Great Bengal Famine', ***Cambridge Journal of Economics,*** Vol.1, No. 1, March 1977.

৪. সি. আই. এ. থেকে পাওয়া একাত্তর সম্পর্কিত কিছু কাগজপত্রে প্রথম দিকের তাহের-জিয়া বন্ধুত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ডিসেম্বর ৩, '৭১ তারিখের 'মুক্তি বাহিনী অপারেশনস ইন দ্য রংপুর-ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সেক্টর' শিরোনামকৃত এই দলিল হচ্ছে মূলত সি. আই. এ.-র ডাইরেক্টরেট অব প্ল্যানস্ এর একটি গোয়েন্দা সংবাদ। রিপোর্ট নং ৩১১/০৮৪১১২—৭১) এতে একজায়গায় লেখা রয়েছে 'মুক্তিবাহিনীর রংপুর-ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সেক্টরের প্রধান কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ শিবির পশ্চিম মেঘালয়-পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারতে অবস্থিত। এই সেক্টরের মুক্তিবাহিনী প্রধান হচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমান। অন্যান্য নেতৃস্থানীয় অফিসাররা হচ্ছেন মেজর তাহের, ক্যাপ্টেন আলী আহমদ, ক্যাপ্টেন কাদের সিদ্দিকী.... সেক্টর অপারেশন ঘাটিগুলো ডালু, মহেন্দ্রগঞ্জ, ফোড়াখাড়া, বাগনিয়ারা, মানকাচর ও মহেশখোলায় অবস্থিত। এই সেক্টরের দশটা প্রশিক্ষণ শিবির রয়েছে, ডালু হচ্ছে এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। এখানে একবারে সাড়ে বারোশো শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণে সক্ষম। রংপুর-

ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সেক্টরে প্রায় দশ হাজার লোক রয়েছে। এদের কমান্ডার হচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমান ওরফে জিয়া খান—একে জুলাই '৭১-তে চট্টগ্রাম সেক্টর থেকে এখানে বাদলি করা হয়। ময়মনসিংহের সহ-সেক্টর প্রধান হচ্ছেন মেজর তাহের। ইনি রহমানের সহকারী হিসেবে কাজ করছেন, দলিলের বাকি অংশে এই সেক্টরে কর্মরত সব সামরিক-বেসামরিক অফিসারদের বিস্তারিত বিবরণ ছাড়াও রয়েছে ঘাঁটিগুলোর অবস্থান, বিভিন্ন সংঘর্ষের বিবরণ, আর মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী ভারতীয় অফিসারদের ভূমিকা ও পরিচয়। এই সি. আই. এ. রিপোর্টের সূত্র ছিলেন জনৈক 'মধ্যমপর্যায়ের পশ্চিম বঙ্গীয় সাংবাদিক' যিনি একজন তুলনামূলকভাবে নতুন সূত্র যার বিশ্বস্ততা এখনো প্রমাণের অপেক্ষায়' কিন্তু যিনি আগেও নির্ভরযোগ্য খবর দিয়েছেন।

৫. 'The Twelve Demano's, ***Far Eastern Economic Review,*** 5th December, 1975, পুরো বিবরণের জন্য দেখুন 'লড়াই'-৬ষ্ঠ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৭৫।

৬. *প্রাগুক্ত*।

৭. 'Bangladesh State and Revolution', ***Fronticer*** (Calcutta), 13 December. 1975.

৮. বিভিন্ন বাংলাদেশী সূত্রের সাথে সাক্ষাৎকার থেকে এটা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রাক-আগস্ট পর্বে জিয়াউর রহমান একইসাথে দুপক্ষের সাথে গোপন যোগাযোগ রেখে চলছিলেন—একদিকে মোশতাক শিবির অন্যদিকে জাসদ। তখন জিয়া হয়ত সত্যিকারভাবেই সামনের গোলযোগে কোন পক্ষ নেবেন তা' নিয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন আর তাই তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পথ চলছিলেন। মার্চের দিকে তিনি মেজরদের আশ্বস্ত করেন যে নিজে কোন অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব না দিলেও তিনি সক্রিয়ভাবে তাদের বিরোধিতা করবেন না। তিনি অন্যদিকে মোশতাকের অন্যান্য রাজনৈতিক সহযোগীদের সাথেও যোগাযোগ রাখেন বলে মনে হয়। বলা হয় এদের মধ্যে মাহবুব আলম চাষীও ছিলেন। তিনি এদের একটি সফল অভ্যুত্থানের প্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর মধ্যে কোন রকমের প্রতিক্রিয়া নিষ্ক্রিয় করার প্রতিশ্রুতি দেন। (দ্বিতীয় টীকা দেখুন, কথিত আছে ১৪ ও ১৫ই আগস্টের রাত্রিতে মেজরদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক কোন পদক্ষেপ নেয়া থেকে জিয়া খালেদ মোশাররফকে বিরত করেছিলেন।)

মুজিবের ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে জানা যায় যে, তাঁর মৃত্যুর আগে জিয়া মুজিবের সাথেও দেখা করেন। কথিত রয়েছে অভ্যুত্থানের দশ দিন আগে এক সাক্ষাৎকারে এক পর্যায়ে জিয়া মুজিবকে জানান যে সেনাবাহিনীতে গোলমাল চলছে। শৃঙ্খলা রক্ষা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। শোনা যায় তিনি মুজিবকে চোরাচালানী, মুদ্রাস্ফীতি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পরামর্শ দেন। এর ফলে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সহজ হবে। মুজিবের সাথে বিভিন্ন আর্মি কমান্ডারের এধরনের আলাপ-আলোচনা কোন ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিল না; এধরনের কথাবার্তা শুনতে মুজিব অভ্যস্ত ছিলেন। '৭৪-এর এপ্রিলে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে চোরাচালানী ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানে নামানোর পর থেকেই এদের মধ্যে শৃংখলা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এরা অভিযানে নেমেই হাত দিয়েছিল একেবারে আসল জায়গাটায় চোরাকালানকৃত সম্পত্তি হস্তগত করার দায়ে এরা আওয়ামী লীগ

নেতাদের গ্রেফতার করতে থাকে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখের ওপর চাপ আসতে থাকে। এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রতিরক্ষা বাহিনীকে অভিযান বাতিল করে ব্যারাকে ফিরে যেতে আদেশ দেয়া হয়। '(Far Eastern Economic Review—A Declaration of Martial Democracy', 13 May 1947; 'Coup in Bangladesh' 29 August 1975.) তবে লোকে বলে ঐদিন শেখের সাথে জিয়ার সাক্ষাৎকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম; একটা উপযুক্ত প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা। মেজররা তাদের অভ্যুত্থানে ব্যর্থ হলে (এদের সামরিক দক্ষতা ও যোগ্যতার ওপরে জিয়ার খুব কম আস্থাই ছিল) জিয়া তাৎক্ষণিকভাবে শেখকে ঐদিনের সাক্ষাৎকারের কথা মনে করিয়ে দিতেন। শেখ মুজিব, যিনি তাঁর অন্ধ আত্মবিশ্বাসের ধাক্কায় দিনে দিনে নিজের পতন ডেকে আনছিলেন—তিনি নিজস্ব সহজাত ভঙ্গীতে জিয়াকে কোন চিন্তা করতে নিষেধ করেন। তিনি সব কিছুই ঠিক করে দেবেন। একজন ওয়াকিবহাল সরকারি সূত্রের মতে 'জিয়া এই সময় টেবিলের সব কয়টা নাম্বারের ওপরই বাজী ধরছিলেন। কয়েকটায় টাকা হারাবেন এটা ঠিক কিন্তু জয়ী নাম্বারটাও যে তাঁরই হবে তারও নিশ্চয়তা ছিল।'

মুজিবের মৃত্যুর পর খোন্দকার মোশতাকের সময়ের চরম অস্থিতিশীলতার মধ্যে জিয়া জাসদের সাথে তাঁর পুরনো সংযোগ আবারো উজ্জীবিত করেন। এরই মধ্যে মেজর জেনারেল শফিউল্লাহকে চীপ অফ স্টাফের পদ থেকে অপসারণ করে মালয়েশিয়ায় রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়ে দেয়া হয়, জিয়া সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি একদিকে গোপনে মোশতাককে সমর্থন দিতে থাকেন ও অন্যদিকে খালেদ মোশাররফ, শাফায়াত জামিল ও অন্যান্য অফিসাররা যারা মেজরদের নিরস্ত্র করে সেনাবাহিনীতে নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী ছিলেন তাদের বিরোধিতা করতে থাকেন। উত্তেজনা বাড়তে থাকলে জিয়া জাসদের সাথে তাঁর যোগাযোগ আরও অন্তরঙ্গ করে তোলেন। এই সময় দেশে প্রাক্তন আওয়ামী লীগ, আমলাচক্রও সেনাবাহিনীর মুজিব পন্থী ও মোশতাকপন্থী চক্র ছাড়া জাসদের রাজনৈতিক শক্তি ও সেনাবাহিনীতে তাদের সমর্থকরাই ছিল একমাত্র উল্লেখযোগ্য শক্তি। অন্যদিকে পাকিস্তানপন্থী চক্র অর্থাৎ যারা একাত্তরে পাকাহিনীর কর্মকাণ্ডের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল তারা সাময়িকভাবে মোশতাকের পক্ষই নিয়েছিল। মোশতাক সরকার আস্তে আস্তে গভীর সংকটে ডুবে যেতে থাকলে জিয়া মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে জাসদ নেতৃত্বকে আশ্বাস দেন যে জাসদের অন্তর্বর্তীকালীন অনুক্রমকে সমর্থন করবেন। এই অনুক্রমে মূলত অন্তর্ভুক্ত ছিল বাষট্টি হাজার রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি, অজস্র রাজনৈতিক কর্মীর ওপর হুলিয়া প্রত্যাহার, সেন্সরশীপ নিয়মের অবলুপ্তি, বিরোধীদলীয় পত্রিকাগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার আর (বাকশালকে বাদ দিয়ে) একটা সর্বদলীয় গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে যার প্রথম কাজ হবে জরুরি ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচনের ডাক দেয়া।

জিয়ার পূর্বতন ভূমিকা পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে জাসদ সিদ্ধান্ত নেয় যে, এই জেনারেলের সাথে এই সব সাময়িক দফার ভিত্তিতে একটা গোপন মৈত্রীত্ব সম্ভব ও সঠিক। তা হবে যুক্তিযুক্ত। আগস্ট আর নভেম্বর-এর মধ্যবর্তী সময়ে খুব সম্ভবত তাহের নিজেই জিয়ার সাথে এই সম্পর্ক গড়ে তোলার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন। কাজেই জিয়া যে ৩রা নভেম্বর গ্রেফতার হবার প্রাক্কালে তাহেরকেই টেলিফোন করবেন তাতে আর অবাক

কি? মাথার ওপর ঝুলন্ত খড়গ। এ অবস্থায় সামনে এগোবার মতো ঐ একটা পথই খোলা ছিল জিয়ার সামনে। জাসদ এখানে এসে যে ভুলটি করে তা হচ্ছে আগস্ট-অভ্যুত্থানের অনেক আগে থেকেই মোশতাক শিবিরের সাথে জিয়ার গড়ে তোলা সম্পর্কের গভীরতা আঁচ করতে ব্যর্থ হওয়া। সাতই নভেম্বর। এসেছে চরম মুহূর্ত। আর সব নৌকায় পা দিয়ে চলার উপায় নেই। অন্যান্য সংকটেও যেমন হয়; মঞ্চের বিভিন্ন নটের আসল চরিত্র ও অবস্থান প্রকাশের সময় এসে গেল।

এমনকি সাত তারিখেও জিয়ার অবস্থান ছিল দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভরা। তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ছিল নিতান্তই দুর্বল মাপের। জিয়া একজন প্রাক্তন পাকিস্তানি সামরিক অফিসার। কঠোর নিয়ম-শৃংখলা ও প্রচলিত রক্ষণশীল চিন্তাধারার নিগূঢ়ে আবদ্ধ যিনি। প্রায় এক বছর ধরে একটা গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করায় তিনি প্রগতিশীল ধ্যানধারণায়ও কিছুটা অভিষিক্ত হয়েছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ও এর ঠিক পরের দিনগুলোতে জিয়াউর রহমান; তাহের, জিয়াউদ্দিন ও অন্যান্য বিপ্লবী অফিসারের সাথে আলাপ-আলোচনায় তাঁদের অবস্থান ও দৃষ্টিকোণ কিছুটা হলেও অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এতে তাঁর নিজের অবস্থান অবশ্য তিনি বদলাতে পারেন নি। অন্যদিকে এঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে কখনো কোন পর্যায়ে হয়তো জিয়াকে নিজেদের শিবিরে টেনে আনা যাবে।

সাত তারিখ। গণঅভ্যুত্থানের উদয়লগ্ন। শেষ পর্যন্ত জিয়ার আনুগত্যের পরীক্ষা হলো শুরু। পঁচাত্তরের শুরু থেকে যে দুটো দল—একদিক আমেরিকাপন্থী ইসলাম পছন্দ মোশতাক শিবির আর বাম জাসদ—জিয়াকে নিজেদের মধ্যে টেনে আনবার প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা শুরু হলো। সাতই নভেম্বরের সকালে জিয়া বাংলাদেশ বেতার ভবনে সমবেত সেনাদের সামনে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের চরমতম প্রকাশ বারো দফা দাবির প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন ঘোষণা করে দলিলে স্বাক্ষর করেন। এদিকে মোশতাক অভ্যুত্থানের ফলে রাজনৈতিক অঙ্গনের অন্ধকারে হারিয়ে গেলেও তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা খুব তাড়াতাড়িই জিয়াকে তাদের দলে টেনে নেয়ার কাজে লেগে যান। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সূত্রের তথ্য অনুযায়ী তাহের শহীদ মিনারে সিপাহীদের এক সভা সংগঠনের কাজে চলে যাওয়ার পরই মোশতাকের প্রধান সহযোগী মাহবুব আলম চাষী জিয়ার সাথে দেখা করতে আসেন। অনেকের অভিযোগ, প্রাক-আগস্ট পর্বে এই ব্যক্তিই মোশতাকের সাথে জিয়ার সংযোগকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন—এবারে তিনি জিয়াকে রক্ষণশীল শিবিরে চলে আসতে চাপ দেন। অন্যদিকে, এরি মধ্যে ইনপোলসে (INPOLES) স্নাতকধারী গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের প্রাধান্যধীন স্পেশাল আর্মড পুলিশ ইউনিট জাসদের ওপর দমনযজ্ঞ চালানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। (৪১ নং টীকা দেখুন) জিয়ার আর কোন উপায় ছিল না। ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতেই হোত। পনের তারিখের মধ্যেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে ছয় মেজর আর মোশতাককে বাদ দিয়ে কার্যত প্রাক্তন মোশতাক সরকার প্রধান হতে জিয়া প্রস্তুত হয়েছেন। পুরো ব্যাপারটাই কি একটা পরিকল্পিত চক্রান্তের অধ্যায় মাত্র? কেউ জানে না। তবে এধরনের একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে তা বুঝতে পারার ব্যর্থতার কারণে জাসদকে বেশ বড়ো সড়ো খেসারত দিতে হয়েছিল।

৯. 'Bangladesh JSD's Role, '*Frontier*, 7 Feb, 1976.

১০. *The Sunday Times*, ডিসেম্বর ৫, ১৯৭১

১১. স্টেটস্‌ম্যান (কোলকাতা) পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক আয়ান স্টিফেনস্‌ মত প্রকাশ করেন যে, তাড়াহুড়ো করে অসম্পূর্ণ এক 'ভারত-ভাগনীতি' গ্রহণ করে ও অদক্ষভাবে তা পরিচালনা করে মাউন্টব্যাটেন অযথাই পাঁচ লাখ লোককে বিষাদময় ও অপ্রয়োজনীয় এক মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেন। ভারত থেকে ব্রিটিশের পাততাড়ি গোটানোর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন আয়ান স্টিফেনস্‌—*Unmade Journey (Stacy International) 1977*. পঞ্চাশতম অধ্যায়।

১২. Neville Maxwell, *India and the Nagas* (Minority Rights Group. London. 1973). Dilip Hiro, ***Inside India Today*** (Routledge & Kegan Paul. 1978) pp. 209-18.

১৩. Talukder Maniruzzaman. ***Radical Politics and the Emergence of Bangladesh*** (Bangladesh Books International Ltd, Dhaka, 1975), pp. 41-2; Paul Brass and Marc Franda (eds.) ***Radical Politics in South. Asia*** (MIT Press. 1973)।

১৪. Fazlul Kader Quaderi. *Bangladesh Genocide and the World Press* (ঢাকা, ১৯৭২)।

১৫. Rosa Luxemburg. *The National Question Selected Writings* Horace B. Davis. *Nationalism and Socialism Marxist and Labor theories of Nationalism to 1917* (Monthly Review Press. 1967). Horace B. Davis. *Toward a Marxist theory of Nationalism* (Monthly Review. 1978). পূর্ব পাকিস্তান কম্যিউনিস্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের প্রধান মার্কসীয় বামপন্থী দলগুলোর পাকিস্তানের মূল জাতীয় আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হবার ব্যর্থতা জনাব মনিরুজ্জামান চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন—'মার্কসীয় আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ আন্দোলনের একটা মস্ত বড় নীতিগত ভুল হচ্ছে জাতীয়তাবাদের শক্তিকে ইতিহাস পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান সূচক হিসেবে গণ্য করতে ব্যর্থ হওয়া। আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের বিভক্তি নিয়ে চুল চেরা বিশ্লেষণে ব্যস্ত পূর্ব পাকিস্তানি কম্যুনিস্ট বিপ্লবীরা যখন তাড়াহুড়ো করে অনেকটা উদ্দেশ্যবিহীনভাবেই তাঁদের কৌশলগত পথরেখা নির্ধারণ করছেন তখন শুরুতেই তারা পূর্ব পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটি বিবেচনায় আনতে ব্যর্থ হন। ষাট-এর মাঝামাঝি সময়ে আয়ুব খানের বৈদেশিক নীতিতে পিকিং-পন্থী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে তার পক্ষ নিতে গিয়ে পিকিং-পন্থী কম্যুনিস্টরা এমনকি ছয় দফার স্বায়ত্তশাসনের দাবিকেও অগ্রাহ্য করতে পিছপা হয় নি। এর চূড়ান্ত পরিণতিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হাতে চলে যায়।' (Talukder Maziruzzaman, ***Radical Politics and the Emergence of Bangladesh)*** *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩০।

১৬. V. I. Lenin, Critical Remarks on the National Question, in *Collected Works Vol. 20 (Progress Publishers)* এবং 'The Right of Nations to Self-Determination', pp. 393-454, আরও দেখুন, 'The "Vexed Questions" of Our

Party' 'The Liquidationist' ও 'National Questions' *collected Works,* Vol 18, (Progress Publishers) pp. 405-23. জর্জিয়ান দ্বন্দ্ব ও নতুন সোভিয়েত রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে লেনিন ও স্ট্যালিনের মতানৈক্য সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন,

Moshe Lewin, ***Lenin's Last Struggle*** (Monthly Review, New York).

১৭. 'Baluchistan Festering Dilemma for Bhutto', ***Far Eastern Economic Review,*** 28, May, 1976.

১৮. ঢাকার খান মারি-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারের অপ্রকাশিত মূল পাঠ্য থেকে। ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ-এর আঠাশে মে, '৭৬ সংখ্যায় এই সাক্ষাৎকারের অল্প অংশই প্রকাশিত হয়। দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষত ভারতের ভাষাগত বিভক্তি ও 'জাতিগত সমস্যার প্রশ্নে' বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Selig Harrison কৃত ***India : The Most Dangerous Decades*** (Princetion University Press. 1960). এ ছাড়াও একই লেখকের 'After the Afghan Coup : Nightmare in Baluchistan' ***Foreign Policy*** No. 32. Autumn 1978. ভুট্টো-পরবর্তীকালে বালুচিস্তানের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পাকিস্তানের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) মনোভাব সম্পর্কে বিবরণের জন্য দেখুন, জুন ২৩, ১৯৭৮-তে প্রকাশিত ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ সাপ্তাহিক ওয়ালী খানের সাক্ষাৎকার।

১৯. Talukder Maniruzzaman, ***Radical Politics and the Emergence of Bangladesh.*** *প্রাগুক্ত,* পৃষ্ঠা ২২-২৩।

২০. ***Pakistan Times,*** 13 April 1971. আরও দেখুন, Robin Blackburn, ***Explosion in a Subcontinent*** *(Penguin, 1975).* পৃষ্ঠা ৩৫৮-৩৫৯।

২১. G. W. Chowdhury. ***The Last Days of United Pakistan*** (Indiana University Press. 1974). pp. 358—9.

২২. 'Bangladesh A New Bogeyman' in 'China focus 74', ***Far Eastern Economic Review.*** 11 October. 1974.

২৩. 'A Bengalis Grandstand View', ***Far Eastern Economic Review.*** 11 October. 1974.

২৪. 'A New Bogeyman', ***Far Eastern Economic Review.*** 11 October. 1974.

২৫. Talukder Maniruzzaman. ***Radical Politics and the Emergence of Bangladesh.*** *প্রাগুক্ত* পৃষ্ঠা ৫১-৫২। লেখকের মতে—'চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন রুখতে তৎপর ইয়াহিয়ার বর্বর দমননীতির সমর্থন দিলে পিকিংয়ের অনুসারী বামপন্থীরা যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের আগেই বিভিন্ন অংশে ভেঙ্গে গিয়েছিল তারা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।'

পশ্চিম বঙ্গেও বাংলাদেশের সংকট পিকিং অনুসারী কম্যুনিস্ট শিবিরে একই ধরনের ভাঙ্গন ধরায়। নক্সালপন্থী ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি [সি. পি. আই. (এম-এল)] ভেঙ্গে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে তাদের সহযোগীদের মতোই বাংলাদেশের প্রশ্নে এরা গভীরভাবে বিভক্ত ছিল। সি. পি. আই. (এম-এল)-এর একজন কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য অসীম

চট্টোপাধ্যায় একাত্তরে চারু মজুমদারের অনুসরণকৃত পার্টির তৎকালীন তত্ত্ব অস্বীকার করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, এদের পথ—'পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ করা মহান চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির সঠিক ও গৌরবজনক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে।' পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির (এম-এল) আবদুল হকের সুরে অসীমবাবু বলতে চান যে পাকিস্তান একটা ন্যায্য যুদ্ধ করে যাচ্ছে। অন্যদিকে চারু মজুমদার বলেন যে এই যুদ্ধে ভারত আগ্রাসী শক্তির ভূমিকা নিয়ে হস্তক্ষেপ করলেও তথাপি ইয়াহিয়াকে সমর্থন দেয়া কোন কম্যুনিস্ট পার্টির কাজ নয়। তোয়াহার মতো একই অবস্থান নিয়ে তিনি মন্তব্য করেন যে কম্যুনিস্টদের দু ফ্রন্টে যুদ্ধ করতে হবে, একদিকে ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আবার অন্যদিকে ইয়াহিয়া খানের বাহিনীর বিরুদ্ধে। অসীমবাবু বা চারু মজুমদার এদের কেউই জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেন নি।

পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের নক্সালরা কিংবা বাংলাদেশের পিকিং-পন্থীদের কেউই সোভিয়েত ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির মতবিরোধের অন্যতম প্রধান ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। ১৯৬৭-এর ঘোষণা সত্ত্বেও চীন দক্ষিণ এশিয়ায় উদীয়মান মাওবাদ-এর প্রসার নিয়ে কিছুটা চিন্তিত ও ব্যস্ত ছিল। এই মাওবাদীরা পাকিস্তান কিংবা ভারতের সামনের সমস্যাগুলো নিয়ে নিজস্ব স্বাধীন বিশ্লেষণের পরিবর্তে এ ব্যাপারে চীনা অবস্থান জানতেই বেশি আগ্রহী ছিল। বাংলাদেশ সংকটের এক বছর আগে নক্সাল আন্দোলনের অনেক বিতর্কিত ব্যাপার নিয়ে আলোচনার জন্য সি. পি. আই. (এম-এল)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য পিকিং যান। এই ভদ্রলোক চৌ-এন-লাই ও কাং-শেং-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এমনকি তিনি মাও-সে-তুং-এর সাথেও কথা বলেন বলে শোনা যায়।

আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে চৌ-এন-লাই, সি. পি. আই. (এম-এল)-এর কিছু শ্লোগানের সমালোচনা করেন বলে খবর পাওয়া যায়। নক্সালপন্থীরা ঐ সময় কোলকাতা ও অন্যান্য শহরে মাওয়ের ছবিসহ এধরনের শ্লোগান—'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, বা 'চীনের পথই আমাদের পথ'—লিখে ভরে ফেলেছিল। চৌ-এন-লাই এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন—'পৃথিবী অনেকশ্রেণী ও জাতিতে বিভক্ত। প্রতিটি দেশের সর্বহারা শ্রেণী হচ্ছে সেই দেশের আসল প্রতিনিধি। কাজেই জাতীয় সীমারেখা আমাদের বিবেচনায় আনতেই হবে। এক দেশের নেতাকে অন্য দেশের নেতা বানানো সেদেশের জাতীয় মানসিকতা বিরুদ্ধ। এমনকি শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষেও এটা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। একজন মহান মার্কসবাদী-লেনিনবাদীকে সম্মান করা ও তাঁর থেকে শিক্ষা নেয়া এক কথা কিন্তু তাঁকে নিজেদের নেতা বলে দাবি করা সম্পূর্ণ অন্যব্যাপার। এটা একটা নীতির প্রশ্ন।' কাং-শেং-তাঁর বক্তব্যে ছিলেন আরও স্পষ্ট—'আমাদের দল যে অন্য সব দলের নেতৃত্বে আমরা তা মানতে রাজি নই। তাছাড়া আপনারা যে আমাদের চেয়ারম্যানকে আপনাদের চেয়ারম্যান বলে দাবি করেছেন সেটাও আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এটা আমাদের নীতির বিরুদ্ধে ও মাও-সে-তুং চিন্তাধারা বিরুদ্ধ। আমাদের উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ আর তা সমানে-সমান।'

চৌ-এন-লাই বলেন বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতি আলাদা রকম আর তাই প্রত্যেক দেশে বিপ্লবী আন্দোলনকে নিজস্ব পথ খুঁজে নিতে হবে—'এটা কোন বিনয়ের কথা নয়,

একেবারে বাস্তব সত্য। আপনাদের উপযুক্ত পথ শুধু আপনারাই খুঁজে বের করতে পারেন।... আমাদের দু ভ্রাতৃপ্রতীম বন্ধু দলের মধ্যে সম্পর্কের মূল হচ্ছে অভিজ্ঞতার লেনদেন করা। আপনারা সেই সীমা ছাড়িয়ে গেলে তা মাওবাদী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে হবে। আমাদের দলনেতার নাম নিজেদের জন্য ব্যবহার করা ঠিক নয়। ১৯৫৭ সালে আমাদের চেয়ারম্যান মস্কোতে বলেছিলেন যে 'তিনি কোন বিশেষ পিতৃতান্ত্রিক দল বানানোর বিরুদ্ধে।'

পিকিং-এ এই সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণের জন্য দেখুন—Shankar Ghosh. ***The Uaxalite Movement*** (ক. ই. মুখোপাধ্যায়, কোলকাতা, ১৯৭৪) পৃষ্ঠা ১২-২৩।

২৬. Maniruzzaman, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh. প্রাগুক্ত,* পৃষ্ঠা ২৯।

২৭. Robin Blackburn সম্পাদিত ***Explosion in a Subcontinent*** গ্রন্থে দেখুন, Richard Nation—'The Economic structure of Pakistan and Bangladesh.

২৮. নতুন জাতীয় পতাকার মূল নকশায় ছিল লাল সূর্যের কেন্দ্রে স্থাপিত পূর্ব-পাকিস্তানের মানচিত্র। নকশাটা সহজ করার জন্য মানচিত্রটা পরে বাদ দেয়া হয়।

২৯. লা মঁদ, মার্চ ৩১, ১৯৭১। এছাড়াও দেখুন, র‍্যাডিকাল এশিয়া বুকস, লন্ডন থেকে সাতাত্তর সালে প্রকাশিত আবদুল গাফফার চৌধুরীর সম্পাদনায় *Sheikh Mujib A Commemorative Anthology*-তে অন্তর্ভুক্ত রেহমান সোবহানের লেখা '*Sheikh Mujibur Rahman and the Contradictions of Bourgeois Society in Bangladesh.*

লেখক মন্তব্য করেন—'দলের ভেতর ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে একটা স্পষ্ট প্রবণতা ছিল। ছাত্রলীগে একটা শক্তিশালী, সম্ভবত প্রদান অংশই ছিল যারা নিজেদের সমাজতন্ত্রী হিসেবে গণ্যকরত ও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। এই বিপ্লবী গ্রুপ যেন ছিল দলের বর্শাফলকের অগ্রভাগ, এরাই পার্টির জঙ্গী শ্রমিক উপাদান এনে ছাত্র সংগঠনের জঙ্গী চরিত্রকে আরো শক্তিশালী করতে চেয়েছিল। এদের সাথে শেখের একটা অন্তরঙ্গ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ছিল। শেখ ভালোভাবেই জানতেন, সামরিক বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে জড়িত হয়ে পড়লে এই শ্রমিক ও ছাত্ররাই গণআন্দোলনের নেতৃত্ব পূর্ণ গ্রহণ করবে ও আন্দোলনকে সামনে চালিয়ে নেবে। এরাই হচ্ছে দলের সেই গুরুত্ব অংশ যারা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান ও প্রকাশ্যে বিপ্লবী অবস্থান গ্রহণ করতে শেখকে চাপ দিয়েছিল। স্বাধীনতার পরে এরাই বাহাত্তরে আওয়ামী লীগ থেকে আলাদা হয়ে যায় ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) গঠন করে। গোপন তৎপরতার বদলে আবির্ভূত হয় জনরাজনীতির অঙ্গনে। পরিণত হয় আওয়ামী লীগের প্রধান বিরোধী দলে।'

৩০. '৭৬-এর জুনে লেখকের সাথে ঢাকায় হারুনুর রশিদের একটা অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার থেকে। হারুনুর রশিদ জাসদের জাতীয় কমিটির সদস্য। মুজিব সরকার কর্তৃক ১৭ই মার্চ, '৭৪-এ জাসদের সাধারণ সম্পাদক আ.স.ম. আবদুর রব গ্রেফতার হবার পরে তিনি দলের কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। তাহের মামলার একজন সহ-অভিযুক্ত হিসেবে রব-কে জুলাই, '৭৬-তে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল।

'৭৬-এর জুনে এই লেখকের সাথে পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) আবদুল হকের বিস্তৃত আলোচনা ও পূর্ববাংলা কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-এর মোহাম্মদ তোয়াহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। হারুনুর রশিদ ও আবদুল হক এই সময় পলাতক জীবন-যাপন করছিলেন।

৩১. 'তাহেরের শেষ কথা' দেখুন।

৩২. Mohammad Ayoob and K. Subramayam. *The Liberation War* (S. Chand. New Delhi, 1972) p. 152.

৩৩. 'স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়করা লে. কর্নেল তাহের' ও 'চিলমারী অভিযান, যুদ্ধের ইতিহাসে এক মাইলফলক'—বিচিত্রা (ইংরেজি অনুবাদ থেকে পুনঃ অনূদিত)।

৩৪. 'The Agony of Undependence, ***Far Eastern Economic Review*** 16 August, 1974 আরও দেখুন, 'The Hidden Prize' ***Holiday*** (Dhaka) 12 August, 1972.

৩৫. 'Foreign Aid Vs. Self-Help', ***Business Review*** (Dhaka), January, 1973.

৩৬. *প্রাগুক্ত*।

৩৭. 'Bangladesh Playground for Opportunists', *Far Eastern Economic Reivew,* 6 September, 1974.

৩৮. 'Letter from London', ***Far Eastern Economic Review,*** 7 February, 1975.

৩৯. 'Bangladesh Miscreant Power, ***Frontier*** 6 April, 1974.

৪০. রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট ৭ই নভেম্বর ও পরবর্তী ঘটনাবলি 'সাম্যবাদ, ৪র্থ সংখ্যা, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ১-১৪ (ইংরেজি অনুবাদ থেকে পুনঃঅনূদিত)।

৪১. এই বই লেখার সময় নেয়া বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেকেই এই ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন যে নয়ই নভেম্বর ছাত্রমিছিলকারীদের ওপর স্পেশাল পুলিশ ইউনিটের হামলা করার পেছনে জিয়া ও তৎকালীন সামরিক নেতৃবৃন্দের আদৌ কোন আদেশ বা সম্মতি ছিল। অনেকে মনে করেন যে, পুলিশ সেনাসদর নয় বরং জাতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থা (এন. এস. আই.)-এর আদেশেই হামলা চালায় মোশতাকের সাঙ্গোপাঙ্গো, আগস্ট অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত রাজনৈতিক শিবিরের লোকজন এবং এন. এস. আই. ও আধাসামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব জিয়ার আসল অবস্থান কোন শিবিরে তা নিয়ে খুব চিন্তায় ছিলেন। জিয়া রাজবন্দীদের মুক্তির আদেশ দেয়ার পরদিনই নয়ই নভেম্বর নিজেদের উদ্যোগে দমন শুরু করেন নিরাপত্তা বিভাগীয় কর্মকর্তা এবং আগস্ট অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত রাজনৈতিক চক্র জিয়াকে তাৎক্ষণিকভাবে তার আসল অবস্থান প্রকাশ করতে বাধ্য করলেন। তিনি কোন শিবিরের লোক? তাদের নাকি বিপ্লবীদের? (এখানে জাতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থা (এন. এস. আই.) ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নেপথ্য পরিচয় কিছুটা জানা দরকার। বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে লেখক এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু বলা প্রয়োজন।

তৃতীয় বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য কর্মসূচির একটি ছিল ও. পি. এস.-এইড (অফিস অব পাবলিক সেফটি-এজেন্সী ফর ইন্টারন্যাশাল ডেপেলপমেন্ট)। এর মাধ্যমে মার্কিনীরা তৃতীয় বিশ্বের পুলিশ বাহিনীর 'পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের' কাজে সাহায্য

করত। তবে পুরো ব্যাপারটাই একটা গোপন সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার অংশ বিশেষ মাত্র। প্রতিবিপ্লব রপ্তানির বেশ একটা পোশাকী উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়। মার্কিনিরা বেশ ভালোই বুঝতে পেরেছিল যে গণজাগরণ দমন করে আর্থ-সামাজিক স্থিতাবস্থা টিকিয়ে রাখবার কাজে আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার জুড়ি মেলা ভার। পঁয়ষট্টিতে কেনেডী প্রশাসনের প্রধান সমরতত্ত্ববিদ জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলর সদ্যোত্তীর্ণ আই. পি. এ. স্নাতকদের উদ্দেশ্যে বলেন—'সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা হচ্ছে এই যে আর কখনো যাতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের মতো অবস্থার সৃষ্টি না হয় আমাদের তা দেখতে হবে', তিনি মন্তব্য করেন—'যে কোন সম্ভাব্য অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা প্রতিহত করবার জন্য যে একটা শক্তিশালী পুলিশ বাহিনীর দরকার তা আমরা ভালই বুঝতে পেরেছি।' আর তাই এভাবে সর্বাধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় সজ্জিত করে ও উন্নত বিশ্বে প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে একটা শক্তিশালী পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা। যাতে করে তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলোতে কোথাও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে মানুষ জেগে উঠবার আগেই তাদের দমন করা যায়। মুষ্ঠিবদ্ধ হাতটা সিধে হয়ে ওঠবার আগেই যাতে হাতের সব আঙ্গুল থেঁতলে দেয়া যায়।

ও. পি. এস. কর্মসূচির একটা অধ্যায় ছিল মাঝারি ও উচ্চ পর্যায়ের পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণ দান। এদের মূলত প্রশিক্ষণ দেয়া হতো আই. পি. এ. (ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ অ্যাকাডেমি) ও ইনপোলসে-তে (ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ সার্ভিসেস স্কুল)। ও. পি. এস. কর্মসূচির প্রথম থেকেই সি. আই. এ.-এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। ইনপোলসে-তো ছিল পুরোপুরি সি. আই. এ. মালিকানাধীন সংস্থা। এভাবে বিদেশি গোয়েন্দা ও পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যটা চমৎকার। এদের মধ্য থেকে পশ্চিমী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট সম্ভাব্য যোগ্যতম প্রার্থী খুঁজে বের করা যিনি তার 'অস্তিত্ব বিকিয়ে দিতে' প্রস্তুত রয়েছেন। নিজ দেশে ফিরে যাবার পর এরা সি. আই এ.-কে সম্ভাব্য বিপ্লবী তৎপরতা সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য প্রদান করতেন। লেখকের ভাষায় এরা—'একই রাষ্ট্রের ভেতর আরেক রাষ্ট্রযন্ত্র' গড়ে তুলতো।

একষট্টি থেকে একাত্তর-এর মধ্যে এই কর্মসূচির আওতায় প্রায় চল্লিশ জন বাঙালি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন। লেখা বাহুল্য, এরা পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন এবং একাত্তরের যুদ্ধে পাকিস্তানিদের পক্ষে দালালি করেন। যুদ্ধের পর যুদ্ধাপরাধী ও রাজাকার-আলবদরদের পাইকারী ক্ষমাকরণের পর এরা লোকদৃষ্টির আড়ালে নেপথ্যে সরে যান। চুয়াত্তর সাল বন্যাপরবর্তী দুর্ভিক্ষের কালে মুজিবী শাসনের বিরুদ্ধে গণঅসন্তোষ তুঙ্গে উঠলে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত গোয়েন্দা ব্যক্তিত্বের খোঁজ পড়ে। শেখ মুজিব এদের পুনর্বাসন করা শুরু করেন। এদের মধ্যে তিনজনের পরিচয় লেখক দিয়েছেন। একজন হচ্ছেন এ. বি. এস. সফদার। তাকে প্রেসিডেন্টস ভিজিল্যান্স টীমে নিয়োগ করা হয়, তিনি আয়ুব আমলে ছিলেন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর (আই. বি.) উপ-পরিচালক। আরেকজন হচ্ছেন আবদুর রহিম। সফদারের সহপাঠী এবং রাজাকার বাহিনীর প্রাক্তন পরিচালক। তাকে রাষ্ট্রপতির সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তৃতীয় জন হচ্ছেন আই, পি. এ. স্নাতকধারী পুলিশ কর্মকর্তা সৈয়দ আমীর খসরু। তাকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম-সচিবের দায়িত্ব দেয়া হয়।

এই সদ্য-পুনর্বাসিত চক্রের সাথে খোন্দকার মোশতাক আহমেদ ও তার রাজনৈতিক সহযোগীদের এক গোপন ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। লেখক

দেখিয়েছেন কিভাবে শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর মোশতাক শাসনামলে এদের সবাই সুসংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে পূর্ব-মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। সফদার এন. এস. আই-এর মহাপরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। উপ-পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এম. এন. হুদা। উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দায়িত্ব পান এ. কে. এম. মুসলেউদ্দিন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্বভার বর্তায় সালাউদ্দিন আহমেদের ওপর। এদের মধ্যে শুধু সালাউদ্দিন আহমে বাদে বাকি সবাই ইনপোলসে ও আই. পি. এ.-তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, সালাউদ্দিন আহমেদ একজন আমলা, আয়ুব আমলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বরত ছিলেন। তার হাতেই দায়িত্ব ছিল ছাত্র-শ্রমিক অসন্তোষ দমন করবার। এদের নির্দেশেই নয়ই নভেম্বর বায়তুল মোকাররমে জাসদের জনসভায় গুলি ছোঁড়া হয় বলে অনেকে অভিযোগ করেন। তবে উৎসাহী পাঠক, এখানেই এ অধ্যায়ের শেষ নয়। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নিশ্চয়ই মনে রয়েছে জিয়াউর রহমানের প্রতি-অভ্যুত্থানের কথা। জিয়াউর রহমান জাসদকে দমনের জন্য আধা-সামরিক বাহিনীর দিকে ঝুঁকে পড়েন। সৃষ্টি করেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। 'মনে না পড়লে একবার মূল বইয়ের আশি'-একাশি পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে স্মৃতি ঝালিয়ে নিতে পারেন। এই বাহিনীর সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব জনাব সালাউদ্দিন আহমেদ। আর এই বাহিনীর কমিশনার হন জনাব এ. এম. এম. আমিনুর রহমান। ইনিও একজন আই. পি. এ. স্নাতক। আল-বদর বাহিনীর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা শোনা যায়। এই আধা-সামরিক বাহিনীর আরেকজন দায়িত্ববান কর্মকর্তা ছিলেন মূসা মিঞা চৌধুরী, এন. এস. আই.-এর তৎকালীন উপ-পরিচালক। অবশ্যই একজন আই. পি. এ. স্নাতক। — অনুবাদক।)

৪২. রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট : ৭ই নভেম্বর ও পরবর্তী ঘটনাবলি—সাম্যবাদ, ৪র্থ সংখ্যা, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ১৪ (ইংরেজি অনুবাদ থেকে পুনঃঅনূদিত)।

৪৩. Talukder Maniruzzaman, Bangladesh in 1975 : *The Fall of the Mujib Regime and its Aftermath'*. ***Asian Survey*** (Berkeley, U.S.A.) February. 1976.

৪৪. K. Maxwell, 'The Hidden Revoulution in Portugal' ***New York Review of Books***. 17 April. 1975.

৪৫. 'Dacca's Strongman Consolidates'. ***Far Eastern Economic Review,*** 16 January, 1976.

৪৬. 'Toaha's, Call' ***Far Eastern Economic Review,*** 5 December, 1976.

তোয়াহা তাঁর নিজস্ব তত্ত্বগত অবস্থানকে মার্কসবাদী বলে দাবি করলেও তাঁর বিরোধীরা সামরিক বাহিনীতে শ্রেণীসংগ্রামের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থানকে সম্পূর্ণভাবে লেনিন-বিরোধী বলে মন্তব্য করেন। এঁরা নিজেদের দাবি সমর্থনের জন্য 'বিশৃংখল সেনাবাহিনীর ওপর লেনিনের মন্তব্যকে উদ্ধৃত করে থাকেন—"সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ভেঙ্গে দেয়া ছাড়া আজ পর্যন্ত এমনকি একটি মহৎ বিপ্লবও সফল হয় নি; হতে পারে না। সেনাবাহিনী শ্রমিকদের মধ্যে পুঁজির প্রতি দাসোচিত মানসিকতার সৃষ্টি করে ও তাকে গড়ে তোলে। তারা পুঁজির শাসনের ভিতকে ঠেকা দিয়ে রাখে। সেনাবাহিনী হচ্ছে বুর্জোয়া কাঠামো টিকিয়ে রাখবার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম, বুর্জোয়াদের আত্মরক্ষার প্রধানতম উপায়, পুরোনো

শাসনব্যবস্থার সমর্থকদের জন্য সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্র। সেনাবাহিনীর পাশাপাশি সশস্ত্র শ্রমিকদের প্রতিবিপ্লবীরা কখনো মেনে নেয় নি, নিতে পারে না। এঙ্গেলস লিখেছেন, ফ্রান্সে শ্রমিকরা প্রতিটি বিপ্লব থেকেই নতুনভাবে সশস্ত্র হয়ে উঠছিল। কাজেই "রাষ্ট্রের কর্ণধার বুর্জোয়াদের প্রথম অবশ্যকরণীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় এই শ্রমিকদের নিরস্ত্র করা।" সশস্ত্র শ্রমিকরা ছিল নতুন এক সেনাসংগঠনের অংকুর, নতুন সামাজিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। মার্কস এবং এঙ্গেলস যেমন বার বার জোর দিয়ে বলেছেন, প্রত্যেক জয়যুক্ত বিপ্লবের প্রথম এবং অলঙ্ঘনীয় বিধি হচ্ছে পুরোনো সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে তার জায়গায় নতুন একটা বাহিনী দিয়ে তাকে প্রতিস্থাপিত করা ('The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky' Lenin. ***Selected Works,*** Vol. 3, Progress Publishers, 1971)।

৪৭. '৭৬-এর জুনে জাসদের কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদের সাথে সাক্ষাৎকারের অপ্রকাশিত মূল পাঠ থেকে।

৪৮. 'An Interview with Toaha' ***Holiday*** (Dhaka), 178 October. 1976. এছাড়াও দেখুন, ঐ একই পত্রিকায় তোয়াহার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর আবেদ এলাহী ও হায়দার আকবর খান রনোর দুটো পৃথক সমালোচনা 'On Mohammad Toaha's Views' 24 October. 1976. *প্রাগুক্ত*।

৪৯. Maniruzzaman. ***Asian Survey,*** February 1976. pp. 126—7.

৫০. ***The Bangladesh Times,*** 31 July, 1976.

৫১. রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট সাতই নভেম্বর ও পরবর্তী সঘটনাবলি সাম্যবাদ, ৪র্থ সংখ্যা, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬ (ইংরেজি অনুবাদ থেকে পুনঃঅনূদিত)।

৫২. 'Dateline Delhi—For the Last Time' ***Far Eastern Economic Review.*** 20 February. 1976.

৫৩. 'The State Vs. Purna Chandra' (Sayem. J.) ***Dhaka Law Reports.*** (1970), pp. 289-92.

৫৪. 'Martial Law 20th Amendment Regulation 1976', ***The Bangladesh Times,*** 31 July, 1976.

পরিশিষ্ট : তাহেরের শেষকথা

এটাই হচ্ছে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে অনুষ্ঠিত বিশেষ সামরিক ট্রাইবুন্যালের সামনে একুশে জুন থেকে সতেরো-ই জুলাই, ১৯৭৬-এর মধ্যে দেয়া কর্নেল আবু তাহেরের জবানবন্দী। তাহেরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিদ্রোহের। পূর্ণ গোপনীয়তার মধ্যে পুরো বিচার অনুষ্ঠিত হয়। অনেকের মতে স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশে এটাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিচার। অথচ এই বিচারানুষ্ঠান সম্বন্ধে কোন রকম খবর ছাপানোর ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এখন পর্যন্তও এই বিচারের ঘটনাগুলো ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার ওপর বাংলাদেশে পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ। তবুও এই জবানবন্দী এখানে প্রকাশ করা হল।

বর্তমান সংস্করণের আগে সাতাত্তরের আগস্টে বোম্বে (বর্তমানে মুম্বাই) থেকে ছোট ও অসম্পূর্ণ আকারে **ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি**-এর বিশেষ সংখ্যায় এই একই বিষয়বস্তু প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম পাওয়া পাঠটির সূত্র হচ্ছেন বাংলাদেশ সামরিক আইন প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ জনৈক ভদ্রলোক। সঙ্গত কারণেই তাঁর নাম উহ্য থাকছে। এই পাঠটি ছিল অসম্পূর্ণ। তাহেরের জবানবন্দীর খণ্ডাংশ বিশেষ। ১৯৭৭-এর শেষের দিকে তাহেরের বক্তব্যের একটি বাংলা ভাষ্য ঢাকায় প্রচারিত হতে থাকে। এর শিরোনাম ছিল **রণাঙ্গণ থেকে ফাঁসির মঞ্চ**। প্রথম প্রকাশিত পাঠ থেকে এটা ছিল আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক। বাংলা পাঠের ভূমিকায় বলা হয়েছিল যে এটা পূর্ণ বক্তব্যের অংশ-বিশেষ মাত্র। প্রায় চার দিন ধরে তাহের তাৎক্ষণিকভাবে বলে যান। শুনানি কক্ষে উপস্থিত অনেক আইনজীবী, সহ-অভিযুক্ত ও সামরিক অফিসার তাহেরের বক্তব্য লিখে নিয়েছিলেন। সে সময় একজন কোর্টনিবন্ধক ছিলেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত বিচারের সরকারি কাগজপত্র দেখার অনুমতি পাওয়া যায় নি। বাংলা পাঠের ভূমিকায় লেখক লিখেছিলেন যে তাহের খুব দ্রুত ও সাবলীল ভঙ্গীতে বলে যান, সেজন্যে, অনেক সময়ই সব কথা লেখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দুটো পাঠ পাশাপাশি নিয়ে দেখা যায় হয়তো একটার কোন অনুচ্ছেদ বেশি সম্পূর্ণ, অন্যটার আরেকটা অনুচ্ছেদ আরো পরিপূর্ণ। তাহেরের জবানবন্দীর যতদূর সম্ভব একটা পরিপূর্ণ ও সঠিক ভাষ্য প্রকাশের ইচ্ছায় তাই দুটোর সম্মিলিত সম্পাদনা করা হয়েছে। এখনো অনেক জায়গাই অসম্পূর্ণ, তবুও একদিন গোপন মিলিটারি ট্রাইবুন্যালের আরাকাইবগুলো সাধারণের তদন্তের জন্য খুলে দেয়া হলে আশা করা যায় কাট-ছাঁট ছাড়াই একটা পূর্ণ পাঠের খোঁজ পাওয়া যাবে।

(কর্নেল আবু তাহের ট্রাইবুন্যালের সামনে তাঁর বক্তব্য ইংরেজিতে প্রদান করেছিলেন। মূল ইংরেজি পাঠ আমাদের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব হয় নি।

লিফশুলৎসের বইয়ের পাঠটি কিছুটা মূল ইংরেজি কিছুটা **সমগ্র জনতার মধ্যে আমি প্রকাশিত** পুস্তিকায় প্রকাশিত বাংলা জনতার পাঠের পুনঃ অনুবাদ। বর্তমান বাংলা পাঠটির ক্ষেত্রে মূলত **সমগ্র জনতার মধ্যে আমি প্রকাশিত** পুস্তিকার বাংলা পাঠটি অনুসরণ করা হয়েছে। কারণ এই পাঠটি আগে থেকেই বহুল প্রচলিত।—অনুবাদক)

কর্নেল আবু তাহের

জনাব চেয়ারম্যান ও ট্রাইবুন্যালের সদস্যবৃন্দ, আপনাদের সামনে দণ্ডায়মান এই মানুষটি, যে মানুষটি আদালতে অভিযুক্ত সেই একই মানুষ এই দেশের মুক্তি ও স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্য রক্ত দিয়েছিল, শরীরের ঘাম ঝরিয়েছিল। এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত পণ করেছিল। এটা আজ ইতিহাসের অধ্যায়। একদিন সেই মানুষটির কর্মকাণ্ড আর কীর্তির মূল্যায়ন ইতিহাস অতি অবশ্যই করবে। আমার সকল কর্মে, সমস্ত চিন্তায় আর স্বপ্নে এদেশের কথা যেভাবে অনুভব করেছি তা এখন বোঝানো সম্ভব নয়।

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! এই দেশের সঙ্গে আমি রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ। আর এরা কিভাবে অস্বীকার করে এই দেশের অস্তিত্বে আমি মিশে নেই। যে সরকারকে আমিই ক্ষমতায় বসিয়েছি, যে ব্যক্তিটিকে আমিই নতুন জীবন দান করেছি, তারাই আজ এই ট্রাইবুন্যালের মাধ্যমে আমার সামনে এসে হাজির হয়েছে। এদের ধৃষ্টতা এতবড়ো যে তারা রাষ্ট্রদ্রোহিতার মতো আরো অনেক বানানো অভিযোগ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে বিচারের ব্যবস্থা করেছে। আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তার সবই বিদ্বেষপ্রসূত, ভিত্তিহীন, ষড়যন্ত্রমূলক। সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

এই-ট্রাইবুন্যালের রেকর্ডকৃত দলিলপত্রেই দেখা যায় যে উনিশ শ' পঁচাত্তর-এর ৬ই ও ৭ই নভেম্বর ঢাকা সেনানিবাসে আমার নেতৃত্বে সিপাহী অভ্যুত্থান হয়। সেদিন এভাবেই একদল বিভ্রান্তকারীর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র নির্মূল করা হয়। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বন্দীদশা থেকে মুক্তি পান আর দেশের সার্বভৌমত্বও থাকে অটুট। এই যদি হয় দেশদ্রোহিতার অর্থ তাহলে হ্যাঁ, আমি দোষী। আমার দোষ আমি দেশে শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছি।[১] এদেশের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছি। সেনাবাহিনী প্রধানকে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করেছি। সর্বোপরি বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্নে মানুষের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছি। সেই দোষে আমি দোষী।

এর জন্য সেই ছিয়াত্তরের একুশে জুন থেকে আমাকে এভাবে ভয় দেখানো ও কষ্ট দেয়ার কোন দরকার ছিল না। পঁচাত্তরের সাতই নভেম্বর বিচারপতি সায়েমের যে সরকারকে আমরা ক্ষমতায় বসিয়েছি তারা এসব ভালভাবেই জানে। কতগুলো নীতির প্রশ্নে আমরা ঐকমত্যে পৌঁছেছিলাম। সব রাজবন্দীর মুক্তি দেয়ার কথা ছিল। রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করতে দেয়ার কথা ছিল, আর একটা সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল একটা সরকার গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। দেশবাসী এর সবই জানে। তারা তা কৃতজ্ঞতার সাথে মনে রেখেছে।

আমাকে এভাবে জেলের মধ্যে এমন এক নিম্ন আদালতের সামনে বিচার করার জন্য হাজির করা হয়েছে। এটা দেশ ও জাতির জন্য চরম অপমানজনক। আপনাদের কোন অধিকার নেই আমার বিচার করবার।

আমার বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগগুলো খণ্ডন করার আগে আপনাদের সামনে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই যা এখানে উল্লেখ করা হবে খুবই প্রাসঙ্গিক।

পঁচিশে মার্চের সেই কালোরাত্রির কথা আমার মনে পড়ছে। পাকিস্তানি সেনারা বর্বর আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমাদের দেশবাসীর ওপর। সেদিন চাপিয়ে দেয়া এক যুদ্ধে জয়ী হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল না। হেরে গেলে আমাদের ওপর চেপে বসতো এক জঘন্যতম দাসত্ব। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা তাদের পত্রপত্রিকায় তো প্রকাশ্যেই ঘোষণা দিয়েছিল, বাঙালিরা উচ্চশিক্ষার যোগ্য নয়। তাদের দৌড় থাকবে মাদ্রাসা পর্যন্তই। বাঙালিরা এমনকি দেশপ্রেমিক-ও নয়, তাদের সংস্কৃতি নিচু মানের। এদেরকে শুধু উর্দুভাষাতেই কথা বলতে বাধ্য করা উচিত।

যখন থেকে আমার দেশের মানুষের অবস্থা সম্বন্ধে ভালভাবে বুঝতে শুরু করি, তখন থেকেই আমি পাকিস্তানের ধারণাটার সাথে কখনোই একমত হতে পারি নি। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করতে বাঙালির নিজেদের জন্য একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়তে পারে না—এ ধারণাটাই আমি কখনো মেনে নিতে পারি নি। তখন থেকে আমি সবসময় চেয়েছি আমার দেশের জনগণের মুক্তি ও বাঙালি জনসাধারণের জন্য একটা ন্যায় ভিত্তিক আবাসভূমি। আমি জানি না, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে আমার মতো আর কতোজন বাঙালি অফিসার এভাবে একটা স্বাধীন বাংলাদেশের কথা চিন্তা করেছিলেন। নিজের বেলায় এতটুকু বলতে পারি—স্বাধীনতার এই স্বপ্ন এক ধ্রুবতারার মতো আমার সব কাজে পথ দেখিয়েছে।

আমার এখনও মনে পড়ে পাকিস্তানিরা আমাদের কি পরিমাণ ঘৃণা করতো। তাদের অবজ্ঞা ও উপহাস ছিল অসহ্য। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে আমাদের শেখানো হতো বাঙালিরা হচ্ছে 'বিশ্বাস ঘাতকের জাত'। তাদের জন্ম হয়েছে গোলামী করার জন্য। বাঙালিদের 'পাক্কা মুসলমান' ও 'দেশপ্রেমিক' নাগরিক বানানো পাকিস্তানিদের পবিত্র দায়িত্ব।

আমরা যারা পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলাম তাদের জন্য সেই দিনগুলো ছিল চরম পরীক্ষার মতো। সেদিন আমি দেশ ও জাতির ডাকে সাড়া দিতে দ্বিধা করি নি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেল হেড কোয়ার্টার থেকে যখন নির্দেশ গেল—'সবকিছু পুড়িয়ে দাও, যাকে সামনে পাও তাকেই মেরে ফেল', তখন পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত কারুরই আর জানতে বাকি ছিল না সামরিক জান্তার বর্বর চক্রান্ত।

পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিতে আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করি নি। ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান জানেন আমি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পেছনের সারির অফিসার ছিলাম না। আমি ঐতিহ্যবাহী বালুচ রেজিমেন্টে কমিশন পাই, পরে পাকবাহিনীর অভিজাত প্যারা কম্যান্ডো গ্রুপ 'স্পেশাল সার্ভিসেস গ্রুপ'-এ আমি যোগ

দেই। দীর্ঘ ছয় বছর আমি সেই গ্রুপের সাথে যুক্ত ছিলাম। একজন সৈনিক ও অফিসার হিসেবে সামনাসামনি শত্রুকে মোকাবেলা করতে আমি কখনো ভয় পাই নি। পাক-ভারত যুদ্ধে আমি কাশ্মীর ও শিয়ালকোট সেক্টরে যুদ্ধে অংশ নেই। সেই যুদ্ধের ক্ষত চিহ্ন এখনো আমার শরীরে বর্তমান।

বাঙালি অফিসারদের মধ্যে একমাত্র আমিই 'মেরুন প্যারাসুট উইং' পাই। আমি এক সাথে একশত পঁয়ত্রিশটি স্ট্যাটিক লাইন জাম্প করার কৃতিত্বের অধিকারী। আমার কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য আমাকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। জর্জিয়া প্রদেশের ফোর্ট বেনিং-এ অবস্থিত রেঞ্জার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আমাকে রেঞ্জার পুরস্কারে ভূষিত করে। আমি নর্থ ক্যারোলিনার ফোর্ট ব্র্যাগ-এ অবস্থিত স্পেশাল ফোর্সেস অফিসার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রী লাভ করি। উল্লেখযোগ্য, তখনো পর্যন্ত আর কোন বাঙালি অফিসার এই কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হন নি।

এখন সামরিক জান্তার বর্বরতম ফ্যাসিস্ট আক্রমণের দিনগুলোয় ফিরে আসা যাক। সত্তরের সাধারণ নির্বাচনের সময় আমি যুক্তরাষ্ট্রে এক প্রশিক্ষণে অংশ নিচ্ছিলাম। দেশে ফিরে দেখি নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানের দল আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জিতেছে। দেশে ফিরে অনেকের সাথে আলাপ করার পর আমার বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়া হবে না। সামরিক জান্তা আর তার দোসর জুলফিকার আলী ভুট্টো—এই লোকটা পাকিস্তানি রাজনীতির অধ্যায়ে একটা জ্বলন্ত অভিশাপ, এরা কোনদিনই রাষ্ট্রক্ষমতার আইনানুগ দাবিদার আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। তাদের দৃঢ় সংকল্প ছিল যে তারা কখনো পাকিস্তানে কোন বাঙালিকে ক্ষমতাসীন হতে দেবে না, শেখ মুজিবকে তারা কোনভাবেই মেনে নিতে বা সহ্য করতে পারছিল না। আমি অঘটনের আভাস পেলাম। তাই আমার স্ত্রী ও পরিবারকে ময়মনসিংহে আমার গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেই। সময়টা ছিল ফেব্রুয়ারি মাস। শীতের প্রকোপ তখনো যায় নি।

আমি জানতাম বাঙালিরা কোন অন্যায়কেই বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবে না, তারা প্রতিরোধ করবেই। আমার মনে হচ্ছিল দেশের মানুষকে স্বাধীন করার দিন এগিয়ে আসছে। আমি জানি না কয়জন এভাবে ভাবতেন। যতই দিন যাচ্ছিল, আমাদের মনমানসিকতার-ও দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল। আস্তে আস্তে আমরা অনিবার্য ঘটনাবলির জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠলাম।

পঁচিশে মার্চ আমি কোয়েটায় স্কুল অফ ইনফ্যান্ট্রি অ্যান্ড ট্যাক্টিক্স-এ উচ্চতর কারিগরি প্রশিক্ষণে অংশ নিচ্ছিলাম। সন্ধ্যা হবার সাথে সাথেই জানতে পারলাম সেদিন রাতে বাংলাদেশে কড়া ব্যবস্থা নেয়া হবে। সারা রাত আমি কোয়েটার খালি রাস্তায় হেটে বেড়ালাম। কি হচ্ছে তা আঁচ করবার চেষ্টা করছিলাম। সেই রাতে আমার জাতির ওপর কি সীমাহীন দুর্যোগ নেমে এসেছিল তা আমি এখনো কল্পনা করতে পারি না। বাংলাদেশের বুকে যেন এক নারকীয় গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল।

পরদিন ছাব্বিশে মার্চ ভোরেই রেডিওতে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ভাষণ শুনলাম। সে এক ভয়ংকর মুহূর্ত। এক নতুন দেশের জন্মযন্ত্রণা যেন আমি অনুভব করছিলাম। বাংলাদেশে তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য পাক হানাদার বাহিনীর প্রতি আমার বিদ্বেষ কোন গোপনীয় ব্যাপার ছিল না। তাই অচিরেই আমি উপরওয়ালাদের অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ালাম। হঠাৎ করে আঠাশে মার্চ স্কুল অফ ইনফ্যান্ট্রি অ্যান্ড ট্যাক্‌টিক্‌সের কোর্স বন্ধ করে দেয়া হলো, আমাদের সবাইকে যার যার ইউনিটে যোগ দিতে আদেশ দেয়া হলো।

সে সময় অনেক বাঙালি জুনিয়র অফিসার আমার কাছে এসে পরামর্শ চায়। আমি তাদের স্পষ্টভাষায় বলে দেই মাতৃভূমির প্রতিই হচ্ছে তাদের একমাত্র কর্তব্য। তাদের একমাত্র চিন্তা হবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে যেয়ে যুদ্ধে যোগ দেয়া। এরা আমাকে আরো জানায় যে তারা কোয়েটায় অবস্থানরত অন্য আরো সিনিয়র অফিসারদের কাছে গেলে তারা এদের উপদেশ দেয়া তো দূরের কথা সৌজন্য করে আপ্যায়ন কিংবা কথাটা পর্যন্ত বলে নি, শেষে আবার পাকিস্তানি প্রভুরা তাদের আনুগত্য নিয়ে সন্দেহ করে। আমার মনোভাব জানার পরে এ সমস্ত সিনিয়র অফিসাররা আমাকে শুধু এড়িয়েই চলে নি. এমনকি কথা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল।

আজকে সেই একই অফিসারদের অনেকেই এদেশের জাতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে বেশ উচ্চপদে রয়েছেন। আর তাদের কয়েকজন আবার আমার বিচার করার জন্য এখানে উপস্থিত রয়েছেন।[২] পঁচিশ মার্চের আগে এই অফিসাররা শেখ মুজিবের সাথে তাদের পরিচয় ও সম্পর্কের কথা জাহির করতে বেশ উৎসাহ পেতেন, পঁচিশে মার্চের পর এরাই আবার তাঁকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যা দেন।

> ভাষণের এই পর্যায়ে ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান তাহেরকে বাধা দেন। এখানে এই ধরনের কথা বলা যাবে না বলে তাঁকে জানানো হয়। কোর্টের মধ্যে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। তাহের চেয়ারম্যান কর্নেল ইউসুফ হায়দারকে বলেন—'আমার বক্তব্য রাখার সুযোগ না দিলে আমি বরং চুপ থাকাটাই ভালো মনে করব। এমন নিম্নস্তরের ট্রাইবুন্যালের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে নিজের ওপরই ঘৃণা লাগে।' আরো বাকবিতণ্ডার পরে তাহেরের আইনজীবীদের হস্তক্ষেপের ফলে অবশেষে তাহেরকে বক্তব্য রাখার অনুমতি দেয়া হয়।

পরে আমি জেনে খুব খুশি হই যে যাদের আমি পালিয়ে আসতে উৎসাহ দিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট নূর ও সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট এনাম পালিয়ে যেতে পেরেছে ও স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। কয়দিন পরই পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করার অভিযোগে আমাকে কোয়েটায় নজরবন্দী করা হয়।

স্কুল অফ ইনফ্যান্ট্রি অ্যান্ড ট্যাক্‌টিকস্-এর কমান্ডান্ট বি. এম. মোস্তফার সাথে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল। কিছুদিন পর তাঁর হস্তক্ষেপে আমার বিরুদ্ধে আনীত

অভিযোগগুলো তুলে নেয়া হয়। খারিয়াঁ সেনানিবাসে একটা মাঝারি রেজিমেন্টের সাথে আমাকে যুক্ত করা হয়। আমাকে আমার আগের কমান্ডো ইউনিটে ফিরে যেতে দেয়া হয় নি। এই ইউনিটকে ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছিল আমার ভাইদের হত্যা করার জন্য। এরাই শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে।

খারিয়াঁ সেনানিবাসে আমি ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী ও ক্যাপ্টেন দেলোয়ারকে আমার সাথে পালিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করি। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের মীরপুর শহরে কর্মরত এক বাঙালি প্রকৌশলীর সাথে আমরা যোগাযোগ করি। তিনি আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেয়ার আর সীমান্ত পর্যন্ত যাবার ব্যবস্থা করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু নির্ধারিত দিনে মীরপুর পৌঁছে দেখি, অবাক কাণ্ড, ইঞ্জিনীয়ার সাহেব বাসায় তালা মেরে পরিজনসহ সটকে পড়েছেন। এই প্রথম দেখলাম বাঙালি অভিজাত শ্রেণীর দেশপ্রেমের নমুনা।

বিকেলটা আমরা তার লনে বসেই কাটিয়ে দিলাম। রাত নেমে আসার সাথে সাথেই আমরা পাহাড়ি পথে রওয়ানা দিলাম। আমার দু সহযাত্রী ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী ও ক্যাপ্টেন দেলোয়ারের পাহাড়ি পথে হেটে অভ্যাস নেই। কয়েক ঘণ্টা পর তারা আর এগোতে পারল না। আমাদের আবার ফিরে আসতে হলো খারিয়াঁতে।

তখন পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় এক হাজার বাঙালি অফিসার ছিলেন। তাদের অনেককেই বললাম পালিয়ে যেয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিতে। বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আসলে এদের দেশপ্রেম ড্রইং রুমের তর্কবিতর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এর বেশি না। পরে যখন আমি এবোটাবাদে বালুচ রেজিমেন্টাল সেন্টারে বদলি হয়ে যাই সেখানেও আমি বাঙালি অফিসারদের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করতাম।

সৌভাগ্যবশত এদের মধ্যে রাওয়ালপিণ্ডির জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে কর্মরত মেজর জিয়াউদ্দিন আমার সাথে পালাতে রাজি হয়ে যান। আমাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে দেরি হলো না। আমার যা সঞ্চয় ছিল তা দিয়ে একটা পুরনো গাড়ি কিনলাম। গাড়ি দিয়ে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছানো যাবে। পিণ্ডি থেকে আমরা দু'জন রওয়ানা দিলাম। পথে ঝিলাম কেন্টনমেন্ট থেকে ক্যাপ্টেন পাটোয়ারীকে সঙ্গে নিলাম। দিনের আলো তখনো কিছু বাকি ছিল। তাই শিয়ালকোট কেন্টনমেন্টে মেজর মঞ্জুরের বাসায় উঠলাম। আমাদের পরিকল্পনা শুনে মেজর মঞ্জুর চুপ হয়ে গেলেন। তার মধ্যে কোন উৎসাহ দেখলাম না। কিন্তু তার স্ত্রী জেদ ধরলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাদের সাথে পালিয়ে যেতে রাজি হলেন। তার বাঙালি ব্যাটম্যানসহ মেজর মঞ্জুর সপরিবারে আমাদের সাথে যোগ দিলেন। সন্ধ্যার পর গাড়ি করে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছলাম। তারপর গাড়ি ফেলে রেখে হাটতে হাটতে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আমরা ভারতে পৌঁছি।

আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম এই ভেবে যে এবারে সব শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি ঘটবে। কিন্তু যুদ্ধের পর দেশের কি দশা হলো? যে যুদ্ধের বেশিরভাগই হয়েছিল স্বদেশের মাটির বাইরে, সে যুদ্ধ আমাদের জনগণকে কি সুফল উপহার দিতে পারে। নিরস্ত্র, শান্তিপ্রিয়, ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ সীমান্ত পাড়ি দিয়েছিল আশ্রয় আর খাবারের খোঁজে। বেঁচে যাওয়া সৈন্যদের মধ্যে বেশিরভাগই তাই-ই করেছিল। আওয়ামী লীগসহ

অন্যান্য নেতৃত্বদানকারী গণসংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলোর ছিল ঐ একই উদ্দেশ্য। কিন্তু জনগণের ম্যান্ডেট লাভকারী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ছিল এক বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্য। দুর্ভাগ্যবশত সম্পূর্ণ অস্ত্রবলহীন একটি নিরস্ত্র জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আওয়ামী লীগ কোনরকম চিন্তাই করে নি। সম্ভাব্য ভয়াবহতা মোকাবেলা করার জন্য আগে থেকে তারা জনগণকে কোনভাবেই প্রস্তুত করে নি। একটা আধুনিক সেনাবাহিনীর সশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধে বেসামরিক জনসাধারণের সংঘাতে যাওয়াটা নিঃসন্দেহে একটা চরম বোকামি। আমাদের ক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটেছিল, আর সে জন্য আমাদের মূল্যও দিতে হয়েছে চরম। দেশের অজস্র মানুষের ভাগ্যের কথা চিন্তা করে আওয়ামী নেতৃত্ব যদি আন্তরিক ও সাহসী ভূমিকা নিত তাহলে ঘটনা প্রবাহ অন্যরকম হতে পারতো। কিন্তু তা হয় নি।

আমাদের সৈন্যদের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা খাটে। অত্যাসন্ন জাতীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। পরিণামে বিশ্বের এক অন্যতম প্রধান আধুনিক, সুশৃংখল ও সুশিক্ষিত নিয়মিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কিভাবে অনিয়মিত বাহিনীর মাধ্যমে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ পরিচালনা করা যাবে তার কোন পরিকল্পনাই ছিল না। ভারত খুব খুশি মনেই আমাদের শিশুদের, সাধারণ মানুষকে আর সেনাদের প্রতি খাবার আর আশ্রয়ের নিরাপত্তা দিতে প্রস্তুত ছিল। কারণ ভারত জানতো এতে করে আন্তর্জাতিক রাজনীতি আর কূটনীতির অঙ্গনে তাদের সম্মান ও ভাবমূর্তি বেড়ে যাবে। আর উপমহাদেশে তার আধিপত্য বিস্তারের নীতিও আরও সুদৃঢ় হবে। আসলে বাংলাদেশের ঘটনায় ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থ ও সম্পদের দিক থেকে সবচাইতে বেশি লাভবান হয়েছিল ভারত। যুদ্ধের ব্যাপারে এতটুকু বলতে পারি—আমাদের অফিসার ও সৈনিকরা মূলত ভারতীয়দের ইচ্ছামাফিক তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছিল।

আমি যখন যুদ্ধে যোগ দেই তখন মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী আমাকে বিভিন্ন সেক্টর পরিদর্শনের নির্দেশ দেন। উদ্দেশ্য ছিল আমাদের খুঁতগুলো চিহ্নিত করে আরও সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ পরিচালনার উপায় খুঁজে বের করা। প্রথমেই আমি এগারো নং সেক্টরে যাই। ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা নিয়ে বিস্তৃত এই সেক্টরের সীমানা। বর্তমানে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এই এলাকায় প্রচলিত সামরিক কায়দায় একটা ব্রিগেড গঠনের চেষ্টা করছিলেন। তখন এই সেক্টরের নেতৃত্বে ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সন্ত সিং।

আমি অবাক হয়ে গেলাম, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে একজন ভারতীয় অফিসারকে! রণকৌশলগত দিক দিয়ে ঢাকা আক্রমণ করার জন্য এই সেক্টরের গুরুত্ব অপরিসীম। আমি ঘুরে ঘুরে সেক্টরের পর সেক্টর পরিদর্শন করতে থাকলাম। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আমি মিশে গেলাম; তাদের সাথে আমার চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা নিয়ে খোলামেলা আলাপ করলাম। আমার কাছে এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে যাদের ওপর আমাদের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তাদের কেউই সেই দায়িত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। সোজা কথায় তারা ব্যর্থ হয়েছেন। আমাদের জাতীয় যুদ্ধ হয়ে উঠেছিল প্রায় হেরে যাওয়া একটা ব্যাপার। অথচ আমরা যুদ্ধ করছিলাম একটা অত্যন্ত সুশৃংখল নিয়মিত বাহিনীর বিরুদ্ধে।

আমাদের শত্রুরা সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত সুশিক্ষিত। তারা কঠোরভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত। অন্যদিকে আমাদের এমন কোন সুসংহত নেতৃত্বই ছিল না যা এই কিংবর্তব্যবিমূঢ় হতাশাগ্রস্ত সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। আমাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সুযোগ-সুবিধা কিংবা অস্ত্রশস্ত্রের কিছুই ছিল না। অথচ আমাদের নেতৃত্ব তখন বিদেশের মাটিতে একটি প্রচলিত ধরনের সেনাবাহিনী গঠনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। আমাদের ছেলেদের কখনও সাহস কিংবা দেশপ্রেমের অভাব ছিল না। কিন্তু তারা ছিল অসংগঠিত, বিভিন্ন দলে বিভক্ত স্বাধীনতাপাগল দামাল ছেলে—যারা কখনও পাক বাহিনীর সামরিক আক্রমণের কথা চিন্তাও করে নি। অসতর্কাবস্থায় এরা তাই পাকিস্তানিদের জঘন্য গণ হত্যার শিকার হয়।

আমাদের যুদ্ধকৌশলের দুর্বলতাগুলো খুব সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল। প্রথমত, আমরা সমস্ত জাতি এক যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়েছিলাম। অথচ আমাদের সামনে কোন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিলনা। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া গেরিলা যুদ্ধ কখনো বিকাশ পেতে পারে না। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এই সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, গেরিলা যুদ্ধের তাত্ত্বিক কাঠামো সম্বন্ধে নেতৃত্বের কোন ধারণাই ছিল না। কর্নেল ওসমানী, মেজর জিয়া, মেজর খালেদ ও মেজর শফিউল্লাহর মতো অন্যরা যারা নিয়মিত সামরিক কাঠামোর লোক তাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই ছিলেন যারা গেরিলা যুদ্ধ কিভাবে সংগঠন করতে হয় সে সম্বন্ধে কোন ধারণা রাখতেন। গেরিলা যুদ্ধের স্বাভাবিক বিকাশের পথে বড় বাধা ছিল এসব প্রচলিত অফিসার আর তাদের প্রচলিত কায়দার সামরিক চিন্তাভাবনা।

তৃতীয়ত, স্বাধীনতা যুদ্ধের সামরিক নেতাদের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য ও অফিসারদের কতকগুলো নিয়মিত ব্রিগেডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হচ্ছিল। দেশের ভেতর মুক্তিসেনারা বীরের মতো যুদ্ধ করে যাচ্ছিল, কিন্তু তাদের অনুপ্রেরণা দেয়ার মতো কেউই ছিল না। বাইরে থেকে বাধা না আসলে হয়তো দেশের ভেতরেই স্বাভাবিকভাবে যোগ্য ও দূরদর্শী নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারত। আগরতলা আর মেঘালয়ে মেজর খালেদ মোশাররফ আর জিয়ার নেতৃত্বে যে দুই ব্রিগেড সুশিক্ষিত সৈন্য গড়ে উঠেছিল তাদের যদি মুক্তিযুদ্ধে সঠিকভাবে নিয়োজিত করা হত তাহলে সাত আট মাসের মধ্যেই দেশের মাটিতে ক্ষেতমজুর— কৃষকদের নিয়ে বিশ ডিভিশনের এক বিশাল গেরিলা বাহিনী প্রস্তুত হয়ে যেত।

আমার কথা শুনে কর্নেল ওসমানী যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিলেন। তখন তাঁর কাজকর্ম খুব সহজই ছিল। ঘুমানোর জন্য তাঁর একটা নিশ্চিত আশ্রয় ছিল আর ঘুরে ঘুরে সেক্টর সদরগুলো দেখার জন্য তাঁর হাতে থাকত অনেক সময়। আসলে এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধের নামে এক প্রহসন। নেতৃত্ব ছিল পাগলামীর নামান্তর। একটা গেরিলা যুদ্ধ আর একটা নিয়মিত যুদ্ধের মধ্যে আসলে অনেক তফাৎ। কিন্তু কর্নেল ওসমানী কখনোই তা' বুঝতে চান নি। গেরিলা যুদ্ধের প্রথম দিকেই একটা নিয়মিত বাহিনী গঠনের চিন্তা করা একদম ঠিক নয়। ঠিক সময় এলে একটা গেরিলা বাহিনী নিজেই নিয়মিত বাহিনীতে পরিণত

হয়। এগারো নং সেক্টরের কৌশলগত গুরুত্ব দেখে সেখানেই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেই! বিভিন্ন সেক্টরে ঘুরে বেড়ানোতে শুধু সময়ের অপচয় হতো মাত্র। ওসমানী অসন্তুষ্ট মনেই আমাকে সেক্টর প্রধান নিয়োগ করলেন।

> এতটুকু বলার পর তাহেরকে আবার বাধা দেয়া হয়। আবারো বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়। তাহেরকে তাড়াতাড়ি শেষ করতে বলা হয়। কর্নেল তাহের তখন বলেন—'এভাবে আমাকে বাধা দিতে থাকলে জবানবন্দী বলে যাওয়াটা অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমার জীবনে অনেক নিচ লোকই চোখে পড়েছে, কিন্তু আপনার মতো নিচ মনের লোক আমি একজনও দেখি নি।'

চতুর্থত, বাংলাদেশের মাটিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাদের সিদ্দিকী, মেজর আফসার, খলিল, বাতেন ও মারফতের মতো আরো অনেক খ্যাতিমান মুক্তিযোদ্ধার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর এক বিশাল দল গড়ে উঠেছিল। (মূল বইয়ে কাদের সিদ্দিকীর নাম নেই তবে কর্নেল তাহেরের অনুজ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগী ড. আনোয়ার হোসেন এই অনুবাদককে জানান যে কর্নেল তাহের অন্যদের সাথে কাদের সিদ্দিকীর কথাও উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ট্রাইবুন্যালের সামনে প্রয়াত কর্নেল যখন তাঁর জবানবন্দী উপস্থাপনা করেন মামলার একজন সহ-অভিযুক্ত হিসেবে ড. আনোয়ার হোসেন তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।—অনুবাদক)। স্বাধীনতা যুদ্ধে যুদ্ধরত শক্তিগুলোর এটাই ছিল স্বাভাবিক বিকাশ। দুর্ভাগ্যবশত কর্নেল ওসমানী নিয়মিত সামরিক কমান্ড ও প্রবাসী সরকার এই স্বাভাবিক শক্তির বিকাশকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। তার ফলে নিয়মিত বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয় নি।

পঞ্চমত, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বি. এস. এফ.) অশুভ প্রভাবে মুক্তিবাহিনীর কিছু সংখ্যক ছেলের মাথায় ব্যক্তিগত লোভ-লালসার চিন্তা ঢুকে যায়। এদের আদর্শগত ভিত্তি ছিল নিতান্তই দুর্বল। এরাই অনেক লুট-পাটের ঘটনার নায়ক।

এসব সমস্যা সমাধানের পথ ছিল একটাই। তা হচ্ছে বাংলাদেশের মাটিতে মুক্তাঞ্চলে প্রবাসী সরকারকে নিয়ে আসা। আমি সামরিক নেতৃত্বকে বোঝাতে চেষ্টা করি যেন ভারতীয় এলাকা থেকে সরে এসে বাংলাদেশের ভেতরে কোথাও সদর দপ্তর স্থানান্তর করা হয়। মেজর জিয়া আমার সাথে একমত হলেন। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম সব কমান্ড সীমান্তের এপারেই স্থানান্তর করা উচিত। আমাদের ইচ্ছা ছিল সব সেক্টরে সমন্বিতভাবে একটা নির্ধারিত সময়ে এই কাজ হোক। তাই সেক্টর কমান্ডাদের একটা সভা ডাকা হলো। কর্নেল ওসমানীসহ মেজর খালেদ মোশাররফ আর মেজর শফিউল্লাহ আমার প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। বাংলাদেশের মাটিতে সেক্টর সদর দপ্তর স্থানান্তর করা থেকে আমাদের বিরত করা হলো। শুধু তাই না, মেজর জিয়ার ব্রিগেডকে আমার সেক্টর থেকে সরিয়ে নেয়া হলো।

আমার সঙ্গে থেকে যান ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট হামিদুল্লাহ নামে একজন বিমান বাহিনীর অফিসার ও যুদ্ধাহত অফিসার সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মান্নান। যাতায়াতের জন্য আমাকে শুধু একটা জিপ দেয়া হয়েছিল। আমাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে

ব্রিগেডিয়ার সিং ভাবলেন তিনি তার ইচ্ছামতো আমাদের চালাতে পারবেন। ব্রিগেডিয়ার সীমান্ত থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে 'তুরা' নামে এক জায়গায় আমার সেক্টরের সদর দপ্তর স্থাপন করার পরামর্শ দিলেন। উল্লেখযোগ্য, আমাদের প্রায় সব সেক্টর সদর-ই ছিল ভারতের অনেক ভেতরে। আমাদের প্রায় সব সেক্টর অধিনায়কই তাদের তাবুতে কার্পেট ব্যবহার করতেন।

আমি ব্রিগেডিয়ার সিং-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। কামালপুর শত্রু-ঘাটির আট শ' গজ দূরে অবস্থিত হলো এগারো নং সেক্টরের সদর দপ্তর। আমি ভালাভাবেই জানতাম আমাকে সেই পথের ওপর জোর দিতে হবে যা আমাদেরকে এনে দেবে চূড়ান্ত বিজয়। আর এই পথ হবে কামালপুর, জামালপুর ও টাঙ্গাইল হয়ে শেষে ঢাকা। কামালপুরই ছিল ঢাকার প্রবেশদ্বার।

আমি এখন সুবেদার আফতাব নামে এক বীর মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতি স্মরণে কিছু বলতে চাই। সে ছিল দুঃসাহসী এক নিবেদিতপ্রাণ যোদ্ধা। সে কখনো দেশের মাটি ত্যাগ করে নি। কিছু সংখ্যক যুবককে নিয়ে সে বীরত্বের সাথে পাক দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল; মওকা পেলেই সে তাদেরকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়তো। এগারো নং সেক্টরে আসার পর আমি শুনতে পেলাম সুবেদার আফতাব এক বিদ্রোহী। সে কারো আদেশ-নির্দেশের তোয়াক্কা করে না। রৌমারি থানার কোদালকাঠি নামে এক জায়গায় সে অবস্থান করছিল। বারবার নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও সে কখনোই মেজর জিয়া বা ব্রিগেডিয়ার সিং-এর সাথে দেখা করে নি। আমি আফতাব সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহী হয়ে পড়লাম। আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আঠারো মাইল হেটে আমি কোদালকাঠি পৌছাই। সে দারুণ অবাক হয়ে গিয়েছিল। দেশের ভূখণ্ডে খোদ একজন অফিসারকে দেখবে তা সে কখনো আশাই করে নি। যুদ্ধ কৌশল নিয়ে তাঁর সাথে আলাপ করতে গিয়ে দেখি আমাদের মত অভিন্ন। তার পর থেকেই আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে যাই।

> ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান আবারো বাধা দিলেন। তাহের তখন বলেন—'এই কথাগুলো খুবই প্রাসঙ্গিক। আপনিতো (চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করে) যুদ্ধে ছিলেন না, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা থাকবে।' এই বলে তিনি আবার শুরু করেন।

সুবেদার আফতার আমাকে জানালো, সে রৌমারী থানার এক বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছে। ষোলই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই এলাকাগুলো মুক্তাঞ্চল ছিল। যুদ্ধ চলাকালীন পুরো সময়টাই সে ভারতের অভ্যন্তরে ঘাঁটি স্থাপন করতে অস্বীকার করে আসছিল। সে রাত আমি তাঁর সাথে কথা বলে কাঁটিয়ে দিলাম। দেখলাম সে খুব সহজেই মানুষের নেতৃত্বের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে পেরেছে। তার সামনে নিজেকে বড়ো ছোট লাগলো।

সুবেদার বললো সে যে কোন কিছু করার জন্য প্রস্তুত আছে। ওদের অবস্থানের কিছু দূরে এক চরে পাকিস্তানিদের এক ঘাঁটি ছিল। আমি তখন তাদের তাড়িয়ে দেয়ার জন্য

একটা আক্রমণের প্রস্তাব দিলাম। দু শিবিরের মধ্যে একটা নদী। পাকিস্তানিরা যে চরে অবস্থান নিয়েছিল তা একটা খালের মাধ্যমে দু ভাগ হয়ে আছে। আমি আর সুবেদার একটা নৌকায় করে চরে পৌঁছলাম। দেখি পাকিস্তানিরা চরের অন্য প্রান্তে। এই চর ছিল ঘন কাশবনে ঢাকা। আমি পরিকল্পনা করলাম একদল যোদ্ধা রাতে নদী পার হয়ে খালের পাশের কাশবনে অবস্থান নেবে। পরদিন ভোরে একটা ছোট দল বের হবে পাকিস্তানিদের হাতে তাড়া খাবার জন্যে। চারদিনের মধ্যেই সুবেদার আফতাব পরিকল্পনা মাফিক অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

যা আশা করেছিলাম তাই হলো, পাকিস্তানিরা ভোরবেলার দলটাকে পিছু ধাওয়া করলো। এভাবে ওদের মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যুফাঁদের আওতার ভেতরে নিয়ে আসা হলো। প্রথম দফা আক্রমণেই পাকিস্তানিদের বেশ বড়োসড়ো ক্ষতি হলো। ওরা দু'বার আক্রমণ করলো, দু'বারই আক্রমণ প্রতিহত হওয়ায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তারা পালিয়ে গেল। এভাবেই রৌমারী থানাসহ বাহাদুরাবাদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা আমাদের দখলে আসে।

এরপর আমরা চিলমারীর ওপর নজর দেই। চিলমারী যুদ্ধ একবহু-পরিচিত সংঘর্ষ। আমি এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম। তখন মাঝ-সেপ্টেম্বর। একরাতে বারো শ' মুক্তিযোদ্ধা ব্রহ্মপুত্র নদী পাড়ি দিল। আমাদের লক্ষ্যস্থল পাহারায় ছিল দু কোম্পানি পাকিস্তানি নিয়মিত সৈন্য। এছাড়া অজস্র রাজাকার তো ছিলই। আমরা চব্বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত চিলমারী বন্দরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলাম। আর প্রচুর গোলাবারুদ ও যুদ্ধবন্দী নিয়ে ফিরে এসেছিলাম। এটা ছিল এক দুঃসাহসিক আক্রমণ। এমন নজির যুদ্ধের ইতিহাসে কমই আছে।

সেপ্টেম্বর মাস থেকেই রেডিওতে প্রচারিত স্বাধীনতা যুদ্ধ সক্রান্ত সংবাদের বেশির ভাগেই থাকতো আমাদের সেক্টরের খবর। এমনকি বিখ্যাত আমেরিকান সাংবাদিক জ্যাক অ্যান্ডারসনও আমাদের এলাকার অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এই বলে— 'কামালপুরের ঘাঁটির পতনের মানেই হচ্ছে পাকিস্তানিরা এই যুদ্ধে হেরে গেছে।' কামালপুরের যুদ্ধ পরিচালনার সময় আমার একটা পা হারাই। আমার সেক্টরের ছেলেরাই সবার আগে ঢাকা পৌঁছেছিল।

স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা বলতে যেয়ে অবশ্যই আমাদের মুক্তিসেনাদের দেশপ্রেম, বীরত্ব ও আনুগত্যের উল্লেখ করতে হয়। এরাই জাতির সেরা সন্তান। এছাড়াও গ্রামের সব গরিব গ্রামবাসীদের কথাও বলতে হয়। এরা আমাদের দিয়েছে খাদ্য ও আশ্রয়। শত্রুসেনার অবস্থান সম্পর্কে তারা আমাদের সব সময় খবর দিয়েছে। এরা ছিল আমাদের সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণার উৎস। আমার হাতে তো তা-ও একটা অস্ত্র ছিল। এদের কাছে কিছুই ছিল না। আমাদের সাহায্য করতে যেয়ে এরা পাকিস্তানি বুলেটের শিকার হয়েছে। তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, তাদের স্ত্রী-মা-বোনদের সম্মান হানি করা হয়েছে। এরাই ছিল আসলে সবচেয়ে বেশি সাহসী। এদের কথা আমি সব সময় মনে রাখবো।

ষোলই ডিসেম্বরের মধ্যেই বাংলাদেশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে চলে যায়। এতে আশ্চর্যের কিছুই ছিল না। আমাদের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের অসাবধানী, অযোগ্য ও দেউলিয়া আচরণের জন্যই প্রবাসী সরকার সম্পূর্ণভাবে অকেজো হয়ে

পড়েছিল। এর ফলে ভারতীয় হস্তক্ষেপের একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়। ঘাঁটিগুলো ভারতে থাকায় ও ভারতের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে আমাদের নিয়মিত সৈন্যরা ছিল মানসিকভাবে দুর্বল ও হীনমন্য। বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে পা দেয়া মাত্রই ভারতীয় সৈন্যরা বিজিত সম্পদের ওপর বিজয়ী বাহিনীর মতোই হাত বসালো।

জনাব চেয়ারম্যান ও ট্রাইবুন্যালের সদস্যবৃন্দ, আমি এখানে গর্বের সাথে উল্লেখ করতে চাই একজনের কথা। ভারতীয় সৈন্যদের লুট-পাটের বাধা দেয়ার স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন এই কমান্ডিং অফিসার। তিনি মেজর এম. এ. জলিল; নয় নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক। তিনিও এই মামলায় একজন সহ-অভিযুক্ত। জলিলকে এর জন্য যথেষ্ট খেসারত দিতে হয়েছিল। দেশপ্রেমিকের দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে তাঁকে দীর্ঘদিন কারা প্রাচীরের অন্তরালে কাটাতে হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাবার পর মেজর জলিল আরেকটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। তরুণ বিপ্লবীদের প্রতিনিধি আ. স. ম. আবদুর রব (যিনি এ মামলায় একজন সহ-অভিযুক্ত)-এর সহযোগিতায় মেজর জলিল বাংলাদেশের প্রথম বিরোধী দল জাসদ গঠন করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য আ. স. ম. আবদুর রব সেই ব্যক্তি যিনি প্রথম ঐতিহাসিক বটতলা সমাবেশে একাত্তরের দোসরা মে তারিখে আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে উল্লেখ করছি, মেজর জলিলকে যে ট্রাইবুন্যালে বিচার করে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল আমি ছিলাম সেই ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান।

এ মামলায় অভিযুক্ত আমার ভাইদের সম্পর্কে আমি এখন দু'-একটি কথা বলতে চাই। মনে হয় ইচ্ছা করে আমাদের পুরো পরিবারটাকে ধ্বংস করে দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে আমার বড় ভাই ফ্লাইট সার্জেন্ট আবু ইউসুফ খান সৌদী আরবে; সৌদী বিমান বাহিনীতে ডেপুটেশনে ছিলেন। যুদ্ধ বাধলে পালিয়ে এসে তিনি আমাদের সেক্টরে যোগ দেন। এখন শুনতে যে রকম লাগুক না কেন এটাতো ঠিক যে ঐ ঘাঁটিতে তখন আরো অনেক বাঙালি অফিসার ছিলেন, তারা কেউই পালিয়ে এসে যুদ্ধে যোগ দেন নি। বরং-এরা পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যান ও পরে তিহাত্তর সালে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। জামালপুরের যুদ্ধে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তাকে 'বীর বিক্রম' পদকে ভূষিত করা হয়। তিনিই প্রথম পাকিস্তানি কমান্ড হেডকোয়ার্টারে পৌছান ও জেনারেল নিয়াজীর আত্মসমর্পণ প্রত্যক্ষ করেন। তিনি জেনারেল নিয়াজীর গাড়ির পতাকার গর্বিত মালিক। আমার বিশ্বাস পৃথিবীতে এমন ভালো লোকের সংখ্যা খুব কম।

আমার ভাই আনোয়ার-ও এই মামলায় অভিযুক্ত। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষক। যুদ্ধের সময় সে আমার সেক্টরের একজন স্টাফ অফিসার ছিল। সে এমন মানুষ—একজন মুক্তিযোদ্ধা কিংবা কোন শরণার্থীর প্রয়োজন হতে পারে এই ভেবে সে নিজে দ্বিতীয় কোন শার্ট পর্যন্ত ব্যবহার করতো না। আমার ভাই বাহারের কথাও উল্লেখ করতে হয়। এই সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই কিছুদিন আগে আরো তিনজন বীর যুবকের সাথে তাঁকে আমরা হারিয়েছি। সে যুদ্ধ চলাকালে প্রায় দু'শ মুক্তিযোদ্ধার একটি কোম্পানি পরিচালনা করতো। নভেম্বরের মধ্যেই সে নেত্রকোণা মহকুমার (বর্তমানে জেলা-অনুবাদক) বেশির ভাগ এলাকা মুক্ত করেছিল। অসাধারণ বীরত্বের জন্য তাকে দু'

দু'বার 'বীর প্রতীক' পদকে ভূষিত করা হয়। সে-ও এদেশের এক জাতীয় বীর। আমার সর্বকনিষ্ঠ ভাই বেলাল। সে-ও এই সরকারের ঘৃণ্য চক্রান্তের হাত থেকে রক্ষা পায় নি। তাঁকেও এই মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁকেও দু'বার 'বীর প্রতীক' পদকে ভূষিত করা হয়েছিল। আমরা ছয় ভাই ও দু বোন স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলাম। যুদ্ধে অবদানের জন্য আমাকে 'বীর উত্তম' পদক দেয়া হয়। আমাদের মধ্যে চার জনকে তাদের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সামরিক সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল। এসবই ইতিহাসের অংশ। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের গ্রাম লুণ্ঠিত হয়। আমার বাবাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ও তাঁর ওপর অত্যচার করা হয়। আমি এখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার কাদেরের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। তাঁর হস্তক্ষেপে আমার বাবা ছাড়া পেয়েছিলেন। (পাঠকের কৌতূহল মেটানোর উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছিলেন কর্নেল তাহেরের যে কয়জন ভাই-বোন তাঁদের নাম নিচে দেয়া হলো। জ্যেষ্ঠতার নিম্নক্রম অনুসারে এঁরা হচ্ছেন আবু ইউসুফ খান, আবু সাইদ আহমেদ, ড. আনোয়ার হোসেন, শাখাওয়াত হোসেন বাহার, ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল, ডালিয়া আহমেদ ও ডা. জুলিয়া আহমেদ।—অনুবাদক)।

শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর বাংলাদেশ ত্যাগের পর সবাই আশা করেছিল যে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে, শুরু হবে একটা সুষ্ঠু ও ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ। আমাদের আশা ছিল একটা সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর বাংলাদেশের, যে দেশে দুর্নীতি ও মানুষে-মানুষে শোষণের কোন সুযোগ থাকবে না। যেদেশে সাধারণ মানুষের সাথে দেশরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের সম্পর্ক হবে আন্তরিক। এই সেনাবাহিনী হবে আমাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই আশা এই স্বপ্ন নিয়েই আমাদের জাতি বারবার এত কঠোর সংগ্রামে নেমেছে। এই আশায় বারবার উচ্চারিত হয়েছে আমাদের আদর্শ ও মূল্যবোধ। কিন্তু তা হয়ে ওঠে নি। কেউ বুঝে ওঠার আগেই অধঃপতনের ধারা শুরু হয়ে যায়।

বাহাত্তরের এপ্রিলে পা-এ অস্ত্রোপচারের পর অন্যান্য আনুষঙ্গিক চিকিৎসা শেষে আমি দেশে ফিরে আসি। স্বদেশে ফিরেই আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল পদে যোগ দেই। আমি সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনি, তখন এই কাজ ছিল দুঃসাধ্য। এই ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান নিজেই জানেন কিভাবে আমি অবৈধ কাজ কর্মের দায়ে ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত ও মেজর জেনারেল শফিউল্লাহর মতো আরো কিছু উচ্চপদস্থ অফিসারের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেয়ার উদ্যোগ নেই। অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছিল এরা অবৈধভাবে টাকা-পয়সা ও সম্পদ কুক্ষিগত করেছেন। পরিস্থিতি তখন ছিল খুবই নাজুক। আমার বিশ্বাস ছিল অফিসারদের অবৈধ উপায়ে অর্জিত যে কোন সম্পত্তি ফেরত দিতে হবে। কেবল তখনই তারা বুক ফুলিয়ে সাহসের সাথে খাঁটি সৈনিকের মতো দেশের মুক্তি যোদ্ধাদের সামনে এসে দাঁড়াতে পারবে।

আমি কখনোই এই নীতির প্রশ্নে আপস করি নি। কয়েক মাসের মধ্যেই আমাকে কুমিল্লায় অবস্থিত ৪৪তম ব্রিগেডের নতুন অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়। কুমিল্লা ব্রিগেডের

দায়িত্ব গ্রহণ করার পর পরই আমার অধীনস্থ অফিসারদের নির্দেশ দেই মুক্তিযুদ্ধের আগে বা পরে অবৈধ উপায়ে যা কিছু অর্জিত হয়েছে তার সব ফিরিয়ে দিতে হবে। এরা আমার নির্দেশ পালন করেছিলেন। আমার হাতে ছিল একদল অফিসার যাদের ছিল একটা স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ নীতিবোধ।

এটাকেই আমি নেতৃত্বের স্বরূপ মনে করেছি। আমি সব সময় মানুষের ভালো দিকটা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছি, কোন মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নেয়াকে আমি ঘৃণা করতাম ও এড়িয়ে চলতাম।

স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং ঢাকা ও কুমিল্লা সেনানিবাসে অর্জিত অভিজ্ঞতা আমাকে উৎপাদন-বিমুখ স্থায়ী সেনাবাহিনীকে একটা বিপ্লবী গণবাহিনীতে পরিণত করতে উদ্বুদ্ধ করে। আমার সৈনিক জীবনে লক্ষ করেছি, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে একটা স্থায়ী সেনাবাহিনী জাতীয় অর্থনীতির ওপর একটা বোঝাস্বরূপ। এ ধরনের সেনাবাহিনী সমাজ প্রগতির পক্ষে একটা বিরাট বাধা। জাতীয় উৎপাদনে এদের কোন অবদান থাকে না। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যে নিষ্ঠা, আনুগত্য ও ত্যাগের মনোভাব লক্ষ করেছিলাম, তাতে স্বাধীনতা উত্তরকালে একটা উৎপাদনমুখী বিপ্লবী গণবাহিনী (আর. পি. এ.) গঠন করা অসম্ভব বলে আমার মনে হয় নি। আর এতে আমি সব চেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ হয়েছি।

সামরিক বাহিনীর অনেকেরই এটা জানার কথা যে আমি কুমিল্লা ব্রিগেডকে একটা 'গণবাহিনী'র মতো করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলাম। মুক্তিসংগ্রামে অংশ গ্রহণকারী সেনাদের নিয়ে একটা শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করতে আমি সব সময় চেষ্টা করেছি। আমার সামরিক সংগঠন প্রক্রিয়ার মূল নীতি ছিল 'উৎপাদনমুখী সেনাবাহিনী'। এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের অফিসার ও সৈনিকরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শ্রমিক-কৃষকের সাথে উৎপাদনে অংশ নেয়। আমরা নিজেরা জমিতে হাল ধরেছি, নিজেদের খাবার উৎপাদন করে নিয়েছি। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে গ্রামের মানুষের বাড়ি গিয়েছি। এটাই ছিল স্বনির্ভর হওয়ার একমাত্র পথ। আমি যথেষ্ট আনন্দের সাথে স্মরণ করছি কুমিল্লা ব্রিগেডের অফিসারদের কথা, তারা আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন ভালোভাবেই। এঁরা আমাদের ইউনিটকে কিছু দিনের মধ্যেই একটা উৎপাদনমুখী শক্তিতে পরিণত করেন।

কিন্তু বিরোধ দেখা দিল অল্প দিনের মধ্যেই। মুজিব সরকার সেনাবাহিনী গঠনের ব্যাপারটা উপেক্ষা করে কুখ্যাত আধা-সামরিক শক্তি রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলায় মন দেয়। ভারতীয় উপদেষ্টা ও অফিসারেরা এই রক্ষীবাহিনী গঠনে সরাসরি জড়িত ছিল। আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে আমার পূর্ণ বিরোধিতার কথা জানালাম। যুদ্ধের সময় ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত গোপন চুক্তির ব্যাপারেও আমি তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীর কাছে প্রতিবাদ জানাই।

সেনা সদর দপ্তরে খুঁজলেই আমার প্রতিবাদের দলিল পাওয়া যাবে। এই দু কারণে আর তাছাড়া বর্তমান প্রচলিত উপনিবেশিক কাঠামোর সেনাবাহিনী থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে আসার ব্যাপারে আমার ঐকান্তিক ইচ্ছার কারণে সরকারের সাথে আমার মতবিরোধ

সৃষ্টি হয়। কিছুদিনের মধ্যেই লে কর্নেল জিয়াউদ্দিনের সাথেও সরকারের মতবিরোধ দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবাহিনী থেকে সরে আসাটাই প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ালো। বাহাত্তরের নভেম্বরে লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিন ও আমি সেনাবাহিনী থেকে সরে এলাম। আমরা দু'জন নিজেদের পথে এগিয়ে গেলাম, পছন্দমত রাজনীতি বেছে নিলাম। যখনই সম্ভব হতো আমরা পরস্পরের খোঁজ-খবর নিতাম আর ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে একে অন্যকে অবহিত করতাম।

১৯৭৩ সালে আমি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ড্রেজার সংস্থার পরিচালকের পদে একটা চাকরি নেই। আমি যে সময় দায়িত্ব নেই তখন এই সংস্থা ইতিমধ্যেই দুর্নীতি ও অব্যবস্থার কবলে পড়ে ধ্বংস-প্রায় অবস্থায় পৌঁছেছিল। অল্পদিনের মধ্যেই আমরা একে কর্মক্ষম করে তুলি। ১৯৫২ সালে সংস্থার জন্ম লগ্নের সময় থেকে আর কখনোই এর আয় অত বেশি ছিল না। সংস্থার একজন পাহারাদার থেকে শুরু করে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পর্যন্ত সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন আমি কিভাবে এই সংস্থা চালিয়েছি।

> তাহের তাঁর বক্তব্যের এই পর্যায়ে আবার বাধা পেলে বলেন—'জনাব চেয়ারম্যান ও মামলার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আমাকে সবকিছু বলতেই হবে। তাহলে আপনারা আমাকে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন.....'

১৯৭৫ সালের পনেরই আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকার কি ভূমিকা পালন করেছে তা দেশবাসী সবারই জানা। কিভাবে একের পর এক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছিল ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো গলাটিপে হত্যা করা হচ্ছিল তা এখন দলিলের বিষয়। এক কথায় বলা যায়, আমাদের লালিত সব স্বপ্ন, আদর্শ ও মূল্যবোধগুলো এক এক করে ধ্বংস করা হচ্ছিল। গণতন্ত্রের অসম্মানজনক কবরশয্যা রচিত হয়েছিল মানুষের অধিকার মাটি চাপা পড়েছিল আর সারা জাতির ওপর চেপে বসেছিল এক ফ্যাঁসিবাদী একনায়কতন্ত্র।

ফ্যাঁসিবাদী নির্যাতনের গর্ভে ধীরে ধীরে জন্ম নিল ফ্যাঁসিবাদবিরোধী গণপ্রতিরোধ আন্দোলন। এটা খুবই দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক যে এ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের অন্যতম প্রধান পুরুষ শেখ মুজিবুর রহমান শেষ পর্যন্ত একনায়কে পরিণত হয়েছিলেন। অথচ মুজিব তাঁর সংঘাতময় রাজনৈতিক জীবনে কখনো স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের সাথে আপস করেন নি। তিনি ছিলেন এককালে আমাদের গণতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক। অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও তিনিই ছিলেন একমাত্র নেতা যিনি জনগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন, জনগণের মধ্যে তাঁর ব্যাপক ভিত্তি ছিল। প্রতিদানে জনগণ তাঁকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। জনগণই মুজিবকে সম্মান এনে দিয়েছিল, বহুগুণ করে তাঁকে নায়কের প্রতিমূর্তি দিয়েছিল। আসলে জনগণ তাদের নেতা হিসেবে মুজিবকে তাদের মন মতো করে গড়ে নিয়েছিল। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'মুজিব' নামটি ছিল যেন রণহুংকার। শেখ মুজিব ছিলেন জনগণের নেতা। এ কথা অস্বীকার করার অর্থ সত্যকে অস্বীকার করা। তাই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তাঁর ভাগ্য নির্ধারণ

করার অধিকার শুধু জনগণেরই ছিল। যে মুজিব জনগণকে প্রতারিত করে একনায়ক হয়ে উঠেছিলেন, সে মুজিবকে জনগণের শক্তি দিয়ে মোকাবেলা করাটাই হতো সব থেকে ভালো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে জনতা মুজিবকে নেতার আসনে বসিয়েছিল সেই জনতাই একদিন একনায়ক মুজিবকে উৎখাত করত। ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত করার অধিকার জনতা কাউকে দেয় নি।

১৯৭৫ সালের পনেরই আগস্ট। একদল সামরিক অফিসার আর সেনাবাহিনীর একটা অংশবিশেষ শেখ মুজিবকে হত্যা করে। সেদিন সকালে দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারির এক অফিসার আমাকে টেলিফোন করেন। তিনি বললেন মেজর রশীদের পক্ষ থেকে তিনি আমাকে একটা খবর জানাচ্ছেন। তিনি আমাকে 'বেতার বাংলাদেশ' ভবনে যেতে বললেন। তিনি আমাকে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের খবরও দিয়েছিলেন। আমাকে জানানো হয় যে প্রয়াত রাষ্ট্রপতির একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী খোন্দকার মোশতাক আহমেদ এই অফিসারদের নেতৃত্বে রয়েছেন।

আমি তখন রেডিও চালিয়ে জানতে পেলাম শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে আর খোন্দকার মোশতাক ক্ষমতা দখল করেছেন। এই খবর শুনে আমি যথেষ্ট আঘাত পাই। আমার মনে হল এতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হবে। এমনকি জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এর মধ্যে আমার কাছে অনেক টেলিফোন আসতে থাকল। সবার অনুরোধ ছিল আমি যেন বেতার বাংলাদেশ ভবনে যাই। আমি ভাবলাম, যেয়ে দেখা উচিত পরিস্থিতি কি দাঁড়িয়েছে।

সকাল নটায় বেতার ভবনে গেলাম। মেজর রশীদ আমাকে একটা কক্ষে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি খোন্দকার মোশতাক, তাহেরুদ্দিন ঠাকুর, মেজর ডালিম আর মেজর জেনারেল এম. খলিলুর রহমানকে দেখতে পাই। খোন্দকার মোশতাকের সাথে আমি কিছুক্ষণ আলোচনা করলাম। আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে এই মুহূর্তে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করাটাই সবচেয়ে জরুরি। মেজর রশীদ আমাকে আরেকটা কক্ষে নিয়ে গেল ও জানতে চাইল আমি মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে উৎসাহী কিনা। আমি তাকে পরামর্শ দিলাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানদের সাথে অবস্থা পর্যালোচনা করে একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌছাতে। মেজর রশীদ জোর দিয়ে বললো আমি আর লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিন-ই এই অবস্থা সামাল দিতে সক্ষম। সে বললো অন্য কোন বাহিনী প্রধানের ওপর কিংবা কোন রাজনীতিবিদের ওপর তার কোন আস্থা নেই। আমি তার প্রস্তাব নাচক করে দিলাম। আমি তাকে পরামর্শ দিলাম বাকশালকে বাদ দিয়ে অন্য সব দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক শক্তিকে নিয়ে যেন একটা সর্বদলীয় সরকার গঠন করা হয়।

খোন্দকার মোশতাকের সামনে বিবেচনার জন্য আমি বেশ কয়েকটা প্রস্তাব রেখেছিলাম।

১। অবিলম্বে সংবিধান স্থগিতকরণ,[৩]

২। দেশব্যাপী সামরিক শাসন ঘোষণা ও তার প্রবর্তন,

৩। দলমত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দান,

৪। বাকশালকে বাদ দিয়ে একটা সর্বদলীয় গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার গঠন করা,

৫। জাতীয় সংসদ গঠনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে একটা জাতীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

খোন্দকার মোশতাক আমার সব কথা মন দিয়ে শুনলেন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলেন। রশীদ বার বার জোর দিয়ে বলতে থাকল যে আমি যেন ভঙ্গভবনে খোন্দকার মোশতাকের শপথ গ্রহণের সময় উপস্থিত থাকি। সকাল সাড়ে এগারোটায় আমি বেতার ভবন ত্যাগ করি গভীর উদ্বেগ নিয়ে। আমার মনে হচ্ছিল মোশতাক তার কথা রাখবেন না, বরং উল্টোপথে এগুবেন। আমার আরো মনে হচ্ছিল এটা শুধু মোশতাক আর সেই অফিসারদের দলের ব্যাপার নয়। এর পেছনে অন্য কিছু বা অন্য কারো হাত রয়েছে। তারাই আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছে।

আমার ধারণাই সত্যে পরিণত হল। জাতির উদ্দেশ্যে দেয় ভাষণে খোন্দকার মোশতাক আমার সঙ্গে আলোচিত একটা কথাও উল্লেখ করেন নি। দুপুর বেলায় আমি যখন ভঙ্গভবনে পৌছলাম ততক্ষণে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমি হত্যাকাণ্ডে জড়িত অফিসারদের সাথে আলোচনায় বসি। এদের নেতা ছিল মেজর রশীদ। সেদিন সকালে মোশতাকের কাছে আমি যে প্রস্তাবগুলো রেখেছিলাম এদের কাছেও সেগুলো পেশ করি। সুনির্দিষ্ট কোন পদক্ষেপ নেয়ার আগেই যাতে জরুরি ভিত্তিতে সব রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়া হয় সে ব্যাপারে আমি বেশ জোর দিয়েছিলাম।

আমাদের আলোচনার শেষের দিকে আলোচনায় যোগ দেয়ার জন্য জেনারেল জিয়াকে ডেকে আনলাম। আমার প্রস্তাবগুলো সবাই সমর্থন করলেন। এ ব্যাপারে সবাই একমত হয়েছিলেন যে সে মুহূর্তে সেটাই ছিল একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ। পরদিন মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ ও মেজর জেনারেল এম. খলিলুর রহমানের সাথে আমার অনেকক্ষণ আলাপ হয়। তারাও আমার প্রস্তাবগুলো সঠিক ও গ্রহণীয় মনে করেন।

কিন্তু ষোলই আগস্ট আমি বুঝতে পারলাম মেজর রশীদ ও মেজর ফারুক শুধু আমার নামটাই ব্যবহার করছে, যাতে তাদের নেতৃত্বাধীন সিপাহীরা এই ধারণা পায় যে আমি তাদের সাথে রয়েছি। পরদিন ১৭ই আগস্ট এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান এই ঘটনার নেপথ্য নায়ক। আমি আরো বুঝতে পারলাম যে এর পেছনে খোন্দকার মোশতাকসহ আওয়ামী লীগের উপরের তলার একটা অংশও সরাসরি জড়িত। এই চক্র অনেক আগেই যে তাদের কর্মপন্থা ঠিক করে নিয়েছিল সেটাও আর গোপন রইল না। সেদিন থেকেই আমি ভঙ্গভবনে যাওয়া বন্ধ করি ও এই চক্রের সাথে সব যোগাযোগ ছিন্ন করি।

জেনারেল ওসমানীকে খোন্দকার মোশতাকের সামরিক উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি আমার সাথে সব সময়ই যোগাযোগ রক্ষা করতেন, তাঁর সাথে প্রায়ই আমাকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হতো। তিনি সব সময় লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিনের খোঁজ খবর জানতে চাইতেন ও তার সাথে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করতেন। মুজিব সরকার জিয়াউদ্দিনের ওপর মৃত্যু পরোয়ানা জারি করেছিল। আমি তাঁকে

বলেছিলাম, আগে এই পারোয়ানা উঠিয়ে নিয়ে তার বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ থেকে তাকে অব্যাহতি দিতে হবে। তাহলেই শুধু জিয়াউদ্দিন তাঁর সাথে দেখা করতে পারেন।

সেপ্টেম্বরেরর শেষের দিকে মেজর রশীদ রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোশতাক আহমেদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটা প্রস্তাব আনলেন। আমি আর লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিন একটা রাজনৈতিক দল গঠন করবো; আনুষঙ্গিক সব খরচ বহন করবেন তিনি। আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। তাকে জানিয়ে দেই যে সব রাজনৈতিক বন্দীদের অবশ্যই মুক্তি দিতে হবে। এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে মোশতাকের কোন রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল না। সেনাবাহিনীতে একটা ছোট অংশ বাদে অন্য কোথাও তার কোন সমর্থন ছিল না, সাধারণ মানুষের মধ্যেও তার সমর্থন ছিল না।

আসুন, আমরা মোশতাক সরকারের কথায় ফিরে আসি। মোশতাক সরকার জনগণকে মুজিব সরকারের চাইতে কোন ভালো বিকল্প উপহার দিতে পারে নি। পরিবর্তন হয়েছিল শুধু এই, রুশ-ভারতের প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত হয়ে দেশ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপুটে ঝুঁকে পড়ে ছিল। এ ছাড়া দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ছিল আগের মতোই। সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয় নি। অন্যদিকে রাজনৈতিক নিপীড়ন আগের থেকেও বেড়ে গিয়েছিল। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অত্যাচারের প্রবৃত্তি যেন দিন দিন বেড়েই চলছিল। জনগণের দুর্ভোগ ও হয়রানি আগের মতোই চলতে থাকে, রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার অব্যাহত থাকে। সত্যিকার অর্থে দেশ তখন একটা বেসামরিক একনায়কতন্ত্র থেকে সামরিক আমলাতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রের কবলে পড়ে গিয়েছিল।

মানুষ অস্থির হয়ে ওঠে। তারা এই অবস্থা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। রুশ-ভারতের চর আর জনতার কাছে অগ্রহণযোগ্য অসামাজিক শক্তিগুলো পরিস্থিতির সুযোগ নেয়ার জন্য ওঁৎ পেতে ছিল। মোশতাক সরকারের ব্যর্থতার সুযোগে আমাদের জাতীয় স্বার্থকে বিপন্ন করার জন্য একটা ষড়যন্ত্র চক্র গড়ে ওঠে। এই চক্রান্তের নায়ক ছিলেন উচ্চাভিলাষী ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পঁচাত্তরের তেসরা নভেম্বর খালেদ মোশাররফ ক্ষমতায় আসেন।

সেদিন আমি অসুস্থ, আমার নারায়ণগঞ্জের বাসায় বিছানায় পড়ে ছিলাম। ভোর চারটার দিকে টেলিফোন বেজে উঠল। ওপারে ছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। আমার সাহায্য তার খুব দরকার। কিন্তু কথা শেষ হলো না, লাইন কেটে গেল। সেদিন বেশ কিছু সিপাহী, এন. সি. ও. ও জে. সি. ও. আমার নারায়ণগঞ্জের বাসায় এসে হাজির হন। তাদের সবার সাথে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কেবল তাদের কয়েকজনের সাথে আমি আমার শোবার ঘরে কথা বলেছিলাম। তারা আমাকে জানালো যে খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের পেছনে ভারতীয়দের হাত রয়েছে। বাকশাল ও তাদের সহযোগীরা ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে নেমেছে। তারা আমাকে আরো জানালো যে বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও অন্যান্য কোরের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা বিরাজ করছে। যে কোন মুহূর্তে গোলাগুলি শুরু হতে পারে।

আমি তাদেরকে শান্ত থাকতে ও সৈন্যদের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন করে পরিস্থিতি সম্পর্কে সবার মতামত জানার জন্য পরামর্শ দেই। এ ছাড়া আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিপন্নকারী যে কোন ধরনের তৎপরতার বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে বলে দেই। আমি তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলাম, সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের কর্তব্য হলো সীমান্ত রক্ষা এবং প্রজাতন্ত্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা। আমাদের মতো সমাজে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নাক গলানো সশস্ত্র বাহিনীর কর্তব্য নয়। অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের মূলে রয়েছে উচ্চাভিলাষী অফিসারদের ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব। এসব অফিসার তাদের নিজ স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। আর তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তারা সাধারণ সৈন্যদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। দেশ কিভাবে পরিচালিত হবে তার চূড়ান্ত রায় দেবার মালিক হচ্ছে জনসাধারণ। আমি সৈন্যদের আরো বললাম কোন অবস্থাতেই যেন তারা নিজেদের মধ্যে গোলাগুলি শুরু না করে। আমি তাদের বরং ব্যারাকে ফিরে যেতে বললাম। জনমানুষের সাথে সংহতি প্রকাশের প্রয়োজনে যে কোন মুহূর্তে একসাথে আঘাত হানবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ক্ষমতালোভী সামরিক ব্যক্তিদের উচ্চাভিলাষ গুঁড়িয়ে দেবার এটাই ছিল একমাত্র পথ।

তেসরা নভেম্বরের পর কি ভয়ার্ত নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এ জাতির জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল তা সবারই জানা। কিভাবে আমাদের জাতীয় আত্মসম্মানবোধ লঙ্ঘন করা হচ্ছিল তার নিশ্চয়ই বিস্তারিত বিবরণের দরকার পড়ে না। এটা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে খালেদ মোশাররফের পেছনে ভারতীয়দের হাত রয়েছে। একদিকে যখন দেশের এই সার্বভৌমত্ব-সংকট অন্যদিকে ঠিক তখনই রিয়ার-অ্যাডমিরাল এম. এইচ. খান আর এয়ার ভাইস-মার্শাল এম. জি. তাওয়াব খালেদ মোশাররফকে মেজর জেনারেলের ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছিলেন। সে ছিল এক করুণ দৃশ্য। এসব নিচলোকদের আমি করুণা করি। এই কাপুরুষগুলো যখন হাঁটু গেড়ে জীবন ভিক্ষা করছিল তখন আমাকে জাতির উদ্যম ও মনোবল সমুন্নত রাখতে কাজে নামতে হয়েছিল। আর জিয়াউর রহমান? সে তখন খালেদের হাতে বন্দী, অসহায়ভাবে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। তাওয়াব ও খানেরা তখন কোথায় ছিল? তারা তখন তাদের নতুন দেবতার বুট লেহনে ব্যস্ত। এই সব কাপুরুষদের এদেশের সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত রাখা আমাদের শোভা পায় না।

চৌঠা নভেম্বর বিকেলে মেজর-জেনারেল জিয়াউর রহমান তার এক আত্মীয়ের মাধ্যমে আমার কাছে খবর পাঠান। জিয়ার অনুরোধ ছিল আমি যেন সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে আমার প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তাকে মুক্ত করি ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করি। আমি তাকে শান্ত থাকতে ও মনে সাহস রাখতে বলেছিলাম। আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হবে ও সব ধরনের অপকর্মের অবসান ঘটানো হবে। এদিকে সেনাবাহিনীর সজাগ অফিসার ও সৈন্যরা আমাকে বিশ্বাসঘাতক খালেদ মোশাররফ চক্রকে উৎখাত করার জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা নিতে অনুরোধ করে আসছিল। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি তাগিদ এসেছিল সিপাহীদের বিশেষ করে এন. সি. ও আর জে. সি. ও-দের কাছ থেকেই।

সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপক যোগাযোগ, আলোচনা ও মত বিনিময়ের পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। ছয়ই নভেম্বর আমি সৈনিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রাখলাম। ঢাকা সেনানিবাসের সব ইউনিট প্রতিনিধির মাধ্যমে সবাইকে সজাগ থাকতে ও পরবর্তী নির্দেশের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলে দেয়া হলো। ছয়ই নভেম্বর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথেই সবাইকে সতর্ক করে দেয়া হয়। সাতই নভেম্বর ভোর রাত একটায় সিপাহী অভ্যুত্থান শুরু হবে। আমাদের সিদ্ধান্তগুলো ছিল—

১। খালেদ মোশাররফ চক্রকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা,
২। বন্দীদশা থেকে জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করা,
৩। একটা বিপ্লবী সামরিক কমান্ড কাউন্সিল গঠন করা,
৪। দলমত নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দান,
৫। রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর থেকে গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার,
৬। বাকশালকে বাদ দিয়ে একটা সর্বদলীয় গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার গঠন করা,
৭। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার বারো দফা দাবি মেনে নেয়া ও তার বাস্তবায়ন করা।

সবকিছুই পরিকল্পনা মাফিক হয়। বেতার, টি. ভি., টেলিফোন, টেলিগ্রাম, পোস্ট অফিস, বিমানবন্দর ও অন্যান্য সব গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র প্রথম আঘাতেই দখল করা হয়। ভোর রাত্রে জিয়াকে মুক্ত করে দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারির সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার বড় ভাই ফ্লাইট সার্জেন্ট আবু ইউসুফ খানের সাথে আমি ভোর তিনটার দিকে সেনানিবাসে যাই। সঙ্গে ছিল ট্রাকভর্তি সেনাদল।

জিয়াকে আমি তার নৈশপোশাকে পেলাম। সেখানে ব্রিগেডিয়ার মীর শওকতসহ আরো ক'জন অফিসার ও সৈনিক ছিল। জিয়া আমাকে আর আমার ভাইকে গভীরভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। পানিভর্তি চোখে তিনি আমাদের তার জীবন বাঁচানোর জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন। তার জীবন রক্ষার জন্য জাসদ যা করেছে তার জন্য জিয়া আমার প্রতি ও জাসদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন আমরা যা বলব তিনি তাই করবেন। আমরা তখন পরবর্তী করনীয় কাজ নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করি। তখন ভোর চারটা। আমরা একসঙ্গে বেতার ভবনে পৌঁছাই। পথে আমরা তাৎক্ষণিক কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করি।

> এই পর্যায়ে ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান তাহেরকে বাধা দেন। বিচার কক্ষে বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। কর্নেল তাহের বলেন—'আমার যা বলা দরকার, তা আপনাদের শুনতেই হবে। নতুবা আমি আর কোন কথা বলবো না। ফাঁসি দিন এখনি ফাঁসি দিন আমি ভয় পাই না। কিন্তু আমাকে বিরক্ত করবেন না।... কি যেন বলছিলাম শরীফ?' (শরীফ চাকলাদার বিবাদী পক্ষের একজন সহকারী কৌসুলি—অনুবাদক) এই বলে তাহের আবার শুরু করলেন।

এর মধ্যে বেতার থেকে সিপাহী অভ্যুত্থানের ঘোষণা করা হয়েছে। জিয়াকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বেতার ভবনে যাবার পথে জিয়া শহীদ মিনারে একটা জনসমাবেশে ভাষণ দিতে রাজি হয়েছিলেন। কথামতো আমি সিপাহীদের নির্দেশ দিয়েছিলাম শহীদ মিনারে সমবেত হতে। সেখানে আমি ও জিয়া সমাবেশে ভাষণ দেবো। তা হলে তাদের অফিসারদের ছাড়াই যেই বিপ্লবী সৈনিকরা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছে সেই সৈনিকদের কাছে দেয়া অঙ্গীকার থেকে কেউই পিছু হটতে পারবে না।

উৎফুল্ল মনে সৈনিকরা শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এক সাথে এদের জড়ো করতে কিছুটা সময় দরকার। শহীদ মিনারে সমাবেশের সময় ঠিক করি সকাল দশটায়। হাজারো মানুষ খুশী মনে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তারা বিপ্লবী সৈনিকদের সাথে গলা মিলিয়ে শ্লোগান তুলছিল। চারিদিকে শুধু ফুল আর ফুল। মানুষের আনন্দ আর উল্লাসের মাঝে পুরো শহরটা যেন উৎসবের আনন্দে রঙীন হয়ে উঠেছিল।

সকাল সাড়ে আটটায় সৈনিকরা আমাকে জানালো যে খোন্দকার মোশতাক আহমেদ বেতার ভবনে ঢুকে পড়েছেন ও একটা ভাষণ দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমি তখন বেতার কেন্দ্রে গেলাম। মোশতাককে আমি খুব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলাম যে চক্রান্তের রাজনীতির দিন শেষ; তাকে এখনই বেতার কেন্দ্র ছেড়ে যেতে হবে। তিনি আমার কথা মতো বেতার কেন্দ্র ছেড়ে চলে গেলেন।

এরপর আমি সমাবেশে ভাষণ দেয়ার জন্য জিয়াকে নিয়ে আসতে সেনানিবাসে গেলাম। সেখানে পৌঁছে দেখি পরিস্থিতি বদলে গেছে। জিয়া দাড়ি কামিয়ে সামরিক পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে রয়েছেন। তাকে দেখে মনে হলো তিনি বন্দীদশার আঘাত কাটিয়ে উঠেছেন। শহীদ মিনারে যাবার কথা তুললে জিয়া সেখানে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। বিনয়ের সাথে জিয়া যুক্তি দেখালেন যে তিনি একজন সৈনিক, তার গণজমায়েতে বক্তৃতা দেয়া সাজে না। তিনি আমাকে শহীদ মিনারে যেয়ে সেনাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে বললেন। আমি বরং সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরে আসার জন্য শহীদ মিনারে নির্দেশ পাঠালাম।

এগারোটার দিকে আমরা সেনা সদর দপ্তরে একটা আলোচনায় বসি। একটা অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের ব্যাপারে আমরা নীতিগতভাবে একমত হই। সেই আলোচনায় উপস্থিত ছিলাম আমি, জিয়া, তাওয়াব, এম. এইচ, খান, খলিলুর রহমান, ওসমানী ও মুখ্য সচিব মাহবুব আলম চাষী।[৪] সরকারের ধারাবাহিকতার প্রশ্নে একটা আইনগত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। সবাই চাচ্ছিলেন বিচারপতি সায়েম দেশের রাষ্ট্রপতি হবেন। (সায়েমকে খালেদ মোশাররফ পাঁচই নভেম্বর নিয়োগ করেছিলেন)। আমি তা মেনে নিলাম কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম জিয়া হবেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হতে জিয়ার আপত্তির কারণে কিছুক্ষণ আলোচনার পর ঠিক হলো জিয়া, তাওয়াব আর এম. এইচ. খান প্রত্যেকেই উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হবেন। এদের ওপর কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় নি। ঠিক হলো বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক

হিসেবে তিন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকদের নিয়ে একটা উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করবেন। সেদিনের আলোচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তা হচ্ছে সব রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দেয়া হবে।

রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলোচনার পর রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালু করতে দেয়া হবে ও মোশতাক সরকার ঘোষিত সাধারণ নির্বাচনের নির্ধারিত সময়ের আগেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সায়েম শুধু এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চালাবেন। আমি এই সভাকে সাতই নভেম্বরের বিপ্লবের অনুক্রমকে স্বীকৃতি দিতে বললাম।

বিকেলের দিকে আমি বেতার কেন্দ্রে যাই। বিপ্লবী সৈন্যরা জিয়াউর রহমানের কাছে বারো দফা দাবি পেশের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা চাচ্ছিল তাদের দাবি পেশ করার সময় আমি সেখানে উপস্থিত থাকি। বেতার কেন্দ্র থেকে আমি জিয়াউর রহমানকে টেলিফোন করি ও সৈন্যদের প্রস্তাবের কথা তাকে জানাই। তখন সৈন্যরা প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত। বেতার কেন্দ্রের ভেতরে তারা কাউকে ঢুকতে দিচ্ছিল না। পৌনে আটটার দিকে জিয়ার সাথে আসা মোশতাক ও সায়েমকে বেতার কেন্দ্রে ঢুকতে বাধা দেয়া হয়। বিপ্লবী সৈন্যদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পেশকরা বারো দফা দাবির দলিলে জিয়ার সম্মতিসূচক স্বাক্ষরের পরই এদের বেতার কেন্দ্রে প্রবেশাধিকার দেয়া হয়।

খোন্দকার মোশতাক ও বিচারপতি সায়েম জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। আমি আর জিয়া তখন বেতার ভবনের টেলিভিশন কক্ষে, এক সাথে ভাষণ শুনছি। সায়েম তার ভাষণে আমাদের আলোচনায় নেয়া সিদ্ধান্তগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই পরদিন আটই নভেম্বর মেজর জলিল ও আ. স. ম. আবদুর রবকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়। সেদিন আমি জেনারেল জিয়াকে টেলিফোন করে এর জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই আর মতিন, ওহিদুর সহ অন্যান্য বন্দীদেরও সেই সাথে মুক্তি দিতে অনুরোধ করি।

আট তারিখে সন্ধ্যায় জিয়া আমাকে জানালেন যে, কয়েকটা ঘটনায় কিছু অফিসার মারা গেছেন। আমি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য করার প্রস্তাব দেই। আমি তখনি সেনানিবাসে আসার প্রস্তাব করি। জিয়াকে আমি আরো জানাই যে বিপ্লবী সৈন্যদের ওপর আমার কড়া নির্দেশ ছিল যাতে কোন অফিসারের ওপর এভাবে আক্রমণ করা না হয়। এগার তারিখ পর্যন্ত জিয়া আমার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেন। কিন্তু বার তারিখের পর তাকে আর পাওয়া যাচ্ছিল না। সব যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। তার সাথে আমি যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেই জিয়া আমাকে এড়িয়ে যেতেন। (জিয়া বিপ্লবী সৈনিকদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান পরবর্তীকালে অফিসার হত্যার যে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন সৈনিকরা সে হত্যার দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। পরবর্তীতে জাসদ নেতৃবৃন্দ নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে জানতে পারেন যে এই হত্যাকাণ্ডের সাথে বিপ্লবী সৈনিকদের কোন সম্পর্কই ছিল না। এই হত্যাকাণ্ডের আসল হোতা ছিলেন খোন্দকার মোশতাক আহমেদ এবং তারই নির্দেশে এক গুপ্ত ঘাতক দল এই হত্যাকাণ্ডের সূচনা করেন বলে জানা যায়। এদের উদ্দেশ্য ছিল এভাবে হত্যাকাণ্ড ও অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার মাধ্যমে বিপ্লব-উত্তরকালে সাধারণ সিপাহী-জনতা-

অফিসারদের মধ্যে গণঅভ্যুত্থানের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ জাগিয়ে তোলা। নয়ই নভেম্বর বায়তুল মোকাররমে জাসদের জনসভায় গোলাগুলির পিছনেও এই প্রতিবিপ্লবী চক্রটি তৎপর ছিলেন বলে অনেকের অভিমত। খোন্দকার মোশতাক আহমেদ ও এই প্রতিবিপ্লবী শিবিরের গোপন আঁতাত সম্বন্ধে আরো জানার জন্য দেখুন, মূল অংশের ৪১ নং টীকা।—অনুবাদক)।

তেইশে নভেম্বর পুলিশের একটা বড়ো দল আমার বড় ভাই ফ্লাইট সার্জেন্ট আবু ইউসুফ খানের বাড়ি ঘেরাও করে ও তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে নিয়ে যায়। এই ঘটনা জানার সাথে সাথে আমি মেজর জেনারেল জিয়াকে টেলিফোন করি। অন্য প্রান্ত থেকে আমাকে জানানো হয় মেজর জেনারেল জিয়াকে পাওয়া যাচ্ছে না। তার পরিবর্তে সেনাবাহিনীর উপ-প্রদান মেজর জেনারেল এরশাদ আমার সাথে কথা বলবেন। এরশাদ আমার কথা শুনে বলেন যে আমার ভাইয়ের গ্রেফতারের ব্যাপারে সেনাবাহিনী কিছুই জানে না। ওটা হচ্ছে একটা সাধারণ পুলিশী তৎপরতা। আমি তখনও জানতাম না আমার ভাইকে যখন পুলিশ গ্রেফতার করে তখন একই সময়ে মেজর জলিল ও আ. স. ম. আবদুর রবসহ অন্যান্য অনেক জাসদ নেতা ও কর্মীকেও পুলিশ গ্রেফতার করছিল। এসব জানার পর আমার বুঝতে আর অসুবিধা হলো না যাদের আমরা সাতই নভেম্বরে ক্ষমতায় বসিয়েছিলাম তারা আবার এক নতুন ষড়যন্ত্রের খেলায় মেতেছে।

চব্বিশে নভেম্বর এক বিরাট পুলিশ বাহিনী আমাকে ঘিরে ফেলে। কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার জানালেন জিয়ার সাথে কথা বলার জন্য আমাকে তাদের সাথে যাওয়া দরকার। আমি অবাক হয়ে বললাম জিয়ার কাছে যাওয়ার জন্য এত পুলিশ প্রহরার কি দরকার? এরা আমাকে একটা জিপে তুলে সোজা এই জেলে নিয়ে আসে। এভাবেই যাদের প্রাণ বাঁচিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছিলাম সেই সব বিশ্বাসঘাতকের দল আমাকে জেলে অন্তরীণ করলো।

জিয়া শুধু আমার সাথেই নয়, বিপ্লবী সেনাদের সাথে, সাতই নভেম্বরের পবিত্র অঙ্গীকারের সাথে, এক কথায় গোটা জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমাদের পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। খালেদ মোশাররফের সাথে তুলনায় জিয়া মুদ্রার অন্য পিঠ বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

আমাদের জাতির ইতিহাসে আর একটাই মাত্র এরকম বিশ্বাসঘাতকতার নজির রয়েছে, তা' হচ্ছে মীর জাফরের। বাঙালি জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে গোটা উপমহাদেশকে দু'শ বছরের গোলামীর পথে ঠেলে দিয়েছিল। ভাগ্য ভালো যে এটা সতের-শ' সাতান্ন সাল নয়। উনিশ-শ' ছিয়াত্তর। আমাদের কাছে বিপ্লবী সিপাহী-জনতা, তারা জিয়াউর রহমানের মতো বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্ত একে নির্মূল করবে।

> এই পর্যায়ে কর্নেল তাহেরকে আবার বাধা দেয়া হয়। কোর্টে বাক-বিতণ্ডার তোড়ে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। তাহের তখন বলেন—'কোন অধিকারে আমাকে ফাঁসি দেবেন? আমাকে মুক্তি দেয়ার কিংবা সাজা দেয়ার কোন ক্ষমতাই আপনাদের নেই।'

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কয়েকদিন রাখার পর আমাকে হেলিকপ্টারে করে রাজশাহী জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমাকে একটা নির্জন প্রকোষ্ঠে রাখা হয়। আজ পর্যন্ত আমার পরিবারের কোন সদস্য আমার সাথে দেখা করার অনুমতি পায় নি। কিন্তু জেলে থাকলেও দেশের নাড়ী আমি ঠিকই উপলব্ধি করতে পারি। দেশের জন্য এখন এক চরম সংকটের সময়। আমাদের সামনে এখন দু'টো জরুরি সমস্যা। একদিকে একটা রাজনৈতিক দলের কিছু সদস্য ভারতে পালিয়ে যেয়ে সীমান্তে সশস্ত্র সংঘর্ষের অবতারণা করছে।[৫] অন্যদিকে ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে ভারত গঙ্গার পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছে। দু'টো সমস্যাই এদেশের সার্বভৌম ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদের মূলে সরাসরি হুকমির নামান্তর। নির্জনে কারারুদ্ধ অবস্থায় উপর্যুপরি লাঞ্ছনার মুখেও এই হুমকির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আমার দেরি হয় নি। ১৯৭৬ সালের দশই মে আমি রাষ্ট্রপতির কাছে একটা চিঠি পাঠাই, সেই চিঠি আমি এখানে পড়ে শোনাতে চাই।

> আদালত তাহেরকে এই চিঠি পড়তে দেয় নি। ট্রাইবুন্যাল আরো জানায় যে বক্তব্য সংক্ষেপ করার আশ্বাস না দিলে তাকে এমন কি বক্তব্য পেশ করতেও দেয়া হবে না। এরপর বিবাদী পক্ষের প্রধান আইনজীবী আদালতে বলেন—'অনুগ্রহ করে তাঁকে (বক্তব্য দেয়ার) অনুমতি দিন। এ ট্রাইবুন্যালের অবশ্যই অধিকার আছে (তাঁকে) সেই সুযোগ না দেয়ার, কিন্তু তিনি প্রধান বিবাদী; যত বড়োই হোক না কেন বক্তব্য উপস্থাপন করে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ তাঁকে দিতেই হবে।'

জনাব চেয়ারম্যান ও মামলার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ। রাষ্ট্রপতির কাছে লেখা চিঠিতে আমার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। এ ইচ্ছা নিজ দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একজন সাধারণ নাগরিকের দৃঢ় সংকল্পের দলিল। আমি একজন মুক্ত মানুষ। নিজের যোগ্যতা দিয়ে আমি এই স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এই জেলের উঁচু দেয়াল, এই নির্জন কারাবাস, এই হাতকড়া কিছুই সেই স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারে না।

বাইশে মে আমাকে রাজশাহী থেকে হেলিকপ্টারে করে এই জেলে আনা হয় এবং সরাসরি একটা নির্জন সেলে আটকে রাখা হয়। গোটা জেলখানাটাই যেন ছিল এক রহস্যঘেরা নীরবতায় ভরা। এখানে আসার পর থেকেই আমাকে আর অন্যদের বিচার করার কথা শুনতে পাচ্ছিলাম; জেলের ভেতরে এক বিশেষ সামরিক ট্রাইবুন্যালে বিচার হবে। ইতিমধ্যেই নাকি বিশেষ সামরিক ট্রাইবুন্যাল আইনও জারি করা হয়েছে। পনেরই জুন ট্রাইবুন্যালের বর্তমান চেয়ারম্যান আমার সাথে জেলের ভেতরে দেখা করেন। আমি ট্রাইবুন্যালে উপস্থিত হতে অস্বীকৃতি জানাই। জেলের ভেতর সামরিক ট্রাইবুন্যাল বিচারের নামে সরকারি প্রহসন ছাড়া আর কি হতে পারে। একুশে জুন চারজন আইনজীবী আমার সাথে জেলের ভেতরে দেখা করেন। তাঁরা আমাকে আশ্বাস দেন যে ন্যায় বিচার করা হবে; সরকারি কোন রকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই ট্রাইবুন্যাল তার কাজ করবে। শুধু এই আশ্বাসের পরই আমি আদালতের সামনে হাজির হতে রাজি হই।

এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই। যেই অধ্যাদেশের আওতায় এই ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অবৈধ। এই অধ্যাদেশ জারি হয়েছিল উনিশ শ' ছিয়াত্তরের পনেরই জুন। অথচ পনেরই জুন ট্রাইবুন্যাল কারাগার পরিদর্শন করে। তাহলে ট্রাইবুন্যাল নিশ্চয়ই আরো আগে গঠিত হয়েছে। না হলে পনের তারিখে কাজ করে কিভাবে? এ ছাড়া জেলের ভেতরে আদালত গঠনের জন্য সেই জুনের বারো তারিখ থেকেই প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল।

আর এই তো আমি। আমাকে আইনজীবীদের সাথে আলাচেনা করার সুযোগ দেয়া হয় নি। এমনকি চার্জশীট দেখার কোন সুযোগও আমার হয় নি। আমার পরিবারের কাউকে আমার সাথে দেখা করতে পর্যন্ত দেয় নি। আর যেভাবে এ বিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার সম্পর্কে যতো কম বলা যায় ততোই ভালো। পুরো ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষ এত বেশি সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে তাড়াহুড়ো করে করেছে যে তা জানলে যে কেউ অবাক হবেন।

আমার এবং কিছু বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে ১৯৭৪ সালের জুলাই থেকে আমরা আইনসিদ্ধ বৈধ সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করছিলাম। আমি সশস্ত্র বাহিনীতে বিশৃংখলা ও বিরোধ সৃষ্টি করেছি বলেও অভিযোগ আনা হয়েছে। উনিশ শ' পঁচাত্তর-এর সাতই নভেম্বর একটা সরকারকে উৎখাত করেছি বলে আমাকে অভিযুক্ত করা হয়। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে আমি একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক নই। জনাব চেয়ারম্যান ও ট্রাইবুন্যালের সদস্যবৃন্দ, আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর সত্যতা কতটুকু রয়েছে সে সম্পর্কে আমি কিছুই বলতে চাই না। অভিযোগগুলো এতই মিথ্যা ও বানোয়াট যে সে সম্পর্কে কিছু বলার কোন ইচ্ছাই আমার নেই। যারা আওয়ামী লীগ সরকারের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন তাদের স্পষ্ট মনে আছে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগে দেশের কি অবস্থা হয়েছিল। গণনিপীড়ন, আমলাতান্ত্রিক অর্থনীতি, অরাজকতা আর গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার লংঘন ছিল প্রতিদিনকার ঘটনা। আইন শৃংখলার কোন বালাই ছিল না। এরকম প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশে জাসদ ও অন্যান্য গণসংগঠনগুলো একটা ফ্যাঁসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। দেশপ্রেমের নায়ক-রাজারা তখন কোথায় ছিলেন? কোথায় ছিল জিয়াউর রহমান? কোথায় ছিল মোশাররফ খান আর এম. জি. তাওয়াব? কি করছিল তারা?

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আমি বৈধভাবে ক্ষমতালাভকারী সরকারকে উৎখাত করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছি। কিন্তু মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করেছিল কারা? কারা সেই সরকারকে উৎখাত করেছিল? মুজিবের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে কে ক্ষমতায় এসেছিল? মুজিবের পতনের পর সেনাবাহিনী প্রধান কে হয়েছিল? এখানে অভিযুক্তদের কেউ কি এসব ঘটিয়েছিল? নাকি এখানে উপবিষ্ট আপনারা এবং তারা—যাদের আজ্ঞা আপনি পালন করে যাচ্ছেন, তারাই কি মুজিব হত্যার মধ্য দিয়ে সবচেয়ে বেশি লাভবান হন নি?

সেনাবাহিনীতে বিরোধ এবং বিশৃংখলা সৃষ্টির অভিযোগ আনা হয়েছে আমার বিরুদ্ধে। কিন্তু পনেরই আগস্ট এবং তেসরা নভেম্বর সোনাবাহিনীতে কি ঘটেছিল? তারা কোন মেজররা যারা সিনিয়র অফিসারদের হুকুম দিয়ে বেড়াতো? তেসরা নভেম্বরের

অভ্যুত্থানের পর কারা সেনাবাহিনীর কমান্ডের সমস্ত নিয়ম কানুনকে ভেঙ্গে দিয়েছিল? বন্দী জিয়া কার কাছে প্রাণ রক্ষার জন্য খবর পাঠিয়েছিল? হ্যাঁ, অবশ্যই আমার নির্দেশে এক সিপাহী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জিয়াকে মুক্ত করা হয়। আমাদের প্রধান কর্তব্য ছিল জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও সংহত করা। এর জন্য সৈনিকদের সংগঠিত করে তাদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে হয়েছিল। আমি গর্বের সাথে বলতে পারি, আমি এই কাজে সফল হয়েছিলাম। এই জাতি ও সশস্ত্র বাহিনীকে আমরা এক মহাদুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করেছি।

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আমি একটা বৈধ সরকারকে উৎখাত করেছি। হ্যাঁ, এটা সত্য! সাতই নভেম্বরের আগে কে ক্ষমতায় এসেছিল? খালেদ মোশাররফ কাদের প্রতিনিধিত্ব করছিল? কে জিয়াকে গ্রেফতার করেছিল? ভয়ার্ত জনতা কার উৎখাত কামনা করেছিল? জাতীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে ও জাতিকে একটা নতুন পথের দিশারা দিতে আমরা বিপ্লবী সিপাহী জনতার সাথে মিলে বিশ্বাসঘাতক খালেদ মোশাররফ চক্রকে উৎখাত করেছিলাম। আমি একজন অনুগত নাগরিক নই বলে অভিযোগ করা হয়েছে। একজন মানুষ যে তার রক্ত ঝরিয়েছে নিজের দেহের একটা অঙ্গ পর্যন্ত হারিয়েছে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য তার কাছ থেকে আর কি আনুগত্য তোমরা চাও? আর কোন ভাবে এদেশের প্রতি আমার আনুগত্য প্রকাশ করব? আমাদের সীমান্তকে মুক্ত রাখতে, সশস্ত্র বাহিনীর সম্মান আর জাতীয় মর্যাদা সমুন্নত রাখবার ইচ্ছায় ঐতিহাসিক সিপাহী অভ্যুত্থান পরিচালনা করতে যে পঙ্গু লোকটি নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছিল তার কাছ থেকে আর কি বিশেষ আনুগত্য তোমাদের পাওনা?

এ জন্যেই আমি ট্রাইবুন্যালকে অনুরোধ করেছিলাম মেজর-জেনারেল জিয়াউর রহমান, রিয়ার-অ্যাডমিরাল এম, এইচ, খান, এয়ার ভাইস-মার্শাল এম. জি. তাওয়াব, জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী ও বিচারপতি এ. এস. এম. সায়েমকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করার জন্য। তারা যদি এখানে আসতেন, ট্রাইবুন্যালের যদি ক্ষমতা থাকতো তাদেরকে এখানে আনার তাহলে আমি নিশ্চিত যে তারা এমন মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগের সামনে দাঁড়াতে সাহস পেতেন না। কিন্তু এই ট্রাইবুন্যাল তার দায়িত্ব পালন করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

দেশ ও জাতির মঙ্গলের লক্ষ্যে পরিচালিত নয় যে আইন সে আইন কোন আইন-ই নয়। ছিয়াত্তরের পনেরই জুন যে অধ্যাদেশের জারি করা হয়েছে তা একটা কালো আইন। শুধু সরকারের খেয়াল-খুশীর প্রয়োজন মেটাতেই এই অধ্যাদেশ জারিকৃত হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি অধ্যাদেশ। এই ট্রাইবুন্যালের তাই আমাকে বিচার করার কোন আইন-সম্মত নীতিগত ভিত্তি নেই।

একুশে জুনের পর থেকে এই বিচার শুরু হওয়ার দিন পর্যন্ত যেসব ঘটনা ঘটেছে আমি এখন সেগুলো বলতে চাই।

> তাহেরকে তাঁর বক্তব্যের এই অংশ রাখতে দেয়া হয় নি। তাহের বলেন, তিনি কখনোই এই ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মতো এমন নিচ চরিত্রের লোক দেখেন নি।

সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত একনিষ্ঠ অধ্যবসায়ের মাধ্যমে মানব সভ্যতা ভালো যা কিছু অর্জন করেছে এই ট্রাইবুন্যালের কীর্তিকলাপ তার সব মলিন করে দিয়েছে।

শেষ করার আগে বলতে চাই ছয় ও সাতই নভেম্বরের মাঝের রাত্রিতে ও সাত তারিখ দিনে যা হয়েছে তার সবই আমি বিস্তারিতভাবে বলেছি। এখন হয়তো ট্রাইবুন্যাল বুঝতে পারবেন কেন আমি সায়েম, জিয়া, এম. এইচ. খান, তাওয়াব আর ওসমানীকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করতে বলেছিলাম। তারা এখানে এসে বলুন আমি যা বলেছি তার কোথাও একবর্ণ মিথ্যা আছে কি-না।

আমার সাথে এ মামলায় অভিযুক্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে। তাদের প্রতি আমার একটা দায়িত্ব রয়েছে। যদি তারা কোন অপরাধ করে থাকে তাহলে এদের বিচার করা উচিত ছিল সশস্ত্র বাহিনীর আইন অনুযায়ী এবং সার্ভিস রুলসের আওতায়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শুরুর দিকে আমি তার একজন অন্যতম উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলাম। বড়ো দুঃখ হয়। এই সামরিক জান্তা তাদের জঘন্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে যেয়ে এভাবে সেনাবাহিনীর এই গুরুত্বপূর্ণ সৈনিকদের বিসর্জন দিচ্ছে। এতে করে সেনাবাহিনী পঙ্গু হয়ে যাবে। এইসব যুবকেরা সত্যিকারের বীর। তাঁদের নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি।

সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই জাতি মরতে পারে না। বাংলাদেশ বীরের জাতি। সাতই নভেম্বরের অভ্যুত্থান থেকে তাঁরা যেই শিক্ষা ও দিক নির্দেশনা পেয়েছে তা ভবিষ্যতে তাঁদের সব কাজে পথ দেখাবে। জাতি আজ এক অদম্য প্রেরণায় উদ্ভাসিত। যা করে থাকি না কেন তার জন্য আমি গর্বিত। আমি ভীত নই। জনাব চেয়ারম্যান, শেষে শুধু বলব, আমি আমার দেশ ও জাতিকে ভালবাসি। এ জাতির প্রাণে আমি মিশে রয়েছি। কার সাহস আছে আমাদের আলাদা করবে। নিঃশঙ্ক চিত্তের চেয়ে জীবনে আর কোন বড় সম্পদ নেই। আমি তার অধিকারী। আমি আমার জাতিকে তা অর্জন করতে ডাক দিয়ে যাই।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক।
দীর্ঘজীবী হউক স্বদেশ।

[উনিশ শ' ছিয়াত্তর সালের একুশে জলাই ভোর চারটায় কর্নেল আবু তাহেরকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।]

তথ্যক্রম

১. তাহের বার বার তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন সাতই নভেম্বরের অভ্যুত্থান 'শৃংখলা পুনরুদ্ধার' করে। শৃংখলার প্রশ্নে তাহেরের প্রত্যক্ষ উল্লেখের কারণ সরকারি পক্ষের প্রধান অভিযোক্তা এ. টি. এম. আফজালের অভিযোগ ও সরকারি চার্জশীট খুঁজলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। সশস্ত্র বাহিনীতে বিশৃংখলা ছড়ানোর অপরাধে তাহের দোষী বলে বার বার উল্লেখ করা হয়েছিল। কাজেই তাহেরের এই উল্লেখ ব্যাঙ্গার্থে ব্যবহৃত। তাহের তাঁর বক্তৃতায় স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেন, তথাকথিত 'বিশৃংখলার' মূল আসলে উপরের শ্রেণীর অফিসারদের অভ্যুত্থান ও পাল্টাঅভ্যুত্থান। উচ্চপদস্থ অফিসার শ্রেণীর মধ্যে রেষারেষির প্রত্যক্ষ প্রভাবেই সিপাহী শ্রেণীতে বিশৃখংলা ছড়িয়ে পড়েছিল। সৈনিক সংস্থার মাধ্যমে সাত তারিখের সিপাহী অভ্যুত্থান সেই বিশৃংখলারই অবসান ঘটিয়ে সিপাহী শ্রেণীতে 'শৃংখলা' ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল।

২. ১৯৭২ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পাদিত সিমলা চুক্তির ফলে নব্বই হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল ও ১৯৭৩-৭৪-এর দিকে প্রায় এক হাজার বাঙালি অফিসার ও আঠাশ হাজার সিপাহী দেশে প্রত্যাবাসিত হয়। বাংলাদেশে ফিরে আসার পর অনেককে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানে তাদের কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি দিতে হয়েছিল। অনেক উচ্চপদস্থ অফিসার যাদের প্রবাসে কর্মস্থল থাকায় স্বপক্ষ ত্যাগের সহজ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা করেন নি তাদের সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। আবার প্রত্যাবাসিত অফিসারদের সশস্ত্র বাহিনীর চাকরিতে রাখলেও তাদের অনেককেই এমন অনেকজনের নিচে পদমর্যাদা দেয়া হয়েছিল পাকিস্তানের পুরনো দিনগুলোতে যারা বরং পদমর্যাদায় এই অফিসারদের নিচে ছিল। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পদমর্যাদার মাত্রা ও জ্যেষ্ঠতার মাপকাঠি ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে সিপাহী ও অফিসারদের ভূমিকা। মুজিবের হত্যাকাণ্ড ও সাতই নভেম্বরের অভ্যুত্থান দমন করার পর এই প্রবণতার ধারা হয়েছিল বিপরীতমুখী। স্বাধীনতা যুদ্ধে যাদের কোন ভূমিকাই ছিল না সেইসব প্রত্যাগত অফিসাররাই উপরের দিকে ও মাঝের দিকের পদগুলো সিংহভাগ অধিকার করেন। মিলিট্যারি ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান কর্নেল ইউসুফ হায়দার ছিলেন ঠিক এই গোত্রেরই একজন। তাহেরের মামলায় কোন মুক্তি বাহিনী অফিসার ট্রাইবুন্যাল সদস্য হতে রাজি হন নি।

৩. ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট আর ৩রা নভেম্বরের মধ্যের দিনগলোতে বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোতে মুজিব শাসনামল নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। সমালোচকদের সবচেয়ে বড়ো আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল চতুর্থ সংশোধনী। তাদের বক্তব্য ছিল মুজিব স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ১৯৭৫-এ চতুর্থ সংশোধনী পাস করিয়ে সংবিধান পরিবর্তন করেছিলেন। এই সংশোধনীর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বাতিল করে সরকার কাঠামোকে স্বৈরাচারী ধারার রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিতে পরিণত করা হয়েছিল। নতুন শাসকদের কাছে সবার এমনকি এদের মুক্তকচ্ছ সমর্থক হলিডে পত্রিকার-ও দাবি ছিল সংবিধান বাতিল ঘোষণা,

সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা, নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান ও সংবিধানের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো যা মুজিব বাতিল করেছিলেন তার পুনরুদ্ধারকরণ। মোশতাক এসব দাবির মুখে কোন দৃঢ় আশ্বাস দিতে অস্বীকার করেন। উৎখাত হওয়া পর্যন্ত তিনি এসব দাবি-দাওয়া পাশ কাটিয়ে চলছিলেন। মোশতাকের কাছে তাহেরের যে সব দাবি, 'সংবিধান বাতিলকরণ' ও 'একটা নতুন সংসদ' নির্বাচন মূলত এগুলোই মুজিব পরবর্তী ঠিক পরের দিনগুলোর সাধারণ মানুষের আলাপ-আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

৪. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন সূত্র থেকে পরবর্তীকালে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী মাহবুব আলম চাষী-ই এই পর্যায়ে জিয়াকে পথ ঘুরে বারো দফা দাবির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে সরে আসতে বাধ্য করেছিলেন।

(মূল অংশের ৮নং টীকা দ্রষ্টব্য)

৫. তাহের এখানে আওয়ামী লীগ ও বাকশালের মুজিব-পন্থী অংশের উল্লেখ করেছেন। এরা ভারতে পালিয়ে যায় ও নতুন দিল্লী কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সীমান্ত এলাকায় সশস্ত্র আক্রমণের ঘাঁটি বাঁধে। (দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৭৫ দ্রষ্টব্য)।

৬. তাহের এখানে পনেরই আগস্ট থেকে তেসরা নভেম্বর মধ্যবর্তী সময়ে খালেদ মোশাররফ ও জিয়ার মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তার উল্লেখ করেছেন। জিয়া নেতৃত্ব কাঠামোর ধারাবাহিকতা ফিরিয়ে আনতে ও মেজরদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে অস্বীকৃতি জানালে নেতৃত্বে বিশৃংখলা দেখা দেয় ও এই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তাহের আবারো এখানে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ভণ্ডামির প্রতি ইঙ্গিত করছেন। নেতৃত্বে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে খালেদ মোশাররফদের আহ্বানকে জিয়াই অগ্রাহ্য করেন। (মূল অংশের দুই নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

যুগে যুগে ঐতিহাসিক নির্বাচিত কিছু ঘটনা

পুস্তকের এই খণ্ডে বর্তমানের উপযোগী করে তোলবার উদ্দেশ্যে তথ্য নির্বাচন ও লেখনভঙ্গিতে কিছুটা স্বাধীনতার আশ্রয় নেয়া হয়েছে, আশাকরি সুহৃদ পাঠক এই ধৃষ্টতাটুকু ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন—অনুবাদক।

১৭৫৭, জুন ২৩	পলাশীর আম্রকাননে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার পরাজয়।
জুন ২৮	পুতুল নবাব মীরজাফরের সিংহাসনে আরোহণ।
১৮৫৭, মে ১১	মীরাটে ১১নং রেজিমেন্টের নেতৃত্বে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা।
১৯০৮, আগস্ট ১১	ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি।
১৯৩৪, জানুয়ারি ১১	চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্যসেনের ফাঁসি।
১৯৪৭, আগস্ট ১৪ ও ১৫	ভারত ভাগ, আনুষ্ঠানিকভাবে দুই স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তান ও ভারতের জন্ম।
১৯৫২, ফেব্রুয়ারি ২১	ঐতিহাসিক ভাষা শহীদ দিবস। ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সূচনা।
১৯৫৪, মে	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষর।
১৯৫৫, সেপ্টেম্বর	পাকিস্তানের সেন্টোতে যোগদান।
অক্টোবর ১৪	পাকিস্তানে 'এক ইউনিট' প্রথা চালু, যাবতীয় প্রাদেশিক সীমানা ও নির্বাচিত সংসদের বিলুপ্তি।
১৯৫৮, অক্টোবর ৭	জেনারেল আয়ুব খানের নেতৃত্বে পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল।
১৯৬৭, ডিসেম্বর ১৯	আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের।
১৯৬৮, নভেম্বর ৭	আয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে গণঅসন্তোষের শুরু।
১৯৬৯, ফেব্রুয়ারি ২২	আগরতলা মামলা খারিজ, শেখ মুজিবুর রহমানের জেল থেকে মুক্তি লাভ।

মার্চ ২৬	আয়ুব সরকারের পতন, জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা দখল, ইয়াহিয়া খান কর্তৃক নির্বাচনের আশ্বাস প্রদান ও 'এক ইউনিট' প্রথার অবলুপ্তি ঘোষণা।
১৯৭০, ডিসেম্বর ৭	পাকিস্তান জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ।
ডিসেম্বর ২০	ভুট্টোর ঘোষণা—'জাতীয় রাজনীতির অঙ্গনে সংখ্যাগরিষ্ঠতাই একমাত্র কথা নয়', তার বক্তব্য তার দল পিপলস্ পার্টি সংসদে বিরোধী দলের আসনে বসবে না।
১৯৭১, মার্চ ১	জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় সংসদ অধিবেশন আহ্বান স্থগিত ঘোষণা।
মার্চ ২	ঐতিহাসিক বটতলা সমাবেশে ছাত্রলীগ নেতাদের নতুন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন। 'অসহযোগ আন্দোলনের' শুরু।
মার্চ ৭	রেসকোর্স সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
মার্চ ২৫	কালোরাত্রি, পাকবাহিনী কর্তৃক ঢাকায় গণহত্যাযজ্ঞের সূচনা, শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতার ও পাকিস্তানে জোরপূর্বক চালান। মুক্তিযুদ্ধের শুরু।
মার্চ ২৯	পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটায় মেজর আবু তাহেরের গ্রেফতার, মুক্তিলাভ ও পরে ভারতে পলায়ন।
এপ্রিল ১৭	কুষ্টিয়ায় মেহেরপুরের আম্রকাননে (মুজিবনগর) বাংলাদেশ প্রবাসী সরকার গঠন। এদিকে বসন্ত-গ্রীষ্মকালীন সময়টার মধ্যে পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় হেনরী কিসিঞ্জার কর্তৃক 'চীনা উদ্যোগ' গ্রহণ।
জুন/অক্টোবর	কোলকাতায় আওয়ামী লীগের মোশতাক পন্থী অংশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোপন যোগাযোগ।
জুলাই	আবু তাহের কর্তৃক স্বাধীনতা যুদ্ধে এগারো নং সেক্টরের দায়িত্বভার গ্রহণ।
অক্টোবর/নভেম্বর	আবু তাহেরের নেতৃত্বে কামালপুর ঘাঁটি দখল অভিযান, কামালপুর ঘাঁটির পতন, তাহেরের গুরুতর আঘাতপ্রাপ্তি, তাহের তাঁর বাম পা হারালেন।
ডিসেম্বর ১৬	ভারতীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপের পর ঢাকা মুক্তকরণ, পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম।

১৯৭২, জানুয়ারি ১০	ভুট্টোর নির্দেশে পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পাবার পর বীরোচিত সংবর্ধনার মাধ্যমে শেখ মুজিবের ঢাকায় প্রত্যাবর্তন।
অক্টোবর ২১	'সমাজতান্ত্রিক গণসংগঠন' হিসেবে জাসদের (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল) জন্ম লাভ।
১৯৭৩-'৭৪	পাকিস্তান থেকে প্রায় এক হাজার বাঙালি অফিসারের ঢাকায় প্রত্যাবর্তন।
১৯৭৪	সমাজজীবনে দুর্নীতি, বাজারে দ্রব্যের অগ্নিমূল্য ও দ্রব্যসংকটের প্রতিবাদে মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে দু'বার সাধারণ ধর্মঘট পালন।
মার্চ ১৭	'মিন্টো রোড হত্যাকাণ্ড', জাসদ আয়োজিত 'ভুখা মিছিলে' পুলিশের গুলিবর্ষণ, নিহত ও আহত মোট ত্রিশ জন, জাসদ সভাপতি এম. এ. জলিল ও সাধারণ সম্পাদক আ. স. ম. আবদুর রবের গ্রেফতার।
সেপ্টেম্বর	মুজিবের ওয়াশিংটন সফর, সাহায্য চেয়ে প্রত্যাখ্যান লাভ।
অক্টোবর	দুর্ভিক্ষের সার্বিক অবনতি, আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার মানুষের অর্ধাহার জীবন-যাপন।
ডিসেম্বর	ক্রমাগত গণঅসন্তোষের মুখে শেখ মুজিব কর্তৃক একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির ঘোষণা, এটা হবে 'দ্বিতীয় বিপ্লব'।
১৯৭৫, জানুয়ারি ২	সর্বহারা পার্টির আত্মগোপনকারী নেতা সিরাজ সিকদার ধরা পড়লেন, পুলিশী হেফাজতে থাকাকালীন তাঁর মৃত্যুবরণ।
মার্চ ২০	মেজর রশীদ ও মেজর ফারুকের ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যুত্থান পরিকল্পনা নিয়ে জিয়াউর রহমানের সাথে গোপন বৈঠক অনুষ্ঠান।
আগস্ট ১৫	অভ্যুত্থানে মুজিবের মৃত্যু, মোশতাকের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতায় আরোহণ, জিয়া হলেন সেনাবাহিনী প্রধান।
নভেম্বর ৩	খালেদ মোশাররফের প্রতি-অভ্যুত্থান, জিয়ার গ্রেফতার ও চাপের মুখে তার সেনাবাহিনী প্রধানের পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ।
নভেম্বর ৪	খালেদের মা ও ভাই কর্তৃক মুজিবপন্থী মিছিলে নেতৃত্বদান।
নভেম্বর ৫	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মুজিব-মন্ত্রীসভার চারজন প্রাক্তন সদস্যের হত্যাকাণ্ড।

নভেম্বর ৭	আবু তাহের ও জাসদের গণসংগঠনগুলোর নেতৃত্বে ঢাকা ও অন্যান্য জেলায় গণঅভ্যুত্থান, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার 'বারো দফা দাবি' ঘোষণা, তাহের কর্তৃক জিয়াকে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তকরণ।
নভেম্বর ৮	মেজর জলিল, আ. সা. ম. আবদুর রব ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তিলাভ।
নভেম্বর ১৫	গণঅভ্যুত্থানের শক্তিগুলোর ওপর আধা-সামরিক বাহিনীর হামলা, জিয়ার জাসদের সাথে যোগাযোগ ছিন্নকরণ।
নভেম্বর ২৩	জিয়ার প্রতিঅভ্যুত্থান, জাসদ নেতা মেজর জলিল ও আ. স. ম. আবদুর রবের গ্রেফতার।
নভেম্বর ২৪	আবু তাহেরের গ্রেফতার।
নভেম্বর ২৬	জাসদের কয়েকজন তরুণ কর্মী কর্তৃক জাসদ নেতৃবৃন্দকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ভারতীয় হাই-কমিশনার সমর সেনকে জিম্মি করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ।
১৯৭৬, জুন ২১	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তাহেরের গোপন বিচারের শুরু।
জুলাই ১৭	মামলার রায় প্রদান, কর্নেল তাহেরের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা।
জুলাই ২১	ভোর চারটায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আবু তাহেরের ফাঁসি কার্যকর।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের নির্বাচিত কয়েকজন ব্যক্তিত্ব ও তাদের সংগঠনের পরিচয়

আফজাল, এ.টি. এম.	: তাহের মামলার সরকারি পক্ষের প্রধান অভিযোক্তা। পরবর্তীতে ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি।
আহমেদ, খোন্দকার মোশতাক	: মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, একই বছর নভেম্বরে ক্ষমতাচ্যুত, পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান কর্তৃক দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ও কারারুদ্ধ, প্রয়াত।
আহমেদ, তাজউদ্দিন	: বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। পাঁচই ডিসেম্বর, ১৯৭৫ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিহত।
আহমেদ, সালাউদ্দিন	: সাতাত্তরের অক্টোবর-ডিসেম্বরে গণহারে সৈনিক হত্যাপর্বের সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্বে নিয়োজিত।
ওসমানী, এম. এ. জি.	: স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, প্রয়াত।
খান, আয়ুব	: খান, আয়ুব ১৯৫৮-৬৯ পর্যন্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি।
খান, এনায়েতউল্লাহ্	: সাংবাদিক, মোশতাক কর্তৃক বাংলাদেশ টাইমস্-এর সম্পাদক নিযুক্ত, জিয়া মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন।
খান, ইয়াহিয়া	১৯৫৯-এর মার্চ-'৭১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি।
খান, সিরাজুল আলম	: জাসদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তিত্ব।
চাষী, মাহবুব আলম	: প্রথমে মোশতাক ও পরে জিয়ার সহকারী, সৌদী আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত।
জলিল, এম. এ.	: জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। প্রয়াত।

জিয়াউদ্দিন, মোহাম্মদ	কর্নেল তাহেরের বিশিষ্ট বন্ধু স্বাধীনতার পর ঢাকা ব্রিগেডের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন, ১৯৭৪-এ গুপ্ত সংগঠন সর্বহারা পার্টিতে যোগদান। সম্প্রতি রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছেন। বর্তমানে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত।
ঠাকুর তাহেরউদ্দিন	: মুজিব সরকারের প্রতিমন্ত্রী, পঁচাত্তরের আগস্ট অভ্যুত্থানের পর মোশতাকের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে আবির্ভূত, প্রয়াত।
তোয়াহা, মোহাম্মদ	: পিকিং-পন্থী পূর্ব বাংলা কম্যুনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) নেতা, পরবর্তীতে সাম্যবাদী দলের নেতা, প্রয়াত।
ভাসানী, মাওলানা	: পিকিং-পন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এর সভাপতি, প্রয়াত।
ভুট্টো, জুলফিকার আলী	১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, প্রয়াত।
রশীদ, খোন্দকার আবদুর (মেজর)	: মুজিবের হত্যাকারী সামরিক অফিসারদের : একজন, প্রয়াত।
রহমান, ফারুক (মেজর)	: ঐ, প্রয়াত।
রহমান, জিয়াউর (জিয়া)	: মুজিবের মৃত্যুর পর সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত, সাতই নভেম্বর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জীবন রক্ষা ও পরে অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ। ৩০শে মে, ১৯৮২ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, ঐদিন চট্টগ্রামে বিদ্রোহী সামরিক অফিসারদের দ্বারা নিহত।
রহমান, শেখ মুজিবুর	১৯৭২-৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ এক সামরিক অভ্যুত্থানে সপরিবারে নিহত।
শফিউল্লাহ্ (মেজর-জেনারেল)	: মুজিবের উৎখাতের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রধানর্তমানে আওয়ামী রাজনীতির সাথে যুক্ত।
সফদার, এ. বি. এস.	: আয়ুব আমলে ইন্টিলিজেন্স ব্যুরো (আ. বি.)-এর উপ-পরিচালক, মুজিব কর্তৃক ১৯৭৪-এ প্রেসিডেন্টস, ভিজিল্যান্স টীমে নিয়োগ, মুজিবের

	মৃত্যুর পর এন. এস. আই.-এর মহা-পরিচালক, জিয়ার অধীনেও দায়িত্ব পালন করেন।
সিকদার, সিরাজ	: সর্বহারা পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, পঁচাত্তরের জানুয়ারিতে পুলিশী হেফাজতে থাকাকালীন নিহত।
হায়দার, ইউসুফ	১নং বিশেষ সামরিক ট্রাইবুন্যালের সভাপতি, (এই ট্রাইবুন্যাল-ই গোপনে তাহের ও আরো তেত্রিশ জনের বিচার করে) বিচারের পর পর সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশের দূতাবাসে নিয়োগপ্রাপ্তি, প্রয়াত।

সংগঠনসমূহ

১. অফিস অব পাবলিক সেফটি (ও. পি.এস.) : মার্কিন মুক্তরাষ্ট্রের এইড কার্যক্রমের আওতাধীন একটি কর্মসূচি। এর মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের পুলিশ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

২. আওয়ামী লীগ : পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষ সংসদীয় গণতন্ত্র ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনকারী নেতৃস্থানীয় দল, '৭০-এর নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায়, বাংলাদেশের প্রথম সরকার এরাই গঠন করেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্ব মূলত এদের হাতেই ছিল।

৩. ইন্টারন্যাশনাল পুলি একাডেমি (আই. পি. এ.) : ওয়াশিংটনস্থিত এইড (এজেন্সী ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট) কার্যক্রমের আওতাধীন একটি প্রশিক্ষণ স্কুল।

৪. ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ সার্ভিসেস স্কুল (ইনপোলসে) : ওয়াশিংটনস্থিত সি. আই. এম. মালিকানাধীন সংস্থা, এখানে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

৫. বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি (সি. পি. বি.) : মস্কো-পন্থী কম্যুনিস্ট সংগঠন।

৬. ছাত্র ইউনিয়ন : মস্কো-পন্থী ছাত্র সংগঠন, প্রাক-একাত্তর আমলে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রইউনিয়ন নামে পরিচিত।

৭. ছাত্র লীগ : প্রাক-একাত্তর আমলে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নামে পরিচিত। ১৯৭২ সালে আওয়ামী-পন্থী ও জাসদ-পন্থী অংশে বিভক্ত।

৮. জাতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থা (এন. এস. আই.) : বাংলাদেশের প্রধান নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যক্রম বিষয়ক সংস্থা।

৯. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) : ৩১ শে অক্টোবর, ১৯৭২-এ স্থাপিত জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিক সংগঠন।

১০. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) : মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন পিকিং-পন্থী বিভিন্ন গ্রুপের ফ্রন্ট।

১১. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) : অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বাধীন মস্কো-পন্থী মার্কসবাদীদের ফ্রন্ট।

১২. পূর্ব বাংলা কম্যুনিস্ট (পার্টি (মা-লে) : মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির (মা-লে) বিভক্ত অংশ।

১৩. পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন (পরে সর্বহারা পার্টি) : পিকিং-পন্থী সংগঠন তবে তারা জাতীয় প্রশ্নের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিল, ১৯৭১-এর পর এই সংগঠনের নেতৃত্বদান করেন সিরাজ সিকদার।

১৪. পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) : পিকিং-পন্থী সংগঠন, আবদুল হক ও মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে পরিচালিত, স্বাধীনতার পর আবদুল হক 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম অক্ষুণ্ন রাখেন।

১৫. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল : (বি. এন. পি.) সামরিক আইনের আওতাধীন নির্বাচনের প্রাক্কালে জিয়াউর রহমানের সৃষ্ট রাজনৈতিক দল।

১৬. বিপ্লবী গণবাহিনী : সাতই নভেম্বর, পঁচাত্তরের গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী সংগঠন।

১৭. বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা : বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ বিপ্লবী সংস্থা।

১৮. মুক্তিবাহিনী : একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে যুদ্ধরত গেরিলা যোদ্ধাবাহিনী।

১৯. মুসলীম লীগ : পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা—রাজনৈতিক দল।

২০. রক্ষীবাহিনী : মুজিব সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আধাসামরিক বাহিনী।

২১. রাজাকার : একাত্তরের যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকারের সৃষ্ট আধাসামরিক বাহিনী।

নির্ঘণ্ট

অ
অফিস অব পাবলিক সেফটি (ও. পি. এস) ১১৮
অগাস্টো সানডিনোর ২৮
অরোয়া সিং (জেনারেল) ৯২

আ
আওয়ামী লীগ ১১, ৬০, ৬১, ৬৫, ৬৬, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮৪, ৮৫, ৯২, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১২৫, ১২৭, ১২৯, ১৩০, ১৩২, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৪, ১৫৬, ১৬৪, ১৬৮, ১৭০
আকাশবাণী ৫৩
আফজাল, এ. টি. এম. ১৬৭
আফতাব, সুবেদার ১৪৯, ১৫০
আফসার ১৪৮
আলম, আতিকুল ১২৭
আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলা ৪৩
আলী, জুলমত (ব্যারিস্টার) ৪৭
আলী, মনসুর ৫১
আলী, মীর শওকত ৯২, ১৫২, ১৫৯
আহমেদ, আলাউদ্দিন ৭১, ৭৬
আহমেদ, খোন্দকার মোশতাক ৪৯, ৫০, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৫৫, ১৫৬, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৮, ১৭০, ১৭১
আহমেদ, তাজউদ্দিন ৫১, ১২৭
আহমেদ, সালাউদ্দিন ১৩২
আহমেদ, সুলতান উদ্দিন ৯৮
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ১২০
আহমদ আবু সাঈদ ১৫২

ই
ইনু, হাসানুল হক ৪৫, ৯৩
ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ একাডেমি (আই. পি. এ.) ১৩৭
ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ সার্ভিসেস স্কুল (ইনপোলসে) ১৩১, ১৩৭, ১৩৮
ইসলাম, সৈয়দ নজরুল ৫১
ইত্তেফাক ৯৮, ১২৭

উ

উমর, বদরুদ্দিন ৭২

এ

এরশাদ, মেজর-জেনারেল ১৬২
এজেন্সী ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (এইড) ১৩৬

ও

ওসমানী, এম. এ. জি. ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৯০, ৯২, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৬, ১৬৫, ১৬৬
ওসমান ৮৪

ক.

কাশ্মীর ৬৪
কাদেরিয়া বাহিনী ৪৭, ১২৫
কাদের সিদ্দিকী ৮৬, ১২৫, ১২৮, ১৪৮, ১২৮, ১৪৮
কাদের (ব্রিগেডিয়ার) ১৫২
কামরুজ্জামান, এ. এইচ. এম ৫১
কারভালহো, ওটেলো ১০৮
কুও মিনটাং ৮৮
কলোরাত্রি ১৪২
কিংসফোর্ড, ডি. এইচ. ৪৩
কুমিল্লা ব্রিগেড ২৫
ক্যাস্ট্রো, ফিডেল ১২৪
কৃষক লীগ ৯৮
কৃষক বাহিনী ৮৬

খ

খলিল ১৪৮
খান, আয়ুব ৬৫, ৮০, ১৩২, ১৩৭, ১৩৮, ১৬১
খান, আবু ইউসুফ (ফ্লাইট-সার্জেন্ট) ৪৫, ৯০, ১৫১, ১৫২, ১৫২, ১৫৯, ১৬২
খান, আতাউর রহমান ৪৭
খান, ইয়াহিয়া ৬৫, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৮০, ৮৩, ১৩৩, ১৩৪, ১০৪, ১৭০
খান, এনায়েত উল্লাহ ১২৭, ১২৮
খান, মোশাররফ হোসেন (রিয়ার-অ্যাডমিরাল) ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬
খান, শাহরিয়ার রশীদ (মেজর) ৫১
খান, সিরাজুল আলম ৭৮, ৭৯, ৯৯

গ
গণযুদ্ধ ৯৬
গণকণ্ঠ ৯৮, ১০২
গণবাহিনী ৭৬
গান্ধী, ইন্দিরা ৯১, ১১৮, ১২৫, ১৫৩
গান্ধীজী ৮৪
গণতন্ত্র ৯৮

চ
চীন ৭১, ৭৩, ৭৫
চট্টোপাধ্যায়, অসীম ১৩৩
চাকলাদার, শরীফ ১৫৯
চাষী, মাহবুব আলম ৪৯, ৫০, ১২৯, ১৩১, ১৬০, ১৬৮
চৌধুরী, স্বপন কুমার ৮০
চিয়াং কাই শেক ৮৮

ছ
ছাত্রলীগ ৪৫, ৬৬, ৮০, ৮১, ৯৮, ১৩৫, ১৭০

জ
জাপান ৭৫,
জলিল, এম. এ. (মেজর) ৪৫, ৯১, ৯৮, ১৫১, ১৬২, ১৭১, ১৭২
জাতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থা (এন. এস. আই.) ১০৮, ১১৭
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ১১, ২৪, ৫৪, ৫৫, ৫৮, ৫৯, ৭৮, ৯১, ৯৮, ৯৯, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩৫, ১৩৮, ১৩৯, ১৫১, ১৫৯, ১৬১, ১৬২, ১৭১
জামিল, সাফায়াত (কর্নেল) ৫১, ১৩০
জিয়াউদ্দিন, মেজর ৪৫, ৪৬, ৭৬
জিয়াউদ্দিন, মোহাম্মদ (লে. কর্নেল) ৫৮, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৭, ১৩১, ১৪৫, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭
জিকু, নূর আলম ৯৮
জাতীয়তাবাদ ৮০, ৮১, ৯৮
জাগদল ১২৮

ঠ
ঠাকুর, তাহেরুদ্দিন ৪৯, ১৫৫

ড
ডালিম, মেজর ৫১, ১৫৫
ডেমোক্রেটিক লীগ ১১২

ঢ
ঢাকা ব্রিগেড ৫১

ত
তাইওয়ান ৭৪, ৭৫
তাওয়াব, এম. জি. (এয়ার ভাইস-মার্শাল) ১৫৮, ১৬০, ১৬৪, ১৬৫
তাহের, লুৎফা ৪৫, ৪৮, ৫৪, ৭৬
তোয়াহা, মোহাম্মদ ৭১, ৭২

থ
থুসিডিয়াস ৫৮

ন
নাগা ৬৪
নিয়াজী, জেনারেল ৯০, ৯২, ১৫১
নূর, (মেজর) ৫১
নিউক্লিয়াস ৭৮, ৭৯, ৮০
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী খান) ৬৬, ৬২
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) ৭২,
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) ৫২, ৭৬

প
পাকিস্তান ৫২, ৬৩, ৬৯, ১৫৬, ১৬৭
পাটোয়ারী, ক্যাপ্টেন
পাশা, আব্দুর আজিজ (মেজর) ৫১
পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন (আরো দেখুন সর্বহারা পার্টি) ৭৯
পূর্ব বাংলা কম্যুনিস্ট পার্টি (ওহিদুর) ৭৬
পূর্ব বাংলা কম্যুনিস্ট পার্টি [ই. বি. সি. পি.] ৭১
পূর্ব বাংলা কম্যুনিস্ট পার্টি (মা-লে) [ই. বি. সি. পি. (মা-লে)] ৭২
পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টি (মা-লে) [ই. পি. সি. পি. (মা-লে)] ৭১, ৭২
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন [ই. পি. এস. এই] ৮০
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ [ই. পি. এস. এল] (আরো দেখুন ছাত্র লীগ) ৮০
পিকিংপন্থী ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৯৭, ১৩২
পাকিস্তান টাইমস ৭৩, ৭৪, ৭৭, ৭৮

ফ
ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ ১৯, ১০০, ১০২, ১২৯, ১৩০
ফারাক্কা বাঁধ ১৬৩
ফ্রন্টিয়ার ৫৭, ৭৫, ১২৯, ১৩১

ব
ব্যাংকক ৫১
বসু, কানাই লাল ৪৩
বসু, ক্ষুদিরাম ৪৩, ১৬৯
বটতলা সমাবেশ ১৫১
বাকশাল ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৯, ১৬৮
বাতেন ১৪৮
বারো দফা দাবি ১১, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৮৭, ১৩১, ১৫৯, ১৬৮, ১৭২
বালুচ ৬৮
বালুচিস্তান ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭২
বালুচিস্তান গণমুক্তি ফ্রন্ট ৬৮, ৭০
বাহার, শাখাওয়াত হোসেন ১৫১, ১৫২
বেলাল, ওয়ারেসাত হোসেন ৪৬, ১৫১, ১৫২
বিশ্বাস, টিপু ৪৬
বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৯, ১৫৯
বিপ্লবী গণবাহিনী ৫৪, ৬০, ৯৯, ১৫৩
বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি (মনি) ৫২, ৭৬
বাংলাদেশ বিপ্লবী কেন্দ্র ৯৮
বাংলাদেশ অবজার্ভার ১১৯
বাংলাদেশ টাইমস ১১৫, ১২৮

ভ
ভারত ৪৯, ৫১, ৫২, ৬৩, ৬৪, ৬৭, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৮৪, ৮৫, ১৪৬, ১৫১, ১৬৭
ভাসানী, মাওলানা ৭২
ভুট্টো, জুলফিকার আলী ৬৬, ৬৮, ৭৩, ৭৪, ১৪৩, ১৭০, ১৭১
ভিক্টর টিরাডো লোপেঞ্জ ২৮
ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং) ৫২

ম
মিজো ৬৪
মজুমদার, চারু ১৩৩
মান্নান (লে.) ১৪৮
মণি, শেখ ফজলুল হক ৪৯
মতিন, আব্দুল ৪৬, ৭১, ৭৬, ৮৬, ১৬১
মীর জাফর ১৬২, ১৬৯
মনিরুজ্জামান তালুকদার ১১২, ১৩২, ১৩৩
মারফত ১৪৮
মাও সেতং ৭৫, ৮৮
মাহমুদ, কে. বি. এম. ৪৫
মান্না, মাহমুদুর রহমান ৪৫

মারি, চাকার খান ৬৮, ১৩৩
মিন্টোরোড হত্যাকাণ্ড ১০১
মুসলিম লীগ ৬৪, ৬৯, ৮৭
মোশাররফ, খালেদ (ব্রিগেডিয়ার) ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৫৯, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১২৯, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬২, ১৬৮, ১৭১
মোস্তাফা, গাজী গোলাম ৯৬
ম্যাসকারেনহাস, এন্থনি ৫১
মস্কোপন্থী ৭৬, ৭৮
ম্যাক্সওয়েল, নেভিল ৬৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪৯, ৫২, ৭৫, ৯৩, ১৫৬

র
রেডিও পিকিং ৭৩, ৭৪, ৭৫
রব, আ. স. ম. আব্দুর ৪৬, ৮০, ৯৮, ১৩৫, ১৫১, ১৬২, ১৭১, ১৭২
রবিউল ৪৫,
রশীদ, খোন্দকার আব্দুর (মেজর) ৫১, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭
রশীদ, হারুনুর ৮১, ৯৯, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৯, ১৭১
রহমান, খান আতাউর ৪৭
রহমান, এম. খলিলুর ১৫৫, ১৫৬, ১৬০
রহমান ওহিদুর ৭৬, ১৬১
রহমান, জিয়াউর (জিয়া) ১১, ১২, ২৪, ২৭, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫১, ৫৪, ৮৪, ৮৫, ১২৮, ১২৯, ১৩১, ১৩৮, ১৪১, ১৪৬, ১৫০, ১৫৯, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬
রক্ষীবাহিনী ১৫৩
রহমান, শেখ মুজিবুর ৪৯, ৫২, ৬৫, ৭৯, ৮৪, ১২৮, ১৪৩, ১৪৫, ১৫২, ১৫৪, ১৬৯, ১৭০
রহমান, ড. আখলাকুর ৪৫
রহমান, ড. আনিসুর ৯৫, ৯৬
রহমান, ফারুক (মেজর) ৫১, ১৫৬, ১৭১

ল
লাঙ্গল সৈনিক ৯৩
লাই, চৌ-এন ৬৩, ৭৩, ৭৪, ৭৫
লেনিন, ভ্লাদিমির ইলিচ ৫৮, ৬৭, ৬৮, ৭৩, ৭৫, ১৩৩
লুক্সেমবার্গ, রোজা ৯৭
লিন পিয়াও বা লিন বিয়াও ৭৪, ৭৫

শ
শফিউল্লাহ্ (মেজর-জেনারেল) ৮৪, ৮৭, ৯২, ১৩০, ১৪৭, ১৪৮, ১৫২, ১৫৬
শ্রমিক লীগ ৯৮
শাহজাহান মোহাম্মদ ১১৬
শেক্সপীয়র ৫৮

স

সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনী ৮৭
সমাজতন্ত্র ৭৮, ৮০, ৯৮
সফদার, এ. বি. এস. ১৩৭, ১৩৮
সর্বহারা পার্টি ৯৭, ১৭১
সায়েম, এ. এম. ১৬০, ১৬১, ১৬৫, ১৬৬
সাম্যবাদ ৯৯, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯
স্ট্যালিন ৭৯
সালেহা ৪৫
সিকদার, সিরাজ ৯৭, ১৭১
সিরাজ, শাহজাহান ৮০, ৯৮
সিদ্দিকী, কাদের ৮৬, ১২৫, ১২৮, ১৪৮, ১২৮, ১৪৮
সেন, বিধান কৃষ্ণ ৯৮
সেন, সমর ১২৭, ১৭২
সেন, সূর্য ৪৪, ১৬৯
সেরনিয়াবাত, আব্দুর রব ৪৯
সোহবান, রেহমান
সোভিয়েত ইউনিয়ন ৪৯, ৫২, ৭২, ৭৩, ৭৫, ১২৮, ১৩৩
স্টিফেনস, আয়ান ১৩২
স্পিনোলা, জেনারেল ১০৮
স্টোনহাউজ, জন ৯৬
সৈনিক কমিটি ৫৮, ৫৯

হ

হামিদুল্লা (ফ্লা. লে.) ১৪৮
হক, আব্দুল ৭১, ১৩৬
হক, আ. ফ. ম. মাহবুবুল ১০৭
হলিডে ১২৭, ১৬৭
হেনরি কিসিঞ্জার ১৭০
হায়দার, ইউসুফ ৮৩, ১৪৪, ১৬৭
হোসেন, আনোয়ার ৭৪
হোসেন, ড. আনোয়ার ৪৫, ১৪৮, ১৫১, ১৫২
হুদা, বজলুল (মেজর) ৫১
হোসেন, আশিফ (কর্নেল) ৭২